কেয়স, ফ্র্যাকটাল
এবং
স্ব-সংগঠন

সাধারণ বিজ্ঞান

কেয়স, ফ্র্যাকটাল এবং স্ব-সংগঠন

প্রকৃতিতে নতুন দৃষ্টিকোণ ও জটিলতা

অরবিন্দ কুমার

ছবি

আনন্দ ঘাইসাস

অনুবাদ

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

সূচীপত্র

□

মুখবন্ধ

বিগত প্রায় এক দশক ধরে আমি বিজ্ঞানের অরৈখিক (non-linear) বিভাগ গুলিতে যে নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটে চলেছে তা অনুধাবন করে এসেছি; এই আগ্রহের পরিসর ছিল খুবই সীমিত—কিন্তু তাতে কোন ছেদ পড়েনি। আর সেই প্রয়াসেরই ফল এই বইটি। বেশ কিছুকাল আগে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সহকর্মী সাম্যাবস্থা থেকে বিচ্যুত সিস্টেমের তাপগতিবিদ্যার ওপর ইলিয়া প্রিগোজিনের (Ilya Prigogine) কয়েকটি বক্তৃতার অনুলিপি আমায় পড়তে দেন। সে থেকেই এই আগ্রহের জন্ম। কিছুকাল পরে এক গবেষক-ছাত্রের সঙ্গে একযোগে এ বিষয়ের একটা নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানকল্পে কিছু গবেষণার কাজও করলাম। তাতে আগ্রহটা আরও দানা বাঁধল। কিন্তু তা বলে বিষয়টির ওপর আমার দখল এত গভীর নয় যাতে নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে দাবী করতে পারি। আমার ভূমিকা, খুব বেশি হ'লে, একজন জিজ্ঞাসু দর্শকের। তা সত্ত্বেও জনবোধ্য আকারে এই বিষয়ে বই লেখার দায়িত্ব স্বীকার করলাম প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত বিভিন্ন সময়ে ছাড়া ছাড়া ভাবে এ বিষয়ে যেটুকু পড়াশোনা করেছি সেটাকে গুছিয়ে একত্রিত করার একটা সুযোগ এর ফলে পাওয়া গেল। আর, দ্বিতীয়ত অরৈখিক বিজ্ঞান আলোচনার গভীরে যে আশ্চর্য সুন্দর ধারণাগুলি লুকিয়ে আছে তাদের সঙ্গে আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা এই অবকাশে করা যাবে বলে মনে হল। বিশ্বজুড়ে এবিষয়ে এখন বিপুল লেখালেখি চলেছে; কিন্তু সে সব রচনার অধিকাংশই এদেশের সাধারণ পাঠককুলের কাছে সহজলভ্য নয়।

এ বইয়ের একদম গোড়ায় বর্ণিত হয়েছে, কেয়স বা বিশৃঙ্খলার চরিত্র সম্বন্ধে এই কথাটি : সম্পূর্ণভাবে জানা নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন সিস্টেমের ভবিষ্যত অনুমান করাও এই বিশৃঙ্খলার ফলে অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এর ব্যাখ্যা যোগাতে কিছু বহুল-আলোচিত উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, যেমন : লোরেঞ্জ (Lorenz)-এর আবহাওয়ার বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধীয় কাজ, 'লজিস্টিক' সমীকরণ অনুযায়ী জনসংখ্যার এলোমেলো পরিবর্তনের ওপর মে'র (May) গবেষণা, অরৈখিক দোলক, স্মেলের (Smale) অশ্বখুরাকৃতি ম্যাপ এবং ফাইগেনবমের (Feigenbaum)

বিশ্বজনীনতার নিয়ম—ইত্যাদি। বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে ফ্র্যাকটাল এবং তার পেছনের স্কেলিং (Scaling) এবং স্ব-সাদৃশ্য (Self-similarity)-র ধারণা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ফ্র্যাকটাল মাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে; অদ্ভুত আকর্ষকের (strange attractor) সঙ্গেও পরিচয় ঘটানো হয়েছে। আলোচনা থেকে গণিতকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়নি কখনই। যে সব ধারণা মূলত গাণিতিক তা স্পষ্ট করতে গিয়ে গণিতের আশ্রয় অবশ্যই নেওয়া হয়েছে কিন্তু তার মান এমন একটা নিম্ন-গ্রামে বেঁধে রাখা হয়েছে যাতে শুধুমাত্র স্কুলের অঙ্কের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত একজনের পক্ষেও সেটা বুঝে ওঠা সম্ভব হয়। বইয়ের প্রথম দুই ভাগে যে সব নতুন ধারণার পরিচয় দেওয়া হয়েছে তৃতীয় ভাগে সেগুলোই ব্যাখ্যা করা হয়েছে নানা উদাহরণ সহযোগে। এরপর আমরা অবক্ষয়ী-বিন্যাস (dissipative structure) এবং স্ব-সংগঠন (self-organisation) বিষয়ে প্রিগোজিনের মৌলিক ও অভিনব ধারণাগুলির বিবরণ দিয়েছি। ফ্র্যাকটাল, বিশৃঙ্খলা এবং স্ব-সংগঠন—এদের প্রত্যেককেই একটি অন্তর্নিহিত মূল কল্পনার বিভিন্ন রূপ হিসেবে ভাবা যেতে পারে—সেই মূল ধারণাটি হ'ল 'জটিলতা' (Complexity)। দর্শন শাস্ত্রের 'রিডাক্‌শানিস্ট' দৃষ্টিতে এই জটিলতার বিশ্লেষণ কিভাবে করা হয়েছে এবং আধুনিকতম গবেষণার আলোয় সেই ধারণা কিভাবে বদলে যাচ্ছে তার আলোচনাতেই শেষ হয়েছে আমাদের বইটি।

রচনাকালে নিজেরই তৈরি একটা নিয়ম মেনে চলেছি। এ বইয়ে এমন কোন কিছু বিবৃত হয়নি যা পুরোপুরি ভুল। কিন্তু কোন বিশেষ একটি বিবৃতির সীমাবদ্ধতা কতটা বা অন্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নাও হতে পারে তার সবিস্তার ব্যাখ্যা যোগাবার চেষ্টা সব সময়ে করা হয়নি। এ বিষয়ের যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা যদি জানান যে এই নিয়ম পালনে আমি কতটা সফল হয়েছি তাহলে সেই মন্তব্য সাদরে গ্রহণ করব। আর একইসঙ্গে সাধারণ পাঠকদের কাছ থেকে জানতে চাইব যে বইয়ের বক্তব্য গুছিয়ে, তাঁদের বোধগম্য করে বলে উঠতে পেরেছি কিনা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের ওপর অত্যন্ত সুলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ রয়েছে বহুসংখ্যক; পুস্তক নির্দেশিকায় এগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। আমার প্রথম ঋণ এদের কাছেই। (প্রতি অধ্যায়ের শেষে এর মধ্যে থেকে বিশেষ কয়েকটি উৎসের উল্লেখও করা হয়েছে।)

আমার সহকর্মী দু'জনের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ : আনন্দ খাইসাস বইয়ের ছবিগুলি এঁকেছেন আর ওয়ার্ড প্রসেসরে বইটির পাণ্ডুলিপি 'টাইপ' করে দিয়েছেন নিরঞ্জন শিম্পি। লেখার কাজ হাতে নেওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন ভি. জি. কুলকার্ণি এবং ভি. মাইনকার পুরো পাণ্ডুলিপি পাঠ করে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন—এঁদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানাই। আর হোমি ভাবা সেন্টারের আমার সব সহকর্মীদের জানাই কৃতজ্ঞতা এই কাজের বিষয়ে তাঁদের আগ্রহের জন্য।

ভূমিকা

কয়েক বছর আগে এক সুপরিচিত আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশক পত্রিকার পাতায় অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ওপর একটা মজার কার্টুন বেরিয়েছিল। কার্টুনে দেখা যাচ্ছিল যে অন্য গ্রহ থেকে আসা এক ব্যোমযাত্রী পৃথিবীর দিকে আঙুল দেখিয়ে তার সঙ্গীকে বলছে—'ঐ গ্রহে আইনস্টাইন থাকতেন'। কার্টুনে যে কথাটা বলতে চাওয়া হয়েছিল সেটা অনেক বিজ্ঞানীরও মনের কথা। রাষ্ট্রশক্তির উত্থান ও পতন ঘটে, মহাযুদ্ধে কেউ হারে কেউ জেতে, কিন্তু মানুষের চিন্তার জগতে বিজ্ঞান যে যুগান্তকারী অবদান রেখে যায় তার বিনাশ নেই—মানুষের এই সৃষ্টিই প্রকৃত অর্থে চিরস্থায়ী।

মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে দেখা যায় চিন্তার জগতে বিপ্লব ঘটেছে বহুবার। ভাবনা-চিন্তা এবং কৃৎকৌশলের অগ্রগতি অনেক সময়েই হাত ধরাধরি করে চলে। যেমন ধরা যাক চাকার আবিষ্কারের কথা। এটা কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে যতটা চিন্তার ক্ষেত্রেও ততটাই নতুন এক উদ্ভাবনা। সুমেরীয়রা যখন লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করল তখন তার সঙ্গে তারা একদম নতুন এক ধারণারও সৃষ্টি করল—সেটা হ'ল এই যে ভাবনা বা কথাকে ইচ্ছেমত কতগুলো দৃশ্যমান সংকেতে রূপান্তরিত করে ধরে রাখা যায়, আবার ঐ সংকেত থেকে কথাগুলোর পুনরুদ্ধারও সম্ভব। গণিতের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের "শূন্য" চিহ্নটির আবিষ্কারের ফলে একই সংখ্যা-বাচক চিহ্ন বিভিন্ন স্থানে বসে। বিভিন্ন মান নির্দেশ করার নতুন ধারণার প্রচলন হ'ল বীজগণিতে অজানা সংখ্যার নির্দেশক একটি চিহ্নের ব্যবহারও চিন্তার ক্ষেত্রে অসাধারণ উদ্ভাবনা।

কেপলার, গ্যালিলিও এবং নিউটনের আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম। নিউটনীয় বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে দুটো মৌলিক পরিবর্তন ঘটালো। প্রথমত কার্য-কারণের ভিত্তিতে কোন ঘটনার ব্যাখ্যা যোগানোর অর্থ এর ফলে একদম বদলে গেল। কোন একটা চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের অভিমুখে ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, অর্থাৎ 'কারণ'টা রয়েছে ঘটনার শেষে—এই ব্যাখ্যা নিউটনীয় বিজ্ঞান সম্পূর্ণ ত্যাগ করল। এর বদলে সে দাবী করল 'কারণ'টাকে থাকতে হবে শুরুতে, গোড়ায়। সেই প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করে

প্রাকৃতিক নিয়ম প্রয়োগ করেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানতে পারা যাবে পরবর্তী বা চূড়ান্ত অবস্থা কি হবে, অর্থাৎ একটা সিস্টেম কিভাবে আচরণ করবে। দ্বিতীয়ত এই বিজ্ঞান জোর দিয়ে বলল যে প্রকৃতির মূল নিয়মগুলিকে পরিমাণবাচক, গাণিতিক রূপে নিঁখুতভাবে প্রকাশ করা যায়। এর আগে অবধি এইকাজ অসম্ভব বলে মনে করা হত।

বর্তমান শতাব্দীতে চিন্তার জগতে অনেকগুলি বিপ্লব ঘটে গেছে। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব দূরত্ব সময় এবং ভর সম্বন্ধে আমাদের পুরোনো ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে; বিজ্ঞানের জগতে সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত সমীকরণ, $E = MC^2$ এই তত্ত্বেরই দান। এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভবত, কোয়ান্টাস বলবিদ্যার আবির্ভাব। তার সঙ্গেই এলো অনিশ্চয়তার সূত্র। কোন সিস্টেমের ধর্ম এবং যে পদ্ধতিতে সেই ধর্ম মাপা হচ্ছে—এ দুটোকে আদৌ আলাদাভাবে দেখা সম্ভব কিনা —কোয়ান্টাম বিজ্ঞান সেই প্রশ্ন তুলল। নিউটনীয় নীতির জায়গায় এ নিয়ে এলো এক অদ্ভুত বিজ্ঞান যার ভিত্তি নিশ্চয়তা নয়—সম্ভাব্যতা (probability)। কিন্তু অদ্ভুত হলেও, অণু-পরমাণুর জগতের ঘটানাবলীর ব্যাখ্যা এর সাহায্যে এত সুন্দর ভাবে করা গেল যে একে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। একইভাবে, এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, অণুজীববিদ্যার জগতে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে জীববিজ্ঞান বিষয়ে মানুষের জ্ঞান বহুদূর এগিয়ে গেল, পৃথিবীপৃষ্ঠে সবচেয়ে বিপুল ও রহস্যময় ঘটনার—প্রাণের অভিব্যক্তির—স্বরূপ স্পষ্টেতর হ'ল।

এই মুহূর্তে আমরা আরও একটি বিপ্লবের মাঝখানে রয়েছি বলে মনে হয়। বিজ্ঞানের জগতে যে নতুন ধারণাগুলি এই বিপ্লবের উদ্‌গাতা তারা হ'ল বিশৃঙ্খলা, ফ্র্যাকটাল, স্ব-সাদৃশ্য এবং তৎসম্বন্ধীয় ভাবনা চিন্তা। কিন্তু এই বিপ্লব একটা ব্যাপারে অন্যগুলোর চেয়ে স্বতন্ত্র। এই শতাব্দীর পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলির স্রষ্টা ছিলেন একেকজন মহাপ্রতিভাধর বিজ্ঞানী—সাধারণের তুলনায় যাঁদের মনন ও সৃষ্টির ক্ষমতাকে মনে হয় দৈত্যাকৃতির। ('দৈত্যাকৃতি' উপমাটা বিজ্ঞানী রিচার্ড ফেইনম্যানের বর্ণনা থেকে ধার করা—ফেইনম্যান নিজেও অবশ্য ঐ গোত্রেই পড়েন।) যেমন, আইনস্টাইন, সম্পূর্ণত একক প্রচেষ্টায় সৃষ্টি করেন আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। (আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে একথা বিশেষ করে সত্য।) কোয়ান্টাম বলবিদ্যার স্রষ্টা হিসেবে কোন একজনের নাম না করা গেলেও—বোর, হাইজেনবার্গ, শ্রোয়ডিঙ্গার, ডিরাক, বর্‌ন এবং পাউলি—এই জনা-ছয়েক অসামান্য ব্যক্তির হাতেই এটা রূপ পায়। এই দুটি বিপ্লবেরই জন্ম ইউরোপে।

সাম্প্রতিকতম যে বিপ্লবের কথা আমরা একটু আগে উল্লেখ করেছি তার আবির্ভাব অন্যগুলোর মত অত নাটকীয়ভাবে নয়। বেশ কয়েকটা বিজয় তার জুটেছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলো আপেক্ষিকতা, কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা আণবিক জীববিদ্যার

কৃতিত্বের মত অত চমকপ্রদ নয়। অন্য সব বড় আন্দোলনের মত এতেও রয়েছেন বীর এবং নায়কেরা। কিন্তু তাঁরা কেউই, সম্ভবত, আইনস্টাইন বা বোরের সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্য নন। এর পরিসরটা বেশ বিস্তৃত এবং প্রভাব সর্বক্ষেত্রেও সমান নয়। এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বিভিন্ন দেশের বহুসংখ্যক সাধারণ মাপের বিজ্ঞানকর্মীর দল যার মধ্যে রয়েছেন বিজ্ঞানী, অধ্যাপক ও গবেষক-ছাত্রেরা। তবুও, যে অল্প কয়েকটা জিনিসের জন্য এই শতাব্দীকে ভবিষ্যতে স্মরণ করা হবে—এই নবতম বিপ্লব নিশ্চয়ই তার মধ্যে একটা।

একজন সাধারণ মানুষের কাছে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব খুবই উচ্চমার্গের ব্যাপার —যা একটু দূর থেকে উপভোগ করাই নিরাপদ। এমনিতেও, কোন বস্তুর বেগ প্রায় আলোর বেগের কাছাকাছি চলে না গেলে এই তত্ত্ব কার্যকর হয় না। আবার, কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ দুজনকেই বেশ বিভ্রান্ত করে—যদিও দ্বিতীয়জন ঐ বিভ্রান্তির মাঝখানেই বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে যান। এই তত্ত্বও প্রতিদিন আমাদের যে মাপের বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয় তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়—বস্তু অণু বা পরমাণুর মত ক্ষুদ্রাকৃতি হলে তবেই এর প্রয়োগ সার্থক। অন্যদিকে বিশৃঙ্খলা, ফ্র্যাকটাল এবং স্ব-সংগঠনের উদাহরণ আমাদের চারিদিকে ছড়ানো। বাথরুমে আলগা কলের মুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে চলেছে—এর মধ্যে কেয়স বা বিশৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। ফুসফুসের ঝিল্লি বা ব্রঙ্কাই-এর গঠন ফ্র্যাকটাল। বাগানে পোকামাকড়দের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির এলোমেলো ধারাটা বিশৃঙ্খল হতেই পারে। আবার বাড়িতে বা পড়শীর ঘরে আগমন ঘটল যে নবজাতকের তার মধ্যে রয়েছে স্ব-সংগঠনের এক আশ্চর্য পরিচয়। এই বিষয়টা তাই সবার জন্য। প্রথাগত বিজ্ঞান বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রাচীর খাড়া করে তাদের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা ইত্যাদি স্বতন্ত্র নামে বিভক্ত করে রেখেছে—এই নতুন বিষয়টি এই কৃত্রিম বিভাজনকে মানে না। এর মূলনীতি এইসব বিষয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই, বলা যায়, বিশৃঙ্খলা, ফ্র্যাকটাল এবং স্ব-সংগঠন বিজ্ঞানের বহুধাবিভক্ত ধারাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

বিজ্ঞানের জগতে খুব নতুন ধরনের কোন আবিষ্কার স্পষ্ট রূপ পাবার আগে কিছুদিন যেন ভেসে বেড়ায়। আইনস্টাইন নিজেই বলেছিলেন যে তাঁর হাতে নির্দিষ্ট রূপ পাবার আগে আপেক্ষিকতার মূল ধারণাগুলো "হাওয়ায় ভাসছিল"; তিনি নিজে না করলে অন্য কেউ না কেউ সেগুলো ঠিকই আবিষ্কার করে ফেলত। অণু-পরমাণুর জগতে প্রয়োগ করতে গিয়ে সনাতন পদার্থবিদ্যার (classical physics) মধ্যে যেসব স্ব-বিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছিল তারাই কোয়ান্টাম-বলবিদ্যার পরবর্তীকালের বিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। তবে, নতুন বিষয়টি গড়ে

তুলতে কষ্ট করতে হয়েছিল অনেক। একইভাবে, বিশৃঙ্খলা, ফ্র্যাকটাল এবং স্ব-সংগঠনের আবিষ্কারও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। এই অনিবার্যতার পেছনে ছিল আধুনিক কম্পিউটারের বিকাশ। গণিতের রাজ্যে এমন বহু সমীকরণ দীর্ঘকাল ধরে পড়েছিল যাদের সমাধান বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। কম্পিউটারের সহজলভ্যতা এইসব সমীকরণের সংখ্যাভিত্তিক সমাধানের (numerical solution) দিকে বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। যেসব সমাধান হাতে কষে বের করতে বহুদিন বা বহুমাস ব্যয় করতে হ'ত তা এখন কয়েক মিনিট বা ঘণ্টার মধ্যে করে ফেলা সম্ভব হ'ল। আর এই তফাতটুকুতেই ঘটে গেল চমৎকার!

বিজ্ঞানের কিছু কিছু ক্ষেত্রে গভীরে দৃষ্টিপাত করে আমরা যা অবলোকন করি তা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, আমরা হতবাক হয়ে যাই। সেই ঘোর কেটে গেলে মন আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে, কোন স্থায়ী প্রভাব ছাড়াই। কিন্তু বিশৃঙ্খলা, ফ্র্যাকটাল এবং স্ব-সংগঠনের বিষয়টি সে জাতীয় নয়। এখানে যে অন্তর্দৃষ্টি আমরা লাভ করি তা গভীর—কিন্তু মাটি-ছোঁয়া।

রোজকার চেনা বাস্তব জগতের সঙ্গে তার সম্পূর্ক নিবিড়। তাই এর সঙ্গে পরিচিতি আমাদের দেখার ভঙ্গিটাই পালটে দেয়—আমরা নতুন দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখতে শিখি।

নিশ্চয়তাবাদের পতন

এক

আবহবিদের দুশ্চিন্তা

ভাবীকালের আবহবিদরা যখন নিজ-বিষয়ের ইতিহাস রচনা করতে বসবেন তখন 1961 সন সেই বিবরণীতে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করবে। ঐ বছরে, এক সেকেলে কম্পিউটারের 'প্রিন্ট-আউট' থেকে এমন একটা তথ্য বেরিয়ে এলো যেটা দেখে তাবৎ আবহবিদ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তথ্যটা খুবই মূল্যবান। কিন্তু দুশ্চিন্তার উদ্রেক এই জন্য যে ঐ তথ্যের সাহায্যে এটা বোঝা গেল বহু আগে থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া কখনই সম্ভবপর হবে না—তা সে বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল যতই এগোক না কেন। সিদ্ধান্তটা শুধু আবহবিদ্যা নয়, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—তাই সনাতনী বিজ্ঞানের একটা মূল প্রতিজ্ঞাই এতে করে নাড়া খেল। এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই আবিষ্কারের খবর ছড়ালো খুব ধীরে ধীরে। আর এই 'দুঃসংবাদের' যিনি উদগাতা, ম্যাসাচুসেট্স্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে কর্মরত সেই আবহবিজ্ঞানী এডোয়ার্ড লোরেঞ্জের নামও, পরবর্তী একদশকে, খুব বেশি লোক শুনল না।

পৃথিবীর আবহমণ্ডল অত্যন্ত বিশাল এবং জটিল একটি সিস্টেম। কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়া বিভিন্ন। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যখন ঘূর্ণীঝড় বয়ে চলেছে ঠিক তখনই হয়ত পাঞ্জাবের সমভূমিতে শুক্‌নো গরমের চোটে টেকা যাচ্ছে না। আবার কোন এক নির্দিষ্ট স্থানের আবহাওয়া দিন থেকে বদলে যায়—ক্ষেত্রবিশেষে এতটাই বদলায় যে তা দেখে সাধারণ দর্শকের তাক্ লেগে যায়। জুলাই মাসের বম্বেতে একদিন হয়ত প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম পড়ল আবার পরদিনই বৃষ্টি নেমে দিব্যি সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কোন বিশেষ জায়গার আবহাওয়ার বর্ষব্যাপী পরিবর্তনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ধারা থাকে —যা থেকে সেই অঞ্চলের জলবায়ুর চরিত্র নির্ধারিত হয়। আর প্রতিবছর মোটামুটি একইরকমভাবে ঋতুচক্র আবর্তিত হয়।

একজন আবহবিদের চোখে পৃথিবীর আবহমণ্ডল হ'ল পদার্থবিদ্যার নিয়ম

নিয়ন্ত্রিত একটি অতিকায় সিস্টেম। কিন্তু পরিমাণবাচক রাশির ভিত্তিতে এর বর্ণনা কিভাবে দেওয়া যায়? কোন কোন রাশিগুলি সেক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে? ক্ষুদ্রতম স্তরে এটা করা সম্ভব বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত প্রত্যেক অণুর অবস্থান ও গতিবেগের মান নির্দেশ করে। কিন্তু ওরকম বিপুল সংখ্যক রাশি নিয়ে কাজ করতে যাওয়াটা নির্বুদ্ধিতা। তার চেয়ে অনেক বাস্তবোচিত হ'ল বায়ুমণ্ডলের ছোট ছোট অংশের তাপমাত্রা, চাপ, ঘনত্ব, বায়ুর বেগ, আর্দ্রতা ইত্যাদি রাশির ভিত্তিতে বর্ণনাটা দেওয়া —যে রাশিগুলি অনুভব করা বা মাপা সম্ভব।

বিপুলায়তন এই আবহমণ্ডল কিন্তু আশপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন সংস্থা নয়। তাই যদি হ'ত তাহলে কিছুকালের মধ্যেই এর বিভিন্ন অংশের তাপমাত্রা, চাপ ইত্যাদির মান সমান হয়ে গিয়ে এটা একটা সুষম, বৈচিত্র্যহীন সংস্থায় পরিণত হ'ত। পৃথিবী সূর্য থেকে শক্তি পায়—অসমভাবে; অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে যে শক্তি শোষিত হয় তার পরিমাণও বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাপের পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ, বাষ্পীভবন, ঘনীভবন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিনিয়তই আবহমণ্ডলের সঙ্গে সমুদ্র ও স্থলভাগের মিথষ্ক্রিয়া ঘটে চলেছে। অভিকর্ষের টান বায়ুমণ্ডলকে বেঁধে রেখেছে পৃথিবীর সঙ্গে; পৃথিবী পাক খাচ্ছে নিজের অক্ষে, আবার প্রদক্ষিণ করে চলেছে সূর্যকেও। এই সমস্তরকম ক্রিয়া-বিক্রিয়া আবহাওয়াকে প্রভাবিত করছে—তার রূপ এবং বৈচিত্র্য নির্ধারণ করছে।

এইরকম জটিল একটা সিস্টেম নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এক ধাক্কায় পুরো সমস্যাটা সমাধানের চেষ্টা করেন না। তাঁরা স্থিতধী মানুষ—তাই ধাপে ধাপে এগোন। যেসব কারণগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ প্রথমেই সেগুলোকে বাদ দিয়ে দেন। তারপর সেই সরলীকৃত চিত্রে কোন রাশিগুলি উপযুক্ত তা নির্বাচন ক'রে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক সমীকরণের আকারে লেখেন। এরপর, সময়ের সাপেক্ষে রাশিগুলির পরিবর্তনের হার নির্ণয়ের পালা আসে এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক স্থাপন। তারপর তাদেরও পরিবর্তনের হার, ইত্যাদি। এই সম্পর্কগুলির রূপ নির্ধারণ করে থাকে এ বিষয়ের মূল সূত্রগুলি আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে সেই সূত্রগুলি হ'ল প্রবাহী-বলবিদ্যার[৮] (Fluid mechanics) নিয়মাবলী। নিউটন প্রায় 300 বছর আগে বলবিদ্যার যে মূল নিয়মগুলি সূত্রায়িত করেন প্রবাহী-বলবিদ্যার ভিত্তি তারই ওপর স্থাপিত। উপরোক্ত সমীকরণগুলিকে গণিতের ভাষায় ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ বলা হয়। ভৌতবিজ্ঞানের এটা একটা মুখ্য বিভাগ এবং গবেষণারত বিজ্ঞানীদের অনেকের কর্মজীবনের অধিকাংশটাই জুড়ে থাকে এই ডিফারেন্সিয়াল (differencial) সমীকরণ।

কিছু সমীকরণের মধ্যে সিস্টেমের ধর্মগুলোকে ধরে ফেলার এই প্রচেষ্টাকে 'মডেল' তৈরি করা বলা হয়। পরীক্ষালব্ধ ফল, পূর্ববর্তী কাজ এবং কল্পনাশক্তি

ব্যবহার করে প্রথমেই সিস্টেমের বর্ণনায় প্রয়োজনীয় রাশিগুলিকে সনাক্ত করে নেওয়া মডেল নির্মাণের প্রথম ধাপ—তারপর ঐ রাশিগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ণায়ক ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণগুলি লিখে ফেলতে পারলে মডেল সম্পূর্ণ হয়। এইভাবে তৈরি মডেল আর প্রকৃত সিস্টেম অবশ্যই এক জিনিস নয়। মডেলটা বাস্তব সত্য নয়—কিন্তু এতে সত্য প্রতিবিম্বিত হয়। আয়না ভালো হ'লে প্রতিবিম্ব আসলের অনুরূপ হয় আর খারাপ হ'লে প্রতিকৃতি বিকৃত হয়ে যায়—মডেলের ক্ষেত্রে ঠিক তাই। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সিস্টেমের নির্ভরযোগ্য মডেলের নির্মাণ এবং বর্ণনাকে নির্ভুল থেকে নির্ভুলতর করার জন্য তার উন্নতিসাধন সম্ভব—এরকম একটা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই বিজ্ঞান এগোয়।

* * * *

বিগত তিন শতাব্দী ধরে প্রকৃতির মডেল নির্মাণের কাজে যে সাফল্য পাওয়া গেছে তার ওপর ভিত্তি করেই এই বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে। সনাতন পদার্থবিদ্যা (classical physics) এই কাজে যতটা সফল তেমন আর কোনও বিষয় নয়। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর এক বিপুল অংশকে নিউটনের বলবিদ্যা এবং মহাকর্ষ সংক্রান্ত সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। এই সূত্রাবলীর প্রয়োগক্ষেত্রের বিস্তৃতি সার্বজনীন মহাকাশে পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণ কিংবা চাঁদের পৃথিবীর চারপাশে ঘোরা; ভূ-পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতি; বস্তুতে বস্তুতে সংঘর্ষ অথবা তারের কম্পনের মত ঘটনা; কিংবা বস্তুর অভ্যন্তরে অণুর সঞ্চরণ—এ সবই ঐ একই নিয়মে বাঁধা। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের বলবিদ্যার ভিত্তি হল নিউটনের ঐ সূত্রাবলী। দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে যখনই এই সূত্রাবলীর সাহায্যে কিছু অনুমান করা সম্ভব হয়, সে অনুমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়।

এত বড় সাফল্যে খুব বড় সমালোচকের চোখও ধাঁধিয়ে যেতে পারে। কোনো তত্ত্বের ওপর সবার আস্থা এত বেড়ে গেলে কোন মূল প্রতিজ্ঞার ওপর সেই তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে সেটা লোকে ভুলে যেতে বসে। নিউটনের প্রায় একশো বছর পরে, প্রখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ-পদার্থবিদ পিয়ের সিমন লাপ্লাস (Piérre Simon Laplace) নিউটনীয় নিয়ম মোতাবেক সৌরজগত কতটা স্থিতিশীল তা বিচার করে দেখেছিলেন। তাঁর বিপুল পরিমাণ কাজ একত্রিত হয় 'মেকানিক সিলেসতে' (Mecanique Celeste) নামক গ্রন্থে। তৎকালীন ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নকে সেই পুস্তকের এক খণ্ড উপহার দেওয়া হয়। যে বইয়ে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার গতি নিয়ে আলোচনা রয়েছে তাতে উর্ধ্বলোকচারী ঈশ্বরের আদৌ কোন উল্লেখ নেই—এটা দেখে নেপোলিয়ন অপ্রসন্ন হন। পুস্তকে ঈশ্বরের উল্লেখ কেন নেই এই প্রশ্নের জবাবে লাপ্লাস নাকি সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে ঐ কল্পনার (hypothesis) আশ্রয় নেওয়ার কোনও প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি।

প্রায় দুশো বছর আগেকার ঐ উক্তির প্রতিধ্বনি পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার প্রতি পদক্ষেপেই শোনা গেছে। নিউটনীয় বলবিদ্যার নিয়ম অনুসারে পূর্ববর্তী, প্রাথমিক অবস্থা ঠিক ঠিক জানা থাকলে পরবর্তী অবস্থা বা ভবিষ্যৎ পুরোপুরি নিয়ম-নির্ধারিত। এর মধ্যে অনিশ্চয়তা বা 'ভাগ্য'-র কোন স্থান নেই। কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে সিস্টেমটি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সবকিছু জানা থাকা চাই। আর তাহলেই ভবিষ্যতের (বা অতীতেরও) যে কোন মুহূর্তে তার কি অবস্থা হবে তা সূত্রের সাহায্যে নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যাবে। ভূত বা ভবিষ্যৎ নিমিত্ত ও নিয়মদ্বারা নিশ্চিত এবং সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত—এই বোধ বিজ্ঞানে যে দর্শন এবং মানসিকতার জন্ম দিল তাকে নিশ্চয়তাবাদ (determinism) বলা হয়। লাপ্লাসের উক্তিতে এরই আভাস ছিল। এইজাতীয় নিয়মনিবদ্ধ সিস্টেমের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। একটা ক্ষেপনাস্ত্রের প্রাথমিক অবস্থাকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করে তাকে ইচ্ছেমত লক্ষ্যে নিক্ষেপ করা যেতে পারে। নিশ্চয়তাবাদ, তাই, শুধু ভবিষ্যতের পূর্বাভাষই দেয় না তাকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও যোগায়।

বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এমন কিছু ঘটনা ঘটল যাতে এই দর্শনের ভিত আরও জোরালো হয়ে উঠল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল দ্বারা তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বের মূল সূত্রগুলির প্রণয়ন। ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের চরিত্র ছিল নিশ্চয়তাবাদী। তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের মত এমন কিছু নতুন জিনিস এই তত্ত্ব অনুমান করল যার অস্তিত্ব পরবর্তীকালে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হ'ল। দেখা গেল যে শুধু বলবিদ্যা নয় তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক অবস্থা ভবিষ্যতকে পুরোপুরি নির্ধারণ করছে। এইসব সাফল্যের ফলে নিশ্চয়তাবাদ বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। একটা বিষয় বিজ্ঞান না বিজ্ঞান নয় সেটা বিচার করার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ালো এই পূর্ব-নির্ধারণ ক্ষমতা। যে বিদ্যা বর্তমানের ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতকে সম্পূর্ণ সঠিকভাবে অনুমান করতে সক্ষম নয় তার আর কোনও মূল্য রইল না—সেটাকে আর বিজ্ঞান বলেই ধরা হ'ল না।

ভবিষ্যত নির্ধারণ ক্ষমতার মাপকাঠিতে বিজ্ঞানকে বিচার করার এই রীতি প্রথম ধাক্কা খেল এই শতাব্দীর গোড়ায়। অণু-পরমাণুর গতি প্রকৃতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা যোগাতে নিউটন ও ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব ব্যর্থ হ'ল। এই প্রয়োজন মেটাতে এমন এক নতুন বিজ্ঞানের জন্ম হ'ল যার তত্ত্ব ভবিষ্যতে ঠিক কোন ঘটনাটা ঘটবে নিশ্চিতভাবে তা নির্ধারণ না করে একাধিক সম্ভাবনার প্রতি নির্দেশ করে। ফলে এই নতুন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জগতে প্রকৃতির মূল নিয়মগুলি সম্ভাব্যতার (probability) ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল—তারা আর নিশ্চয়তাবাদী রইল না। একটা পরমাণু ঠিক কখন শক্তির কোয়ান্টাম বিকিরণ করে উত্তেজিত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে তা এই নতুন বিজ্ঞান বলতে পারে না—কেবল, এটা ঘটার সম্ভাবনা

কি তার মাত্রা নির্দেশ করতে পারে। বহু সংখ্যক পরমাণু থাকলে কতক্ষণে তাদের অর্ধেক শক্তি বিকিরণ করে ফেলবে তা এই তত্ত্ব থেকে নির্ভুলভাবে গণনা করা সম্ভব। কিন্তু কোন পরমাণু ঠিক কখন সেটা করবে তা বলা সম্ভব নয়। কোয়ান্টাম সিস্টেমে প্রত্যেক রাশির সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনার মাত্রা (probability) যুক্ত থাকে। এই সম্ভাবনার মাত্রা আবার সময়ের সঙ্গে বদলায়—নির্দিষ্ট সূত্র অনুযায়ী—এবং এই সূত্রে কোন অনিশ্চয়তার স্থান নেই। অর্থাৎ এই সূত্রটিতে নিশ্চয়তাবাদ বা ডিটারমিনিজম্‌কে ফিরে পাওয়া যাচ্ছে। সনাতনী বলবিদ্যার যে চরিত্রটি খোয়া গিয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ক্ষেত্রে তাকে আবার উঁকি মারতে দেখা গেল—সম্ভাব্যতার পোশাকের আড়ালে। বড় মাপের বস্তুর গতি-প্রকৃতি বিচারে সনাতন এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রায় কোন ফারাক থাকে না। বড় বস্তুর জগতে কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা দৃষ্টিগোচর হয় না—তাই দুই বলবিদ্যার মধ্যেকার পার্থক্যটাও দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়।

নিশ্চয়তাবাদ এবং পূর্বানুমান ক্ষমতা

1961 সনের সেই বিশেষ দিনটিতে এডোয়ার্ড লোরেঞ্জ পৃথিবীর আবহাওয়ার একটি কম্পিউটার মডেলকে নানাভাবে নেড়ে-চেড়ে দেখছিলেন। মডেলটা খুবই সরলীকৃত ছিল। কিন্তু তবুও আবহাওয়ার কতগুলো মূল বৈশিষ্ট্য তাতে ধরা পড়েছিল। নির্দিষ্ট সময় পর পর ঋতুরা ফিরে আসে—কিন্তু প্রতিবার একদম একভাবে নয়—এই ব্যাপারটা মডেলের অঙ্গীভূত ছিল। তাপমাত্রা, চাপ, বায়ুর বেগ, আর্দ্রতা ইত্যাদি যে সমস্ত রাশির মানের ওপর আবহাওয়া নির্ভরশীল তাদের প্রাথমিক মান কম্পিউটারকে বলে দিতে হবে। তারপর এই মানগুলি ব্যবহার করে মডেলের সমীকরণগুলির সংখ্যাভিত্তিক (numerical) সমাধান নির্ণয় করবে যন্ত্রটি এবং সবশেষে পরিবর্তিত আবহাওয়ার পরিচয়জ্ঞাপক নতুন সংখ্যাগুলি প্রিন্ট-আউটের আকারে কাগজে ছেপে বের করে দেবে। লোরেঞ্জ এক সেট সংখ্যা কম্পিউটারে ঢুকিয়ে পরিবর্তিত অবস্থার সূচক আরেক সেট সংখ্যা পেলেন। একটা বিশেষ সময়ের ফাঁকে আবহাওয়ার পরিবর্তন কি হবে সেটা আরও একটু খুঁচিয়ে দেখবেন বলে লোরেঞ্জ আরও একবার প্রোগ্রামটা চালালেন। এবারেও প্রাথমিক মান হিসেবে সেই পুরোনো সংখ্যার সেটটিকেই দিলেন; প্রথমবারের প্রিন্ট-আউটের গোড়াতেই সেগুলো লেখা ছিল। ওঁর আশা ছিল আগেরবারের প্রিন্ট-আউটেরই একটা অংশ এবার পাবেন, আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন এবারের প্রিন্ট-আউটের সঙ্গে আগেরবারের প্রায় কোনোই মিল নেই। একই প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করেও দু'ক্ষেত্রে আবহাওয়ার অনুমিত মান ভীষণরকম আলাদা। লোরেঞ্জ ভালো করে দেখলেন যে কোন ভুলটুল হয়েছে কিনা, যন্ত্রটা ঠিক চলছে

কিনা তাও পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোথাও কোন গলদ পাওয়া গেল না। তাহলে কেন দু-বারের হিসেব মিলল না—তিনি ভাবতে বসলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্যার উৎসটা খুঁজে পাওয়া গেল। দ্বিতীয়বার প্রোগ্রামটা চালাবার সময় প্রাথমিক মান হিসেবে যে সংখ্যাগুলো ব্যবহার করেছিলেন সেগুলো তিনি নিয়েছিলেন প্রথম প্রিন্ট-আউটটা থেকে—সেখানে সংখ্যাগুলোর দশমিকের পর তিনঘর অবধি আসন্ন মান লেখা ছিল। কিন্তু একদম প্রথমবার কম্পিউটারের স্মৃতিতে ঐ একই সংখ্যাগুলো যখন ঢোকানো হয়েছিল তখন তাদের মান দশমিকের পর ছয় ঘর অবধি নির্দেশ করা হয়েছিল; আর প্রথম গণনায় সেই মানই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রথমবার কোন এক রাশির মান যদি ধরা হয়ে থাকে 0·432185 তাহলে প্রথম প্রিন্ট-আউটে তার আসন্ন মান ছাপা হয়েছিল 0·432 এবং দ্বিতীয়বার এই সংখ্যাটিকে প্রাথমিক ধরে গণনা শুরু করা হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দু-বারের গণনায় প্রাথমিক মান হিসেবে যে সংখ্যাগুলি ব্যবহৃত হয় তারা প্রায় সমান হলেও একদম সমান নয়। এই ব্যাপারটা বুঝতে পারার পর লোরেঞ্জ ঐ প্রিন্টআউটগুলো আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন এবং শেষ অবধি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে তখনো অবধি নিশ্চয়তাবাদ এবং পূর্ব-নির্ধারণ-ক্ষমতা বলতে বিজ্ঞানীরা যা বুঝে এসেছেন প্রকৃতির জগতে তা অচল।

কিন্তু এরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর কারণটা কি? ঐ সামান্য অমিলের গুরুত্ব এত বেশি? তাহলে কি প্রবাহী-বলবিজ্ঞানের বা নিউটনের মূল সূত্রগুলোতেই লোরেঞ্জ কোন ভুল খুঁজে পেলেন? ব্যাপারটা আদৌ তা নয়—মূল সূত্রগুলোর নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। গণ্ডগোলটা ছিল নিউটনীয় বলবিজ্ঞানকে ঘিরে নিশ্চয়তাবাদী দর্শনের যে আবরণ তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে।

নিশ্চয়তাবাদী (deterministic) সূত্র এবং ভবিষ্যত নির্ধারণ ক্ষমতাকে এক করে দেখাটাই ভুল। বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে একটা সিস্টেমের ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে গেলে শুধু বিবর্তনের সূত্রগুলো জানলেই চলে না—সঙ্গে প্রাথমিক অবস্থাটাও নির্ভুলভাবে জানা চাই। একথাটা এতটাই পরিচিত যে বহু সময়েই এটার দিকে কেউ মনোযোগ দেয় না। যেমন, ধরা যাক একটা বাচ্চা পার্কে বল নিয়ে লোফালুফি করছে—কিছু দূরে একটা খাড়া দণ্ডের গায়ে অনুভূমিক ভাবে একটি রিং আটকানো আছে। এখন বাচ্চাটা যদি বলটাকে একদম খাড়া ওপর দিকে ছোড়ে তাহলে সেটা ফেরত আসবে তার হাতে। আবার ছোড়ার দিকটা বদলে, ঠিকমত বেগে ছুড়ে বলটা সেই রিং-এর মধ্যে দিয়েও সে গলিয়ে দিতে পারে। অভিকর্ষজ আকর্ষণের নিয়ামক সূত্রটি দু-ক্ষেত্রেই অভিন্ন, কিন্তু অন্তিম ফল—অর্থাৎ বলের হাতে পড়া বা রিং-এ গলে যাওয়া নির্ভর করবে প্রাথমিক অবস্থার ওপর অর্থাৎ বলটি হাত থেকে মুক্ত হওয়ার মুহূর্তে তার গতিবেগের মান এবং দিকের ওপর।

এখন এই খেলাতে চূড়ান্ত ফল নির্ধারণ করা অসম্ভব নয়। ভালো করে অভ্যেস করলে বাচ্চাটি প্রতিবারই বলটাকে রিং-এর ভেতরে ফেলতে পারে। কিন্তু এই ভরসা বা ভবিষ্যত-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উৎসটা কি? আচম্‌কা জোরালো হাওয়া-টাওয়া না দিলে ছোড়ার পর বলটা কোনো এলোমেলো পথ ধরে যাবে না—যাবে একটা নির্দিষ্ট আকারের (অধিবৃত্তাকার) বক্ররেখা বরাবর—এই বোধ ভরসার একটা উৎস। কিন্তু এর সঙ্গে আরও একটা জিনিস আছে। খুব সচেতনভাবে না হলেও বাচ্চাটা জানে যে ছোড়াটা সামান্য এদিক-ওদিক হলেও বলটা রিং-এর ভেতরেই পড়বে। রিংটা কিছুটা জায়গা জুড়ে আছে। একটা বিশেষ রকমের ছোড়ায় যদি বলটা ঠিক মাঝখান দিয়ে গলে যায় তাহলে তার চেয়ে সামান্য অন্যরকম করে ছুড়লেও কাজটা হবে। বলটা রিং-এর মধ্যেই পড়বে—হয়ত ঠিক মাঝখানে নয়—একটু ধারের দিকে। এটা যদি না হ'ত তাহলে বাচ্চাটা ভরসা করে খেলাটা খেলতেই পারত না। অল্প একটু 'বিচ্যুতি' খেলাটা 'বরদাস্ত' করে—তাই খেলোয়াড় নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারে। *যখন কোন সিস্টেম নিশ্চয়তাবাদী সূত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং প্রাথমিক অবস্থার সামান্য বিচ্যুতি 'বরদাস্ত' করতে পারে তখনই তার ভবিষ্যত সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভব হয়।*

পরিস্থিতির মধ্যে যদি অনিয়ন্ত্রিত, এলোমেলো কারণ ঢুকে পড়ে তাহলে ভবিষ্যত অনুমান করা আর সম্ভব হয় না। ওপরের খেলার ক্ষেত্রে এটা ঘটবে যদি এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস বইতে থাকে। সেক্ষেত্রে বলের গতিপথটাই এলোমেলো হয়ে যাবে। তখন গতি নিয়ন্ত্রণকারী সূত্রগুলি নিজেরাই আর নিশ্চয়তাবাদী থাকবে না। বাইরের থেকে অনিয়ন্ত্রিত প্রভাব ঢুকে পড়ায় ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে — এরকম ঘটনা তো আমরা হামেশাই ঘটতে দেখি। কিন্তু লোরেঞ্জ যা আবিষ্কার করলেন তা *আদৌ এই জাতীয় অনিশ্চয়তা নয়।* তাঁর মডেলের সমীকরণগুলি পুরোপুরি 'ডিটারমিনিসটিক' বা নিশ্চয়তাবাদী ছিল। তাতে অনিশ্চয়তার কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে তিনি পূর্বানুমান ক্ষমতা (predictability) হারালেন, তার কারণ তাঁর মডেল প্রাথমিক অবস্থার সামান্য বিচ্যুতি 'বরদাস্ত' করার অবকাশ ছিল না—যেটা বাচ্চার বল খেলায় ছিল। তাই লোরেঞ্জের মডেলে প্রাথমিক অবস্থার সামান্য হেরফের চূড়ান্ত অবস্থায় বিশাল ফারাকের সৃষ্টি করল—প্রায় একইরকম অবস্থায় শুরু হওয়া সত্ত্বেও দু-ক্ষেত্রে আবহাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্নরকম হবে বলে দেখা গেল। লোরেঞ্জ বললেন, যে, বাস্তবক্ষেত্রে আবহাওয়ার প্রাথমিক অবস্থার নির্দেশ করতে গিয়ে যে রাশিগুলি নির্ণয় করা হবে তাদের নির্ভুলতার একটা সীমা থাকতে বাধ্য। পৃথিবীকে ঘিরে যতগুলোই কৃত্রিম উপগ্রহ বসানো হোক —আর যত জায়গাতেই আবহাওয়া কেন্দ্র বসিয়ে আবহাওয়া নির্ণায়ক বিভিন্ন রাশি মাপা যাক, প্রাথমিক মান নির্দেশে কিছুটা অসম্পূর্ণ বা ত্রুটি থেকেই যাবে—তার
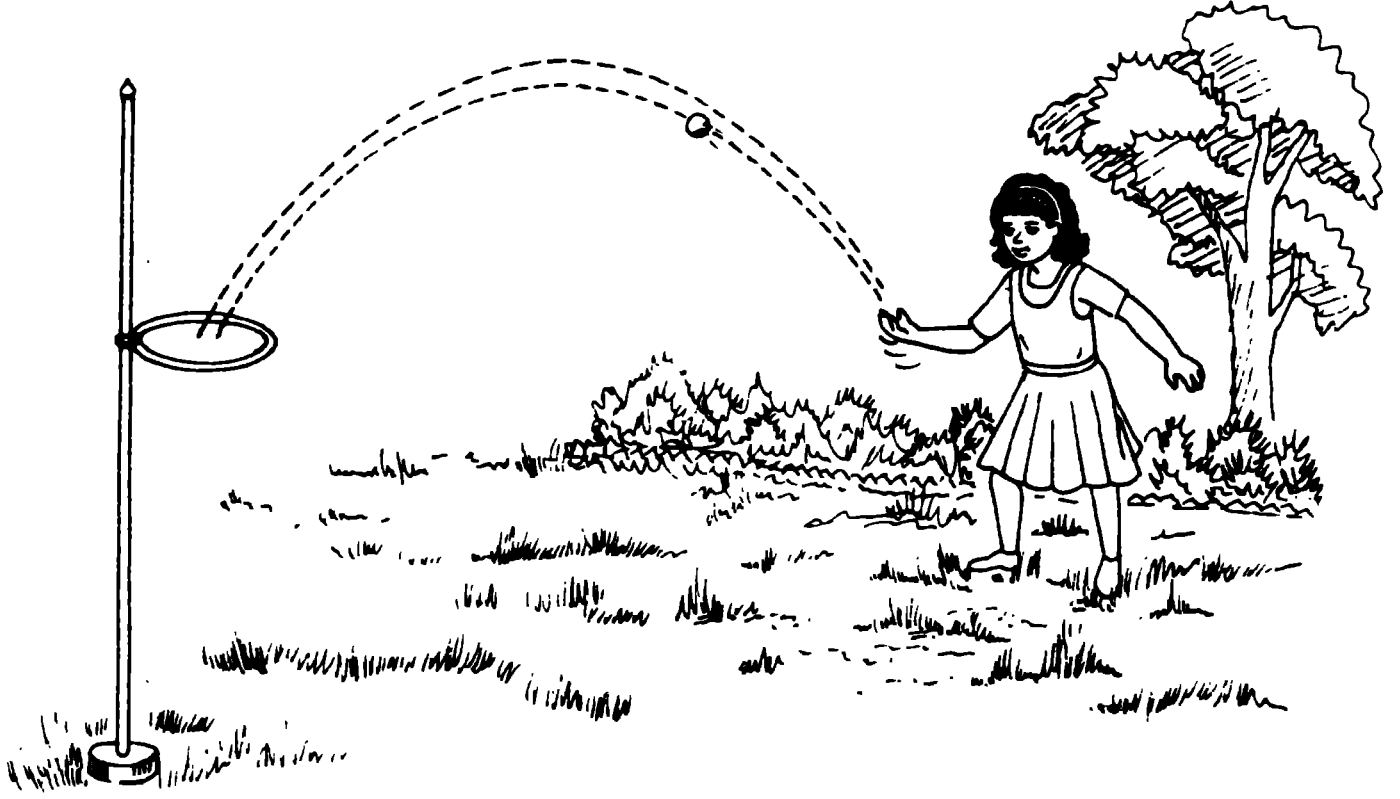
চিত্র 1·1 খুব হাওয়া নেই এমন দিনে একটি মেয়ে পার্কে বল নিয়ে খেলছে। এক্ষেত্রে অভিকর্ষের নিশ্চয়তাবাদী নিয়মের পূর্বনির্ধারণ ক্ষমতা বজায় থাকবে।
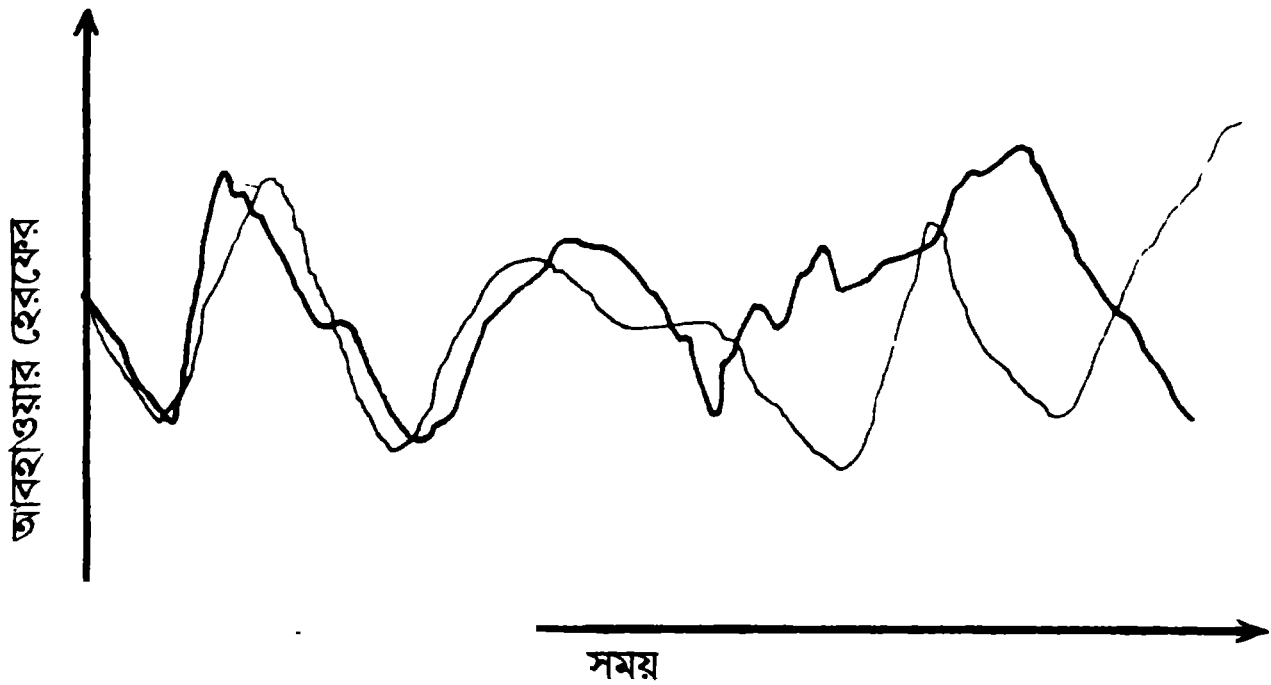
চিত্র 1·2 "প্রজাপতির নির্বন্ধ" (গুণগত দিক দেখানো হয়েছে।) প্রাথমিক অবস্থার সামান্য হের ফের বিবর্ধিত হয়ে দ্রুত বড় মাপের পরিবর্তন ডেকে আনছে। দীর্ঘকাল আগে থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছে—নিয়ামক সূত্রগুলি নিশ্চয়তাবাদী হওয়া সত্ত্বেও।

মান যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। কিন্তু আবহাওয়ার নির্ণায়ক সূত্রগুলিই এই ত্রুটি কম্পিউটার-গণনার সময় এমনভাবে বাড়িয়ে দেবে· যাতে গণনালব্ধ ফল আর সত্যিকারের আবহাওয়ার মধ্যে প্রায় কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এইজাতীয় সিস্টেমকে 'অতিরিক্ত সংবেদনশীল' বলাটা আজকালকার রীতি—

যারা প্রাথমিক অবস্থার সামান্য হেরফেরও বরদাস্ত করতে পারে না। এটাই লোরেঞ্জের আবিষ্কার। আর এর ফলে পুরোপুরি নিশ্চয়তাবাদী, 'ডিটারমিনিস্‌টিক', নিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক সিস্টেমেরও ভবিষ্যত নির্ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়াকেই 'বিশৃঙ্খলা' বা 'কেয়স' (chaos) বলা হয়। দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীরা এমন সব সিস্টেম নিয়েই কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন যেখানে প্রাথমিক অবস্থার সামান্য ত্রুটি ভবিষ্যতেও একটা সীমার মধ্যে বাঁধা থাকে। এই সীমাবদ্ধ ত্রুটির কারণেই মহাকাশে রকেট পাঠানো সম্ভব হয়েছে; সেক্ষেত্রে যেমন, বাচ্চাটির বল খেলার ক্ষেত্রেও তেমন—'ডিটারমিনিসটিক', নিশ্চয়তাবাদী নিয়ম থেকে পূর্বানুমান ক্ষমতা লাভ করা গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত সিস্টেমের ক্ষেত্রেই এটা করা যাবে—এরকম ভাবাটাই ভুল।

লোরেঞ্জের আবহাওয়ার মডেলে বিশৃঙ্খলা (chaos) দেখা গিয়েছিল। যদি সেই মডেলে প্রকৃত আবহাওয়ার মূল চরিত্র প্রতিফলিত হয়ে থাকে তাহলে 'দিল্লীতে একটা প্রজাপতি পাখা নাড়লে কয়েক মাস পরে লন্ডনের আবহাওয়া তার দ্বারা প্রভাবিত হবে' বলাটা খুব অযৌক্তিক নয়। আবহাওয়া যদি 'বিশৃঙ্খলা সিস্টেম' (chaotic system) হয় তাহলে প্রজাপতির পাখা নাড়ার ফলে তাপমাত্রা ও চাপের যে সামান্য পরিবর্তন হবে তা বেড়ে যাবে দ্রুত ঘাতে (exponentially)—ফলে আবহাওয়ার যা রূপ হবে তা প্রজাপতি পাখা না নাড়লে আবহাওয়া যেরকম হ'ত তার থেকে অনেক আলাদা। তাই, দৈবের নির্বন্ধ না হয়ে, আবহাওয়া এখন হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রজাপতির নির্বন্ধ!

আর এর ফলেই বহুদিন পরের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া অর্থহীন হয়ে পড়ছে। দেখা যাচ্ছে যে নিয়ম বা সূত্র নিশ্চয়তাবাদী হলেই ভবিষ্যত অনুমান সবক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে না। একটা ধূমকেতু বা মহাকাশযানের ক্ষেত্রে বহু বছর বা বহুশত বছর আগেও নির্ভুলভাবে অনুমান করা যাচ্ছে তাদের গতিপথ ঠিক কিরকম হবে। অথচ আবহাওয়ার ক্ষেত্রে এটা করা যাচ্ছে না—যদিও দুক্ষেত্রেই পরিবর্তনের সূত্র বা নিয়মগুলি 'ডিটারমিনিসটিক'। আবহাওয়ার পূর্বাভাসের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে সর্বক্ষণ বিভিন্ন রাশি মেপে চলতে হয়; সহস্র সহস্র সমীকরণ লাগে মডেলটা গড়তে; পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং ক্ষিপ্র সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় ঐসব সমীকরণ সমাধানের কাজে। এত করেও বড়জোর সাতদিন পরের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া যায়। খুব সম্ভবত পৃথিবীর আবহমণ্ডল একটি অতিকায় বিশৃঙ্খল সিস্টেম (chaotic system)। বহু আগে থাকতে তার গতিপ্রকৃতি অনুমান করা কিংবা তাকে নিয়ন্ত্রণ করার স্বপ্ন হয়ত কোনদিনই সফল হবে না। তাই, আবহবিদের দুশ্চিন্তা নিরসনের কোন উপায় আপাতত বিজ্ঞানের জানা নেই।

গ্রন্থ নির্দেশিকার 8 নম্বর গ্রন্থে লোরেঞ্জের আবিষ্কারের কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

দুই

জনসংখ্যার এলোমেলো পরিবর্তন

স্কুলে শেখা অঙ্কের নিয়ম সব জায়গায় খাটে না। একটা আমের দাম চার টাকা হলে পাঁচ ডজন আমের দাম কত? এই প্রশ্নের উত্তর 5 x 12 x 4 = 240 টাকা বলে স্কুলে শেখানো হয়। এখানে আমরা ধরে নিয়েছি যে মোট খরচ (C) হচ্ছে আমের সংখ্যার (N) একটি নির্দিষ্ট গুণিতক, অর্থাৎ C = KN যেখানে K হচ্ছে একটা আমের দাম। K যদি ধ্রুবক হয় তাহলে আমরা বলি যে C হল N-এর সমানুপাতিক। C এবং N-এর মধ্যে একটা লেখচিত্র টানলে সেটা সরলরেখা হবে। স্কুলে শেখা অঙ্কে C এবং N-এর মধ্যেকার সম্পর্ককে রৈখিক (linear) ব'লে ধরা হয়।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এরকম নাও হতে পারে। কেনা জিনিসের সংখ্যা বাড়লে মোট দামও বাড়তে থাকবে, কিন্তু তা যে সমানুপাতেই বাড়বে এমন কোনো কথা নেই। যেমন, ওপরের উদাহরণে ফলবিক্রেতাকে 210 টাকায় পাঁচ ডজন আম দিতে রাজি করানো যেতে পারে—তাহলে প্রতি আমের দাম দাঁড়াবে 3·50 টাকা। সেক্ষেত্রে ফলওয়ালা K কে আমের সংখ্যা N-এর ওপর নির্ভরশীল করে দিল। N বাড়লে K একটু কমে। এবার কিন্তু C এবং N-এর মধ্যেকার লেখচিত্র সরলরৈখিক হবে না। দেখা যাচ্ছে বাস্তব জগতে কেনা বস্তুর পরিমাণ এবং তার মূল্যের মধ্যেকার সম্পর্ক অরৈখিক (non-linear) হ'তেই পারে।

আশেপাশে অরৈখিক সম্পর্কের উদাহরণ অনেক। ধরা যাক রাস্তার মাঝখানে দুই ব্যক্তি, A এবং B-র, ঝগড়া লেগেছে। উত্তেজিত A চড়া গলায় B-র সঙ্গে কথা বলছে — A-র স্বরের তীব্রতা, মনে করি, 1 একক। ঝগড়ার নিয়মটা এরকম একজন যত জোরে কথা বলছে দ্বিতীয়জন তার ডবল জোরে, অর্থাৎ দ্বিগুণ তীব্রতায় উত্তর দিচ্ছে। আর এটা ঘটছে ঠিক এক সেকেন্ড পর পর। সময়ের সঙ্গে A এবং B-র আওয়াজের তীব্রতা কিভাবে বদলাবে তা সঙ্গের সারণীতে দেখানো হলো।

এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে T সময় পরে আওয়াজের তীব্রতা হবে 2T, অর্থাৎ তীব্রতা T-র সমানুপাতে নয় এক্সপোনেনশিয়াল হারে বাড়ছে (exponentially
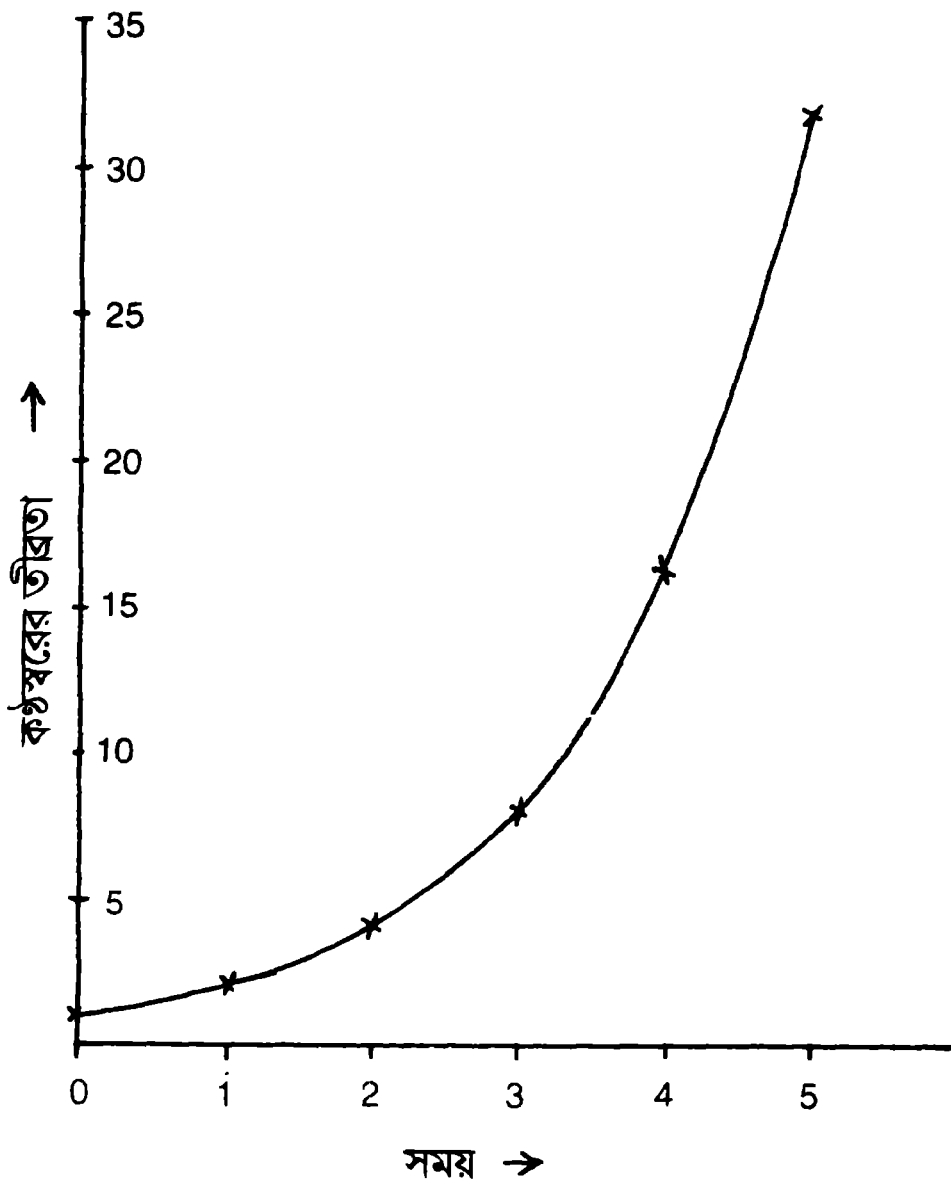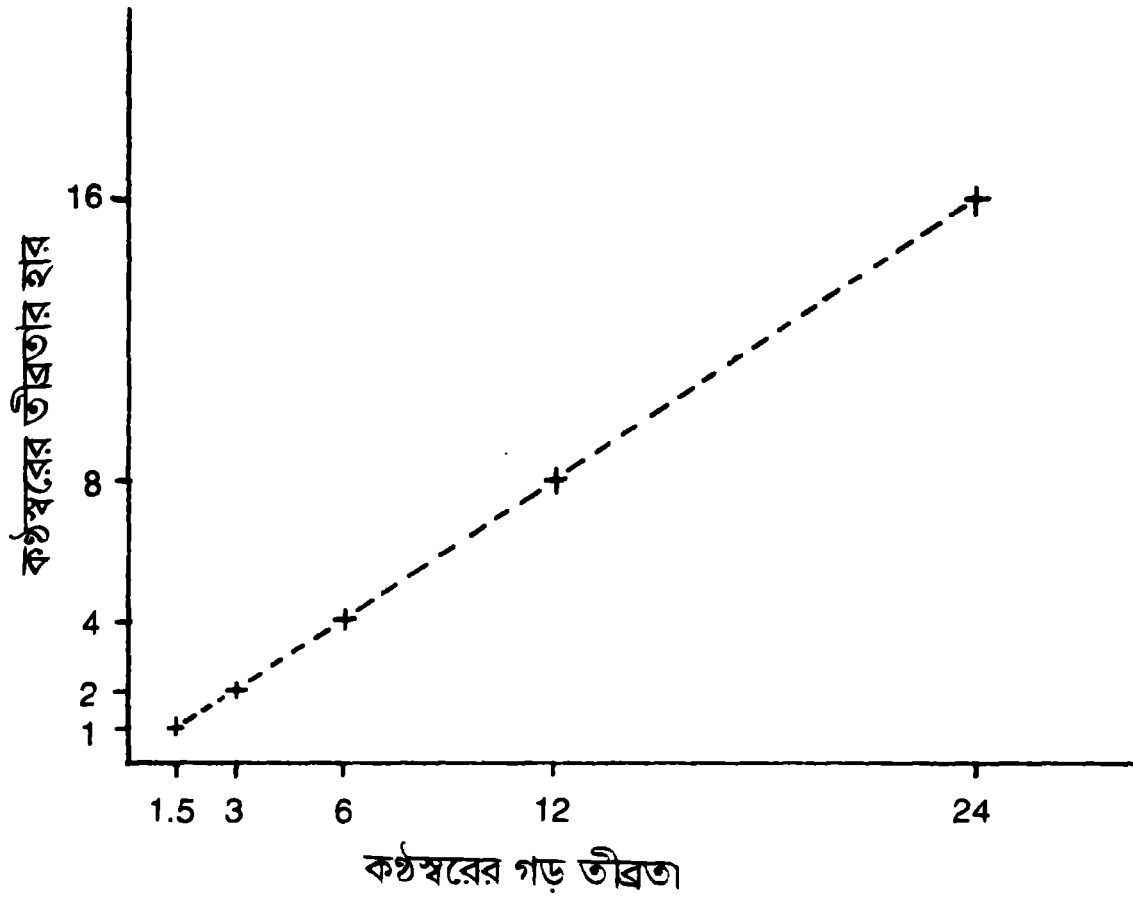
চিত্র 2·1 রাস্তার ঝগড়ার রৈখিক মডেল। গলার আওয়াজের গড় তীব্রতা এবং ঐ তীব্রতা বাড়ার হার—এই দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক রৈখিক।

increasing)। এখন দেখা যাক এক সেকেন্ড পর পর তীব্রতার পরিবর্তনের হার এবং গড় তীব্রতা কিভাবে বদলাচ্ছে। গড় তীব্রতা দ্বিগুণ হ'লে দেখা যাচ্ছে, পরিবর্তনের হারও দ্বিগুণ হচ্ছে সেই একই সময়ের মধ্যে। অর্থাৎ তারা সমানুপাতী এখানে একই উদাহরণ রাশি ভেদে রৈখিক এবং অরৈখিক দু'রকম সম্পর্কই পাওয়া গেল (চিত্র 2·1 দ্রষ্টব্য)।

সারণী

ব্যক্তি	সময়	আওয়াজের তীব্রতা	গড় তীব্রতা	তীব্রতা বৃদ্ধির হার
A	0	1	1.5	1
B	1	2	3	2
A	2	4	6	4
B	3	8	12	8
A	4	16	24	16
B	5	32		

ঝগড়ার এই মডেলটা খুব বাস্তবসম্মত নয়। কেননা আওয়াজের তীব্রতা এখানে একতরফাভাবে বেড়েই চলেছে। একটা সত্যিকারের ঝগড়া এরকম হবেনা —সেখানে হয়ত পরস্পরের প্রতি আস্ফালনের পর আওয়াজটা গোড়ার দিকে ধীরে ধীরে বাড়বে। এরপর একটা স্তরে বৃদ্ধিটা তীব্রভাবে হবে। কিন্তু তারপর আওয়াজটা আর আগের মত দ্রুততায় বাড়বে না। না বাড়ার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত মানুষের গলার স্বরতন্ত্রীর ক্ষমতার একটা সীমা আছে। এছাড়াও বাদানুবাদ থেকে হাতাহাতি বেধে যাওয়ার ভয় বা অন্য কারও মধ্যস্থতাও তীব্রতার সীমাহীন বৃদ্ধিকে আটকাতে পারে। ফলে, তীব্রতা যত বাড়ছে, সেটার বৃদ্ধির হারও ততই বেড়ে চলেছে—এ ব্যাপারটা আর হবে না। তারা একে অপরের সমানুপাতিক না হয়ে সম্পর্কটা অরৈখিক হয়ে যাবে। গলার আওয়াজের তীব্রতা প্রথমে বাড়বে; শুরুতে ধীরে তারপর দ্রুত; কিন্তু একটা নির্দিষ্টমাত্রায় পৌঁছনোর পর সেটা না বেড়ে একই জায়গায় কিছুক্ষণ স্থির থাকবে, তারপর কমতে শুরু করে অন্তিম পর্যায়ে শূন্যে নেমে আসবে। ঐ শূন্যমান ঝগড়ার সমাপ্তি নির্দেশ করবে। তীব্রতার পরিবর্তনের হার ঠিক এইভাবে বদলাবে না—কারণ এই দুই রাশি আর পরস্পর সমানুপাতিক নেই। ঐ পরিবর্তনের হার প্রথমে বাড়বে, তারপর কমে তার মান

শূন্য হবে, তারও পরে সেই হার ঋণাত্মক হয়ে যাবে। 2·2 নম্বর চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে।
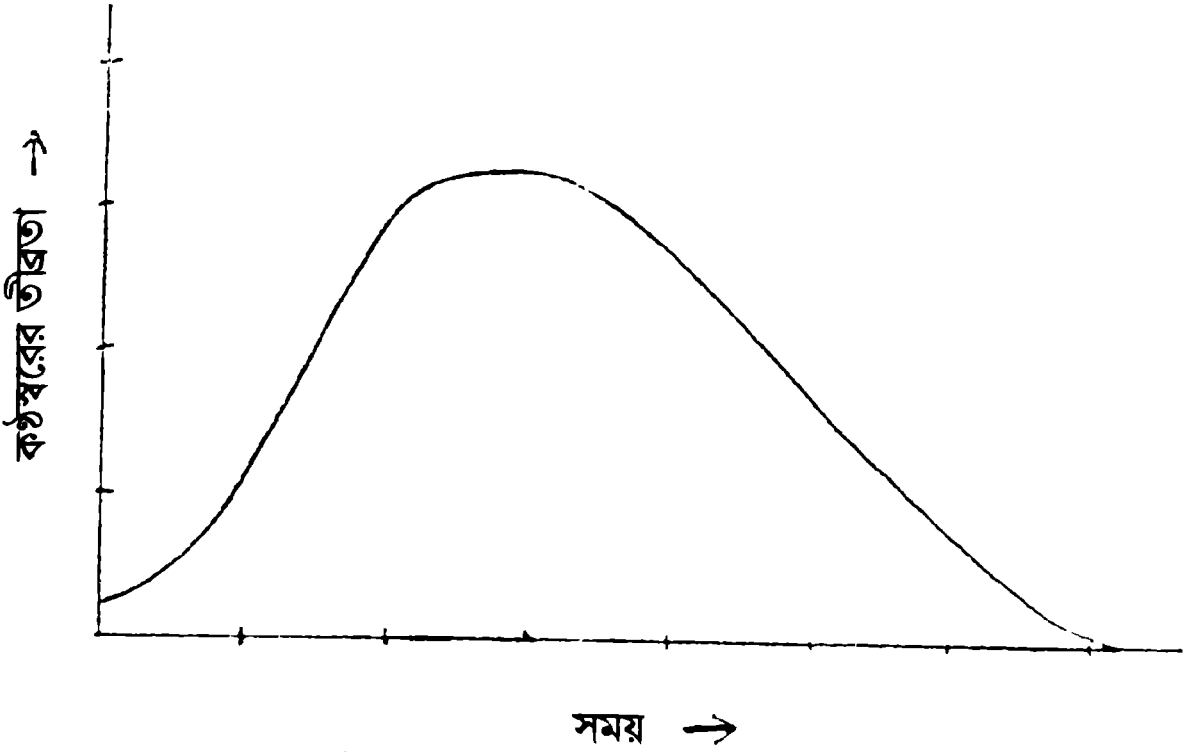
চিত্র 2·2 রাস্তার ঝগড়ার অরৈখিক মডেল।

ওপরের উদাহরণে অরৈখিকতা একটা গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছে—পরিস্থিতিটাকে বিস্ফোরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু এর উল্টোটাও ঘটতে পারে। যেমন, A এবং B দুটো দেশের মধ্যে এই করে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

ঝগড়ার ক্ষেত্রে যেমন আওয়াজের তীব্রতা নেওয়া হয়েছিল এক্ষেত্রে দু'দেশের বৈরীতার সূচক হিসেবে আমরা তাদের অস্ত্রসম্ভারের আকার বিবেচনা করতে পারি। ধরা যাক অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধির হার দুটো পরস্পরবিরোধী কারণের ওপর নির্ভর করে। প্রথম কারণটা দু'দেশের অস্ত্রসজ্জার গড় মাত্রার সঙ্গে সমানুপাতিক আর দ্বিতীয়টা সমানুপাতিক দু'দেশের মধ্যেকার ব্যবসা-বাণিজ্যের গড় মাত্রার সঙ্গে। প্রথম কারণে অস্ত্রসজ্জা বাড়ে, দ্বিতীয় কারণে কমে। শান্তির সময়ে এই দুই কারণ এমনভাবে পরস্পরকে প্রশমিত করে যাতে করে অস্ত্রবৃদ্ধির হার শূন্য হয়, অর্থাৎ সে সময়ে দু'দেশেরই অস্ত্রের ভাণ্ডার একটা নির্দিষ্ট মাপে স্থির থাকে।

কিন্তু এরকম হওয়াও খুবই সম্ভব যে প্রথম কারণটা গড়—অস্ত্রসজ্জার সমানুপাতিক হবে তখনই যখন অস্ত্রসম্ভারের আকার বেশ ছোট। আকারটা বেড়ে গেলে কারণটা হয়ত অস্ত্রসজ্জার বর্গের সমানুপাতিক হয়ে যায়; পারস্পরিক ভয় ও অবিশ্বাসের মাত্রা বেড়ে গিয়ে এমনটা হতেই পারে। আর সম্পর্কটা আগের মত সমানুপাতিক না থেকে যেই অরৈখিক হয়ে যায়—দুটো কারণের মধ্যেকার সাম্যাবস্থাও নষ্ট হয়ে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য আর অস্ত্রসজ্জাকে প্রশমিত করতে পারে

না। অস্ত্রের দৌড় ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে—সামান্য উস্কানিতেই এই বিস্ফোরক পরিস্থিতি যুদ্ধের আকার ধারণ করতে পারে।

এইভাবে, অরৈখিকতার ফলে একদিকে যেমন একটা বিস্ফোরক পরিস্থিতি (রাস্তার ঝগড়া) প্রশমিত হ'তে পারে তেমনই, অন্য দিকে, একটি সাম্যাবস্থা (দু'রাজ্যের মধ্যেকার শান্তি) সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হতে পারে। কি হবে তা পুরোপুরি নির্ভর করছে অরৈখিকতার জন্য সিস্টেমে কি ধরনের "ফিড ব্যাক" (feed back) ফেরত আসছে তার ওপর। রাস্তার ঝগড়ার ক্ষেত্রে আওয়াজের মাত্রা খুব বেড়ে গেলে এই ফিড ব্যাক সেটাকে কমিয়ে আনছিল। এটাকে ঋণাত্বক বা নেগেটিভ ফিড ব্যাক বলে। অন্যদিকে শান্তির পরিস্থিতি যখন যুদ্ধের দিকে গড়াচ্ছিল তখন যুদ্ধাস্ত্রের মাত্রা কিছুটা বেড়ে গেলে ফিড ব্যাক সেটাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল—তার ফলে সংঘর্ষ ত্বরান্বিত হচ্ছিল। এটা ধনাত্বক বা পজিটিভ ফিড ব্যাকের উদাহরণ। অরৈখিকতার ফলে সাম্যে ফিরে আসা বা বিস্ফোরিত হওয়া—এ দুটোর কোনটাই না হতে পারে; বস্তুত কোন কোন ক্ষেত্রে তাই হয়—সিস্টেমটা বারে বারে দুটো অবস্থার মধ্যে দোল খেতে থাকে। নীচে বর্ণিত 'শিকার ও শিকারী' মডেল এর একটি অতিপরিচিত উদাহরণ।

ধরা যাক একটা দ্বীপে শেয়াল এবং খরগোশদের বাস। খরগোশদের জন্য দ্বীপে প্রচুর, প্রায় সীমাহীন খাদ্য রয়েছে। আর শেয়ালদের খাদ্য হলো খরগোশগুলো। খরগোশের সংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ভর করবে দুটো পরস্পর বিরোধী কারণের ওপর : একটা হ'ল তাদের বংশবৃদ্ধি (ধনাত্বক) যার জন্য অপর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান রয়েছে, অন্যটা হ'ল শেয়ালের মুখে পড়া (ঋণাত্বক)। শেয়ালদের সংখ্যাবৃদ্ধিও, একইভাবে, দুটো কারণের ওপর নির্ভরশীল। প্রথম কারণ খাদ্যাভাবে তাদের মৃত্যু (ঋণাত্বক) আর দ্বিতীয়টি হ'ল খরগোশ ধরতে পারা (ধনাত্বক)। এই পরিস্থিতির একটি সহজ গাণিতিক মডেল উপস্থাপিত করেছিলেন ভি. ভোলতেরা (V. volterra); সেই মডেলে একক সময়ে খরগোশ ও শেয়ালের পরস্পরের মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার সংখ্যাটাকে খরগোশের সংখ্যা এবং শেয়ালের সংখ্যার গুণফলের সমানুপাতিক ধরা হয়েছিল। এই গুণফলটাই এক্ষেত্রে অরৈখিকতার উৎস। সমস্যাটার গাণিতিক বিশ্লেষণ বেশ জটিল—তারমধ্যে না গিয়ে আমরা বরঞ্চ এর গুণগত দিকটা বোঝার চেষ্টা করি। শুরু করা যাক এমন একটা সময় থেকে যখন পর্যাপ্ত সংখ্যক খরগোশ বর্তমান। শেয়ালরা মেরে খাবার জন্য যথেষ্ট খরগোশ পাবে বলে তাদের সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু এটা হ'লেই খরগোশের সংখ্যা কমতে থাকবে। কমতে কমতে খরগোশের সংখ্যা যখন খুবই অল্প এবং তুলনায় শেয়ালের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে পড়বে তখন শেয়ালরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হবে। তারা অনাহারে মারা পড়তে থাকবে। এটা খরগোশদের পক্ষে সুখবর। এবার তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির পালা। বাড়তে বাড়তে এক সময় খরগোশের

সংখ্যা সেই জায়গায় আসবে যেখান থেকে আমরা আলোচনাটা শুরু করেছিলাম-তখন পুরো চক্রটা পুনরাবৃত হবে। এইভাবে খরগোশ এবং শেয়ালের সংখ্যা চক্রাকারে বাড়তে—কমতে থাকবে। এই দুই জীবের সংখ্যার মধ্যেকার গাণিতিক সম্পর্কটা জটিল—2.3 নং চিত্রে শিকার ও শিকারীর সংখ্যার ওঠা পড়ার একটা গুণগত ধারণা দেওয়া হয়েছে।
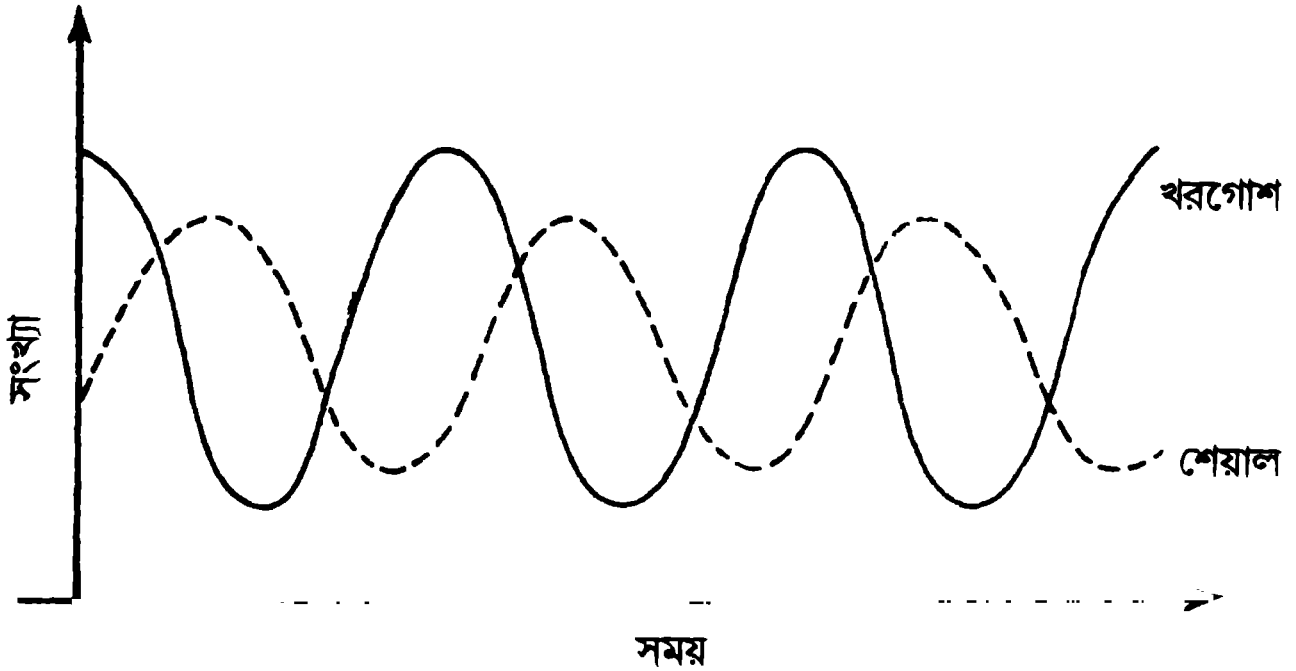
চিত্র 2·3 অরৈখিক শিকার—শিকারী মডেলে প্রাণী-সংখ্যার ওঠা পড়া।

পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়া আছে এরকম বিভিন্ন প্রজাতির জীবেদের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি বিজ্ঞানের যে শাখায় অধ্যয়ন করা হয় তাকে ইকোলজি (ecology) বলা হয়। কোনো একটি প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ইকোলজির আলোচনার বিষয় নয়। প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতি কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং তার ফলে পৃথিবী-পৃষ্ঠে প্রাণীকুলের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ কিভাবে ঘটে তাই এই বিজ্ঞানের আলোচ্য। দুটি প্রজাতির মধ্যেকার বিক্রিয়ার অরৈখিক চরিত্র একের সাপেক্ষে অন্যের জীব-সংখ্যার সততই পরিবর্তন ঘটায়। কখনো সেই পরিবর্তনে চক্রাকার ওঠা-পড়া দেখা যায়—যেমন শিকার-শিকারী মডেলে দেখা গিয়েছিল। কখনও আবার এই পরিবর্তন এত এলোমেলো ভাবে হয় যে তারমধ্যে কোনো নিয়ম বা ছন্দ থাকে না। এরকম কেন হয় তা একটু ভেবে দেখা যেতে পারে।

কোন সিস্টেমের আচরণ অনিয়মিত এবং জটিল হয়ে পড়লে বিজ্ঞানীরা তার ব্যাখ্যা সাধারণত দু'ভাবে করে থাকেন। একটা ব্যাখ্যায় বলা হয় যে সিস্টেমটাই জটিল—তাই তার আচরণও সেইরকম; বহু সংখ্যক প্রজাতি নিজেদের মধ্যে জটিল

মিথস্ক্রিয়া ঘটালে জীবের সংখ্যার পরিবর্তনও সহজ নিয়মে হবে না। অন্য ব্যাখ্যায় সিস্টেমটাকে সহজ এবং নিশ্চিত আচরণের ধরা হয় কিন্তু তার ওপর যে বাহ্যিক প্রভাব কাজ করে সেটা এলোমেলো এবং অনিশ্চিত ধরনের বলে সিদ্ধান্ত টানা হয় যে ঐ কারণেই নিশ্চয়তা বজায় থাকছে না। অভিকর্ষের টানে পতনশীল পাতার গতি এলোমেলো হাওয়ার প্রভাবে বদলে যাওয়া এর উদাহরণ। বাহ্যিক প্রভাবের এই এলোমেলো আচরণের জন্যও শেষ অবধি, বহু সংখ্যক জানা (বা অজানা) রাশির মিথস্ক্রিয়াকে দায়ী করা হয়। ফলত মূল কারণটা দু-ক্ষেত্রে একই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে — যেখানেই বহু সংখ্যক রাশি এক যোগে সিস্টেমের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সেখানেই জটিল আচরণ দেখা যায়। এই যুক্তি অনুযায়ী যে সব সিস্টেমের স্বাধীন রাশির (degreas of freedom) সংখ্যা অনেক তাদের কাছ থেকেই জটিল আচরণ আশা করা উচিত।

কিন্তু বিশৃঙ্খলা বা কেয়স-এর আবিষ্কারের পর এই সিদ্ধান্তটা ভুল প্রমাণিত হয়ে গেছে। দেখা গেছে যে সিস্টেমে যদি মাত্র দু-একটি স্বাধীন রাশি থাকে এবং তা পরিচালিত হয় সম্পূর্ণত নিশ্চয়তাবাদী নিয়মদ্বারা—যার মধ্যে অনিশ্চয়তার কোন স্থানই নেই—তাহলেও তার আচরণ ক্ষেত্রবিশেষে খুবই জটিল হয়ে উঠতে পারে। এরকম হওয়ার পূর্বশর্ত হ'ল পরিচালক মূল সূত্রগুলোকে অরৈখিক চরিত্রের হ'তে হবে। কেয়স বস্তুত সিস্টেমের অন্তর্নিহিত অরৈখিকতারই প্রকাশ। এই মূল সত্যটা যিনি প্রথম বুঝতে পেরে বাকি জগতকে জানান দেন তাঁর নাম রবার্ট মে (Robert May)। পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে জীবন শুরু করলেও তিনি পরবর্তীকালে জীববিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে পড়েন।

তুলনামূলক ভাবে সহজ একটি অরৈখিক সমীকরণ নিয়ে কাজ করতে করতে তাঁর এই ব্যাপারটা চোখে পড়ে। ঐ জাতীয় সমীকরণকে লজিস্‌টিক (logistic) সমীকরণ বলা হয়। সীমিত খাদ্য সংবলিত পরিবেশে কোন প্রাণীর প্রজাতি কিভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে তা এই সমীকরণ দিয়ে মডেল করা যায়। অনেক প্রাণীই বংশবৃদ্ধি করে বছরের একটা বিশেষ সময়ে। তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি বিচার করতে গেলে বছর থেকে বছরে সেটা কেমন করে লাফ দিয়ে দিয়ে বাড়ছে (বা কমছে) তা বিচার করাই সুবিধাজনক। সারা বছর ধরে সেটা কিভাবে বদলাচ্ছে তা জানার দরকার নেই। এই জাতীয় বিচ্ছিন্ন (discrete) রাশির পরিবর্তন বিচার করা হয় 'ডিফারেন্স' (difference) সমীকরণের সাহায্যে। নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তনশীল রাশির 'ডিফারেনশিয়াল' সমীকরণের জায়গা নেয় এটা। এই লজিস্‌টিক ডিফারেন্স সমীকরণ আসলে এতটাই সহজ যে, আমরা দেখব, এটাকে বোঝার জন্য স্কুলে শেখা অঙ্কই যথেষ্ট। কিন্তু এটাকে নিয়ে কাজ করার সময় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ গুলো এত লম্বা হয়ে যায় যে অন্তত একটা পকেট-ক্যালকুলেটার ব্যবহার না করলে

চলে না। এই জন্যই কম্পিউটার সহজলভ্য হওয়ার আগে অবধি এই ধরনের সহজ সমীকরণের সমাধানের মধ্যে লুকিয়ে থাকা জটিল বৈচিত্র্য অনাবিষ্কৃত থেকে গেছিল।

ধরা যাক 'n' তম বছরে কোন প্রজাতির প্রাণীসংখ্যা হলো x_n। একবছর পরে, অর্থাৎ (n+1) তম বছরে ঐ সংখ্যা দাঁড়াবে

$$x_{n+1} = \lambda\, x_n$$

যেখানে λ দ্বারা প্রকাশিত রাশিটি বাৎসরিক বৃদ্ধির হার নির্দেশ করছে। এক্ষেত্রে বৃদ্ধি রৈখিক এবং তার কোন ঊধর্ধসীমা নেই—ব্যাঙ্কের ফিক্স্ড ডিপোসিটে চক্রবৃদ্ধি সুদে টাকা যে ভাবে বেড়ে চলে এটাও ঠিক সেই রকম। যেমন, ধরা যাক, 15% সুদে টাকা খাটছে; সেক্ষেত্রে এক বছরে 100 টাকা 115 টাকায় পরিণত হবে, অর্থাৎ $\lambda = 1.15$। পরের বছর ঐ 115 টাকাকেই আসল বলে ধরতে হবে; দ্বিতীয় বছরের শেষে সুদে-আসলে সেটা দাঁড়াবে $115 \times 1.15 = 132.25$ টাকায়। জমার মেয়াদের যদি কোন ঊধর্ধসীমা না থাকে এবং ব্যাঙ্কের সুদের হারও অপরিবর্তিত থাকে তাহলে টাকাটা এইভাবে ক্রমাগত বেড়েই যাবে। ঠিক একই ভাবে, রৈখিক নিয়মে বর্ধমান কোনো প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যাও সীমাহীনভাবে বেড়েই চলবে।

কিন্তু যে পরিবেশে খাদ্যের যোগান সীমিত সেখানে এইভাবে বৃদ্ধি ঘটতে পারবে না। প্রাণীসংখ্যা বাড়লে সীমিত খাদ্যের জন্য প্রতিযোগীতা বাড়বে এবং বেড়ে যাবে মৃত্যুর হারও। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে বৃদ্ধির সূচক λ আর সেক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় ধ্রুবক থাকবে না। নতুন পরিস্থিতিতে λ, থাকে আমরা λ_L নাম দিতে পারি, হয়ে পড়বে প্রাণীসংখ্যার ওপর নির্ভরশীল একটি পরিবর্তনীয় রাশি। রৈখিক মডেলের পুরোনো λ কিন্তু একটি অনপেক্ষ ধ্রুবক ছিল।

প্রাণীর মোট সংখ্যার বদলে আমরা কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ের প্রাণীসংখ্যাকে ঐ সংখ্যার সর্বোচ্চমান যা হতে পারে তাই দিয়ে ভাগ করে সেই ভগ্নাংশটা নেব। ধরা যাক এই ভগ্নাংশের মান x; স্পষ্টতই x-এর মান 0 এবং 1-এর মধ্যে থাকবে। যখন x-এর মান খুব ছোট, শূন্যের কাছাকাছি তখন খাদ্যের যোগান যথেষ্ট, প্রতিযোগীতা প্রায় নেই। তখনকার λ_L এর মান সীমাহীন খাদ্যের যোগান থাকলে যা হ'ত সেই λ র মানের খুব কাছাকাছি হবে। ফলে সীমাস্থ মানগুলো আমরা এইভাবে লিখতে পারি :

$$x = 0 \text{ হ'লে } \lambda = \lambda_L$$

অন্যদিকে x যখন প্রায় 1-এর সমান তখন মৃত্যুহার বেড়ে যাওয়ায় λ_L শূন্যের কাছাকাছি হবে। অর্থাৎ :

$$x = 1 \text{ হ'লে } \lambda_L = 0$$

এই দুই শর্তই পূরণ হয় যদি ধরি যে $\lambda_L = \lambda\ (1\text{-}x)$; তাহলে সীমিত খাদ্যের পরিস্থিতিতে সমীকরণটি দাঁড়ালো,

$$x_{n+1} = \lambda(1\text{-}x_n)x_n$$

আগের রৈখিক সমীকরণের তুলনায় এটাতে একটা পদ বেশি আছে। সেই পদটি, অর্থাৎ — λx^2_n অরৈখিক। এটাই হ'ল সেই বহু - আলোচিত লজিস্টিক সমীকরণ।

বছরে বছরে প্রাণীসংখ্যা কিভাবে বদলায় এই সমীকরণ থেকে তা জানা যায়। প্রথম বছর একটা সংখ্যা (x_1) দিয়ে শুরু করলে তা থেকে দ্বিতীয় বছরের মান (x_2) বাঁ দিকে পাব। এই মান পুনর্বার সমীকরণের ডান দিকে বসালে ফল হিসেবে বাঁ দিকে তৃতীয় বছরের প্রাণীসংখ্যা (x_3) পাওয়া যাবে। অবশ্যই, λ র মান জানা থাকা চাই। এইভাবে যতদূর ইচ্ছে এগোনো যায়। দেখা যাচ্ছে গণিতের এই পদ্ধতিতে কোনো এক ধাপে জানা রাশির মান ঢুকিয়ে (input) ফল হিসেবে যা (out put) পাওয়া যাচ্ছে সেটাকেই পরের ধাপে জানা মান হিসেবে 'ইনপুট' দেওয়া হচ্ছে; সে বারের 'আউটপুট' যা বেরোবে সেটা হবে তারও পরের বারের ইনপুট। এইভাবে যতবার ইচ্ছে হিসেবটা করা যায়। এই পদ্ধতির নাম পুনরাবৃত্তি (iteration)। এখন প্রশ্নটা হ'ল বারংবার পুনরাবৃত্তির পর লজিস্টিক সমীকরণ থেকে পাওয়া x_n এর মান কি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার সন্নিকটে পৌঁছয়? অর্থাৎ সেই প্রজাতির প্রাণীসংখ্যা কি কোনো নির্দিষ্ট মানে স্থির হয়?

প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া কঠিন। প্রকৃতপক্ষে, এই উত্তর দিতে গিয়েই বিশৃঙ্খলা বা কেয়স-এর কথা এসে পড়ে। আমরা বরঞ্চ প্রশ্নটাকে একটু সহজ করে দিই, জানতে চাই প্রাণীসংখ্যা নির্দিষ্ট স্থির মানে পৌঁছবে এটা ধরে নিলে সেই মান কি হবে? এটার উত্তর বের করা বেশ সহজ। একবার সাম্যাবস্থায় পৌঁছে গেলে পুনরাবৃত্তির পরও সমীকরণ থেকে একই মান বার বার ফেরত পাওয়া যাবে। তারমানে x_n এর মান যদি x হয় তাহলে x_{n+1} এর মানও সেই x। অর্থাৎ লেখা যায় :

$$x = \lambda\ x\ (1-x)$$

এর সমাধান হিসেবে দুটো মান পাওয়া যাচ্ছে - হয় $x = 0$ অথবা $x = 1-{}^1/_\lambda$। মানে, হয় সেই প্রজাতি একদম লোপ পাবে ($x = 0$) অথবা তার সাম্যাবস্থার মান λ র ওপর নির্ভর করবে; যেমন $\lambda = 2.5$ হলে $x = 0.6$ হবে। কিন্তু সাম্যাবস্থায় প্রজাতিটি আদৌ পৌঁছবে কি?

সেটা নির্ভর করবে λ র মানের ওপর। λ যদি 1 এর চেয়ে কম হয় তাহলে প্রাণীর সংখ্যা প্রতিবছরই কমতে থাকে এবং শেষ অবধি শূন্যে এসে ঠেকে। এটা সাম্যাবস্থা ঠিকই কিন্তু খুবই বৈচিত্র্যহীন পরিস্থিতি, কেননা প্রজাতিটিই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। $\lambda = 0.7$ এর জন্য পরিস্থিতিটা কিরকম হয় তা 2.4 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

কিন্তু যদি $\lambda > 1$ হয়? ধরা যাক $\lambda = 2$ এবং $x_1 = 0.8$ ধরে শুরু করা যাক। দ্বিতীয় বছরের প্রাণীসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে

$$x_2 = 2 \times 0.8\ (1 - 0.8) = 0.32$$
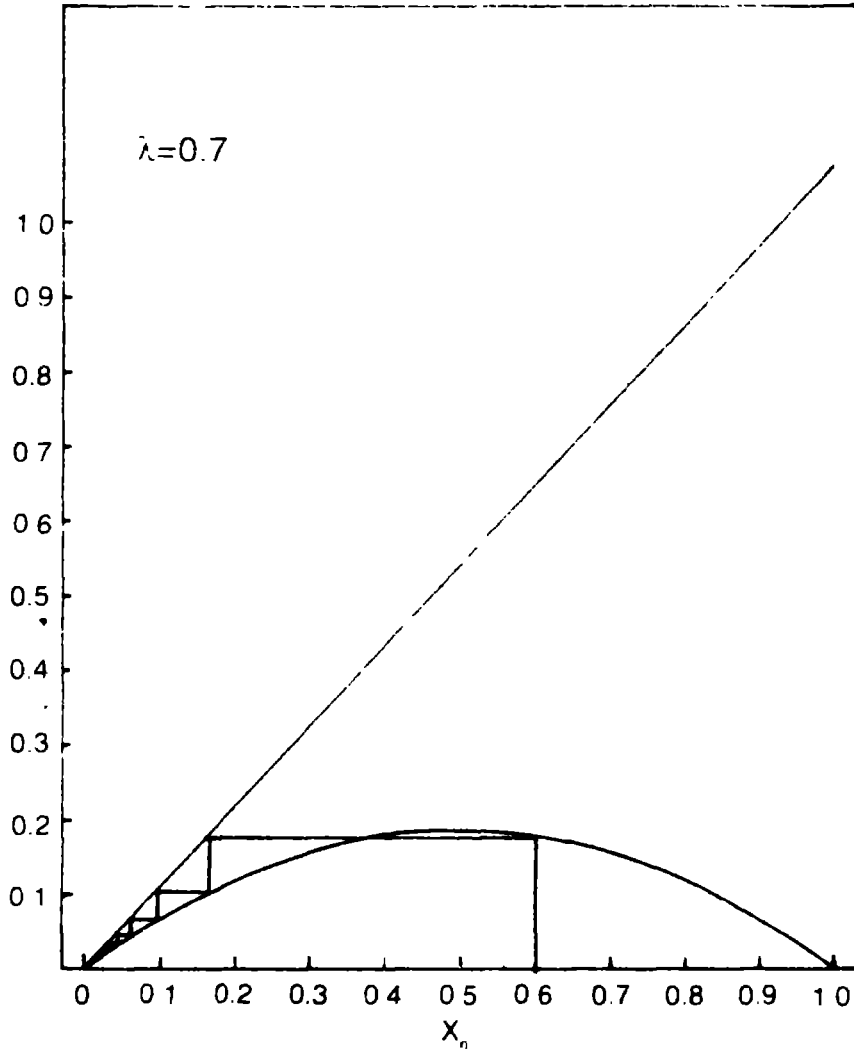
চিত্র 2·4 $\lambda = 0{\cdot}7$ এবং প্রাথমিক প্রাণী সংখ্যা $x_1 = 0{\cdot}6$-এর জন্য লজিসটিক সমীকরণের পুনরাবৃত্তি। দেখা যাচ্ছে প্রাণীসংখ্যা শেষ অবধি শূন্যতে পরিণত হচ্ছে। $y = \lambda\, x(1 - x)$ রেখাটিকে যে উল্লম্ব রেখাগুলি স্পর্শ করছে তারা প্রাণীসংখ্যাকে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে নিয়ে যাচ্ছে। আনুভূমিক রেখাগুলি পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে।

x_3 নির্ণয় করার সময় x_2 র এই মান ইনপুট হিসেবে যাবে :

$$x_3 = 2 \times 0.32\ (1 - 0.32) = 0.4352$$

এটা পরিষ্কার যে নিয়মটা খুবই সোজা কিন্তু গণনার ফল হিসেবে বেরিয়ে আসা সংখ্যাটা ক্রমশ বেশ জবড়জং আকার ধারণ করছে। সেই জন্যই একটা ছোট কম্পিউটার বা নিদেন একটা পকেট ক্যালকুলেটারের সাহায্য না নিলে ঐ সংখ্যাটা কোন নির্দিষ্ট মানে স্থিতিশীল হতে চলেছে কিনা তা নির্ণয় করা সহজ হবে না। 2.5 নং চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি যে সত্যিই সংখ্যাটা একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছে স্থির হয়ে যাচ্ছে। সেই মান হ'ল $x = 0.5$। সাম্যাবস্থায় ফর্মুলায় $\lambda = 2$ বসালেও এই একই মান পাওয়া যাচ্ছে :

$$x = 1 - {}^{1}/_{\lambda} = 1 - ½ = 0.5$$

বিশেষ করে যে ব্যাপারটা এখানে লক্ষ্যণীয় সেটা হ'ল সাম্যাবস্থায় x এর মান, যে প্রাথমিক মান থেকে গণনা শুরু করা হয়েছিল তার ওপর নির্ভর করে না, একমাত্র λ'র মানের দ্বারাই তা নির্ধারিত হয়। এটা যাচাই করে দেখার জন্য λ র মান আগের মতই λ= 2 রাখা হ'ল, কিন্তু প্রাণীসংখ্যার প্রাথমিক মানটা ভিন্ন, ধরা যাক x_1 = 0.4 নেওয়া হ'ল। এবারেও, দেখাযাবে, সমীকরণের পুনরাবৃত্তির ফলে মানটা x = 0.5-ই এসে দাঁড়াচ্ছে। 2.5 নম্বর চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে।
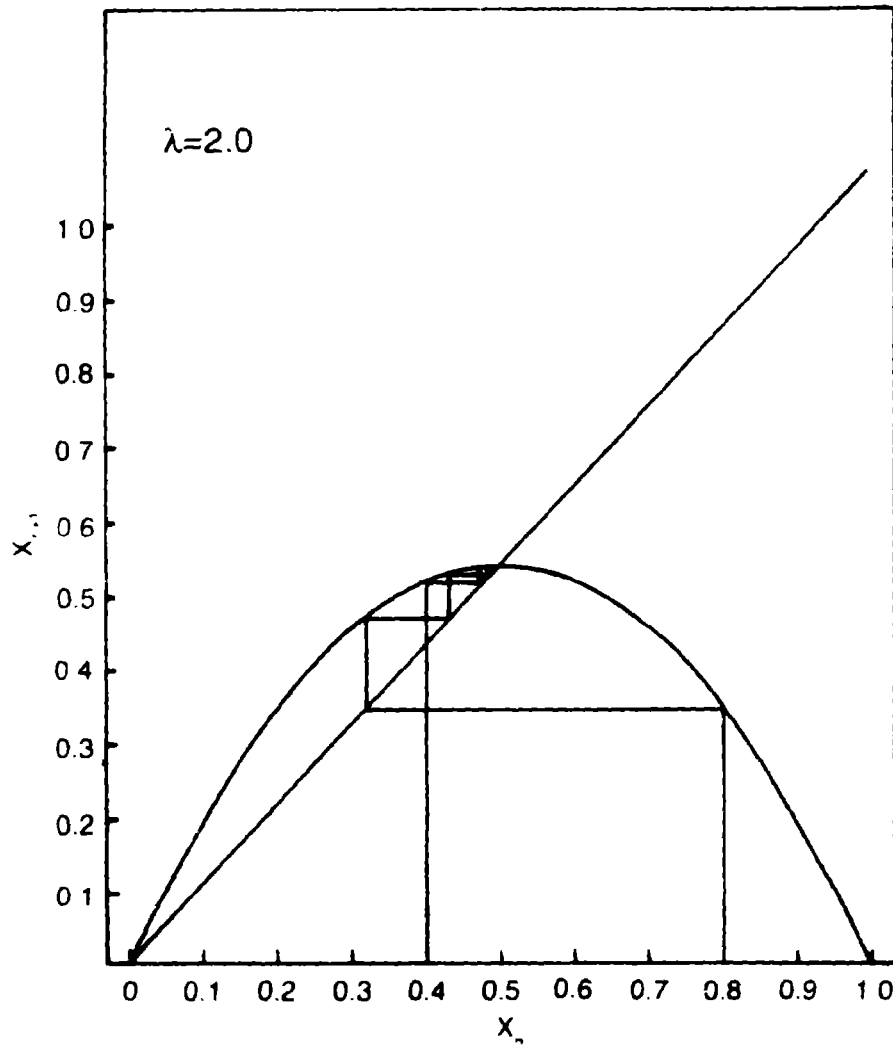
চিত্র 2·5 λ = 2 এবং দুটি প্রাথমিক মান x_1 = 0·8 এবং x_1 = 0·4 এর জন্য লজিসটিক সমীকরণের পুনরাবৃত্তি। দুটি ক্ষেত্রেই প্রাণী সংখ্যা সাম্যস্থিত মান x = 0·5 এ পৌঁছে যাচ্ছে।

l= 3 অবধি ব্যাপারটা এইভাবেই চলতে থাকে। পর্যাপ্ত-সংখ্যক পুনরাবৃত্তির পর প্রজাতির প্রাণী সংখ্যা একটি সাম্যাবস্থায় পৌঁছয় যেখানে $x = 1- {}^1/_\lambda$। কিন্তু λ–র মান তিন পেরিয়ে গেলে, একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়। তখন আর কোন একটা মানে x স্থির হয় না; তার বদলে দুটো নির্দিষ্ট মানের মধ্যে আবৃত্ত হতে থাকে। λ= 3.2 তে পরিস্থিতিটা কিরকম হয় তা 2.6 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রেও কিন্তু সিস্টেমের অন্তিম পর্যায়ের আচরণ x এর প্রাথমিক মান কি ছিল তার ওপর নির্ভর করছে না—করছে λ র মানের ওপর। বিভিন্ন প্রাথমিক মান বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে শেষ অবধি একই চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছবে—এবং তারপর

সিস্টেমের আচরণ আর বদলাবে না। একথাটা পরবর্তী আলোচনার প্রতিক্ষেত্রেও সত্যি—কিন্তু চিত্রগুলিতে সম্ভাব্য সবগুলি প্রাথমিক মান দেখানো হয়নি। ছবিগুলো যাতে বেশি ঘিঞ্জি না হয়ে যায় তারজন্যেই এই ব্যবস্থা। প্রাথমিক অবস্থায় কথা 'ভুলে' যাওয়াটা অরৈখিক সিস্টেমের একটা বিশেষ ধর্ম—এ প্রসঙ্গে আমরা বইয়ের পরের দিকে আবার ফিরব।
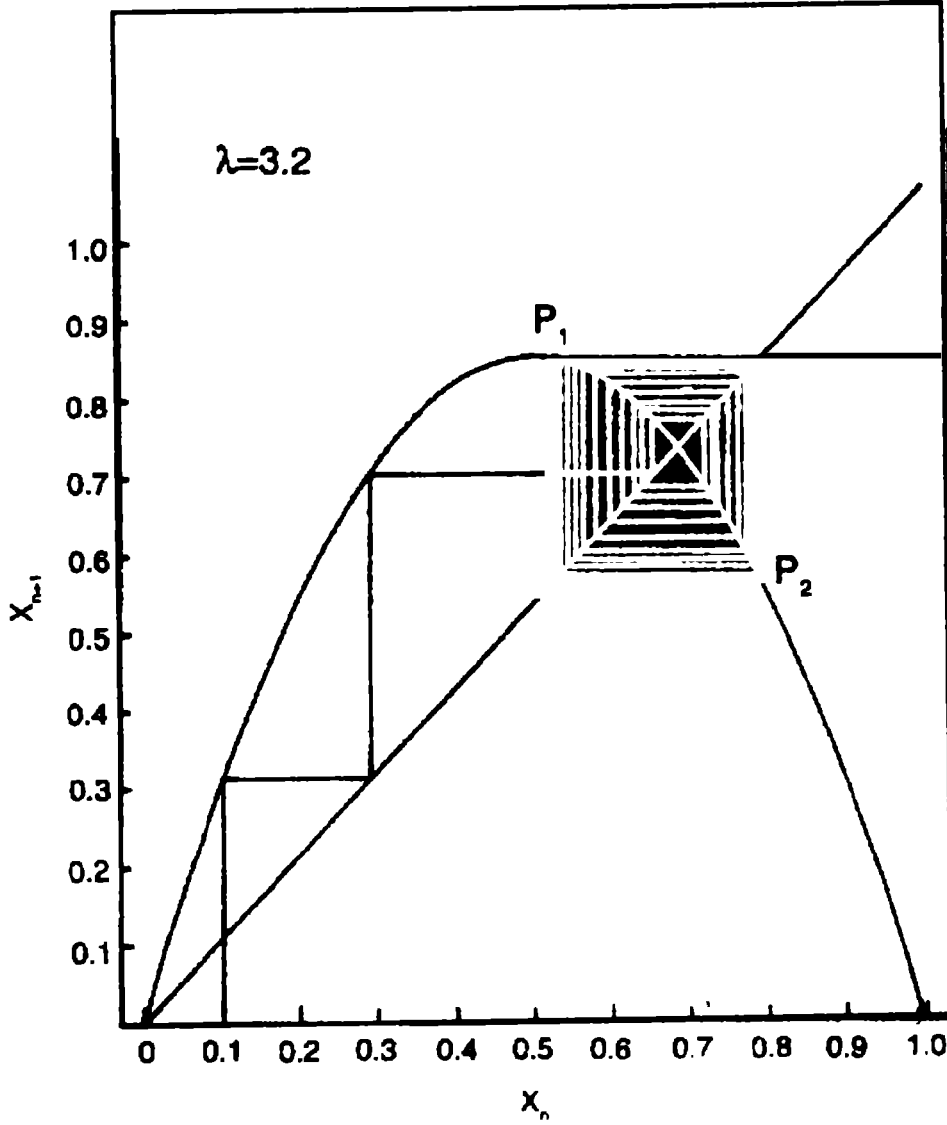
চিত্র 2·6 $\lambda = 3{\cdot}2$ এবং $x_1 = 0{\cdot}1$-এর জন্য লজিসটিক সমীকরণের পুনরাবৃত্তি। প্রাথমিক অস্থিরতার পর প্রাণী সংখ্যা P_1 এবং P_2 বিন্দুদ্বারা নির্দেশিত দুটি মানের মধ্যে দুলতে থাকে। (পর্যায় দুই অঞ্চল।)

প্রাণীর সংখ্যা যখন দুটি নির্দিষ্টমানের মধ্যে আবৃত্ত হ'তে থাকে তখন দু'বছর অন্তর একই মান ফিরে আসে। এটাকে "পর্যায়-দুই" অঞ্চল বলা হয়। λর মান আরও বাড়ালে, $\lambda = 3.449499$ পেরিয়ে গেলে, "পর্যায়-চার" অঞ্চল এসে পড়ে। তারমানে, তখন চারটি নির্দিষ্ট মানের মধ্যে আবৃত্তি ঘটতে থাকে। 2.7 নং চিত্রে $\lambda = 3.5$ এর জন্য এইরকম 'পর্যায়-চার' আচরণ দেখানো হয়েছে। আর একটু এগোলে, $\lambda = 3.544090$ পেরোলে পর্যায়কাল আবার দ্বিগুণ হ'য়ে "পর্যায়-আট" অঞ্চল শুরু হয়। λর মান বাড়াতে থাকলে এই ব্যাপারটা চলতেই থাকে। বিভিন্ন

চিত্র 2·7 λ = 3·5 এবং x_1 = 0·3-এর জন্য লজিসটিক সমীকরণের পুনরাবৃত্তি। প্রাথমিক অস্থিরতার পর প্রাণী সংখ্যার মান "পর্যায় চার" অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং P_1, P_2, P_3, এবং P_4 নির্দেশিত চারটি মানের মধ্যে জায়গা বদল করতে থাকে।
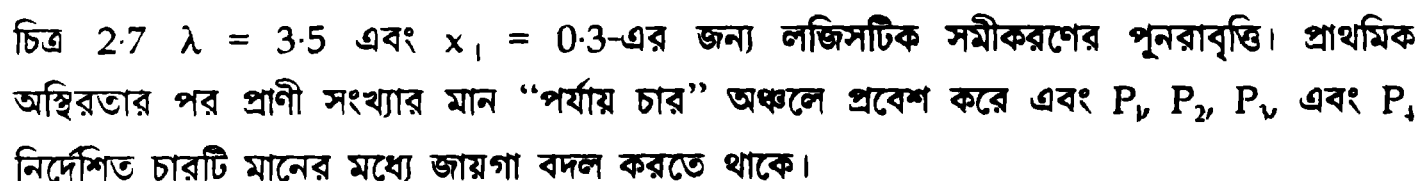
স্তরে পর্যায় দ্বিগুণ হ'তে হ'তে প্রাণীসংখ্যার মান 'পর্যায়- 16,32,64 ইত্যাদি পার হয়ে যেতে থাকে। এই ঘটনাকে সহজবোধ্য লেখচিত্রের আকারে আঁকার জন্য আমরা x-এর মানের প্রাথমিক সঞ্চরণটাকে গুরুত্ব না দিয়ে যদি শুধু বিভিন্ন পর্যায়ের স্থিরমানগুলিকে বিবেচনা করি এবং অরৈখিকতার সূচক λ র সঙ্গে ঐ সাম্যাবস্থার মানগুলির লেখ আঁকি তাহলে 2.8 নং চিত্রের মত একটি ছবি পাই। এ জাতীয় চিত্রকে দ্বি-বিভাজন (bifurcation) ডায়াগ্রাম বলা হয়। আগের চিত্রগুলিতে পরিবর্তনের যে চরিত্র দেখা গেছে সংক্ষেপিত রূপে সেগুলোই ধরা পড়েছে এই ডায়াগ্রামে। λ = 1 থেকে 3 অবধি প্রাণীসংখ্যার মাত্র একটি স্থির মান আছে — যেটাকে একক সরলরেখা হিসেবে আঁকা হয়েছে। λ = 3 তে এসে এই রেখা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দুটি রেখার সৃষ্টি করেছে; এখানেই আমরা "পর্যায় -2" অঞ্চলে প্রবেশ করলাম। ঐ দুটি রেখার প্রত্যেকটি আবার λ = 3.449499 তে এসে দু ভাগে বিভক্ত
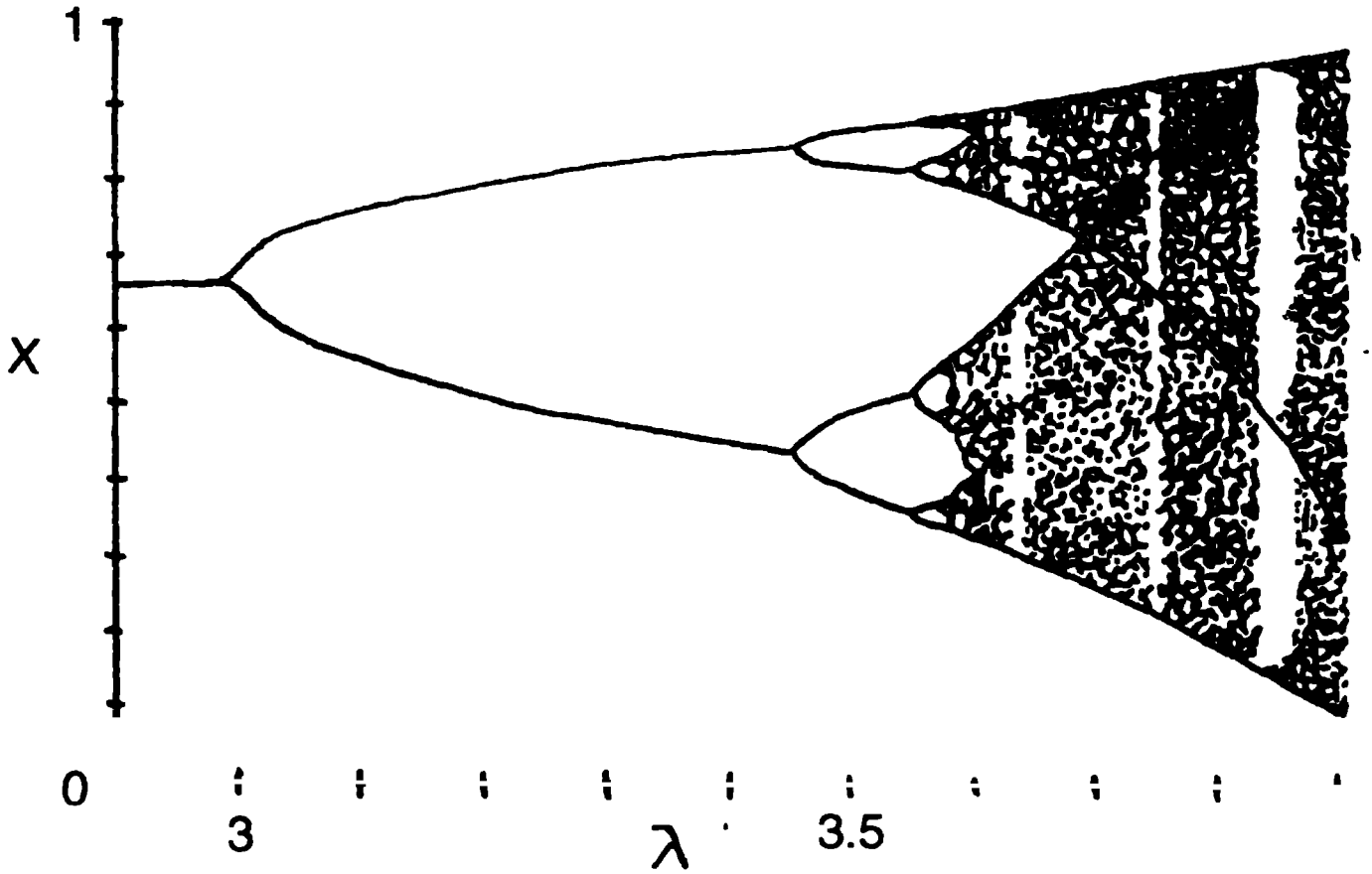
চিত্র 2·8 দ্বি-বিভাজন চিত্র (গুণগত চরিত্র প্রদর্শিত)। অরৈখিকতার সূচক λ-র সঙ্গে প্রাণীসংখ্যার পরিবর্তন চিত্রায়িত হয়েছে।

হয়ে 'পর্যায়'- 4 এর সূচনা নির্দেশ করছে। প্রত্যেক রেখার এইরকম দ্বি-বিভাজন চলতেই থাকে - অসীম পর্যন্ত।

কিন্তু দুটো বিভাজনের মধ্যে ফারাক ক্রমশই কমতে থাকে - λ র যে মানে এটা ঘটে তারা ক্রমশ কাছাকাছি চলে আসতে থাকে। ফলে অসীম (infinite) পর্যায়কালে পৌঁছতে খুব বেশিদূর যেতে হয় না। λ = 3.569946 অবধি পর্যায় দ্বিগুণ হওয়াটা বোঝা যায়। তার পর x এর মান অসংখ্য হয়ে পড়ে, তার মান একটা থেকে আরেকটা সংখ্যায় বদলে বদলে যায়—কিন্তু পুরোনো কোন মানে সেটা দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না। এইটাই বিশৃঙ্খলা বা কেয়সের অঞ্চল। এই অঞ্চলে দ্বি-বিভাজন চিত্রের বহুধাবিভক্ত দাঁড়াগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বিন্দু-সমষ্টি তৈরি করে।

বিশৃঙ্খলার এই অঞ্চলে, মনে হতে পারে, কোনো নিয়মই আর খাটছে না, প্রজাতির প্রাণীসংখ্যার মান এখানে যা খুশি তাই হতে পারে। তাহলে কি 'কেয়স' নিয়মহীনতার (randomness) আরেক নাম? সাধারণ চোখে তাই মনে হবে। কিন্তু বিজ্ঞানের আধুনিকতম বিচারে দেখা যাচ্ছে যে এই আপাত নিয়মহীনতার তলায় এক সূক্ষ্ম নিয়ম এবং শৃঙ্খলা বজায় রয়ে গেছে।

লজিস্টিক সমীকরণের বিশৃঙ্খল অঞ্চলের গভীরে প্রবেশ করলে এই নতুন ধরনের গঠনশৈলী চোখে পড়ে। λ = 3.569946 এর ওপারে অনেক নতুন নতুন

চমক অপেক্ষা করে থাকে। λ র কিছু মানের জন্য হঠাৎ ক'রে বিশৃঙ্খলা অদৃশ্য হ'য়ে যায়—সে জায়গায় 'পর্যায় - 3' বা 'পর্যায় - 7' এর আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ ঐ অঞ্চলটা অবিমিশ্র বিশৃঙ্খলার নয়—তার মাঝে মাঝে শৃঙ্খলার ফালি রয়ে গেছে কিছু কিছু। ঐরকম একফালি শৃঙ্খলার অঞ্চলকে যদি আবার খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যায় যে সেখানেও 'পর্যায় - 3' দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পর্যায় - 6, 12 বা 24 তৈরি করে, পর্যায় -7 থেকে তৈরি হয় পর্যায় -14, 28, 56 ইত্যাদি। এ সব কিছুর মাঝ থেকে যে মূল বার্তাটা বেরিয়ে আসছে সেটা হ'ল এই যে 'কেয়স' এবং সাধারণ এলোমেলো নিয়মহীনতা (randomness) এক জিনিস নয়।

প্রাথমিক অবস্থার প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার জন্য নিশ্চয়তাবাদী নিয়মে বাঁধা সিস্টেমের ভবিষ্যত অনুমান অসম্ভব হয়ে পড়ার নামই কেয়স বা বিশৃঙ্খলা —একজন আবহবিদ এরকম ভাববেন। আবার একজন ইকোলজিস্টের মনে হবে বৃদ্ধির নিশ্চয়তাবাদী নিয়মের মধ্যেও প্রাণীসংখ্যার অনিয়মিত ওঠা-পড়াতেই কেয়স বা বিশৃঙ্খলার প্রকাশ—যে বিশৃঙ্খলার গভীরে আবার এক ধরনের স্ব-সদৃশ গঠনশৈলী সুপ্ত হয়ে থাকে। এঁরা দুজনে কি একই জিনিস নিয়ে কথা বলছেন? হ্যাঁ, তাই বলছেন। লোরেঞ্জের আবহাওয়ার মডেলের লেখচিত্রেও স-সদৃশ (self-similar) গঠনশৈলী ফুটে ওঠে যদি চিত্রের রাশিগুলিকে ঠিকমত নির্বাচন করা যায়। অন্যদিকে, লজিসটিক—সমীকরণ নিয়ন্ত্রিত প্রাণীর সংখ্যা বিশৃঙ্খল অঞ্চলে এসে প্রাথমিক অবস্থার প্রতি অতি-সংবেদনশীলতা দেখায়। প্রাথমিক অবস্থায় সামান্য পরিবর্তন ঘটালে সেই বিচ্যুতি এক্সপোনেনসিয়াল হারে বাড়তে বাড়তে যায়। বর্ধিত বিচ্যুতির পরিমাপ করা হয় 'লিয়াপুনভ এক্সপোনেন্টের' সাহায্যে। লিয়াপুনভ এক্সপোনেন্ট ঋণাত্মক হ'লে বিচ্যুতিটা ওভাবে বাড়ে না এবং নিশ্চয়তাবাদী সূত্রের ভবিষ্যত নির্ধারণ ক্ষমতা বজায় থাকে। কিন্তু এক্সপোনেন্ট ধনাত্মক হলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। লজিস্‌টিক সমীকরণের বিশৃঙ্খল অঞ্চলে ঐ এক্সপোনেন্টের মান ধনাত্মক। ফলে খুঁটিনাটি বাদ দিলে লোরেঞ্জ এবং মে দুজনেই একই বিষয় নিয়ে কথা বলছেন—বিষয়টা হ'ল নিশ্চয়তাবাদের পরিসরে বিশৃঙ্খলা (deterministic chaos)।

নির্দেশিকার 2, 5, 8, 21 এবং 28 নম্বর গ্রন্থ ও প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তিন

গির্জাঘরের বাতি

কথিত আছে, আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে একদিন গ্যালিলিও গ্যালিলেই পিসা শহরের গির্জার ভেতরে ঝুলন্ত বাতির এপাশ ওপাশ দোলা মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। নিজের নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে মিলিয়ে ঐ দোলনের পর্যায়কাল সম্বন্ধে যে নিয়ম তিনি আবিষ্কার করেন তা একালের বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রেরই জানা : দোলনকালের মান দোলনের বিস্তারের ওপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ, একটি পূর্ণদোলনের পর্যায়কাল দোলকের সাম্যাবস্থা থেকে সর্বাধিক বিচ্যুতির ওপর নির্ভরশীল নয়, দোলনকাল যে দোলকের দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সঙ্গে সমানুপাতিক—তাও তিনি পরবর্তীকালে দেখান।
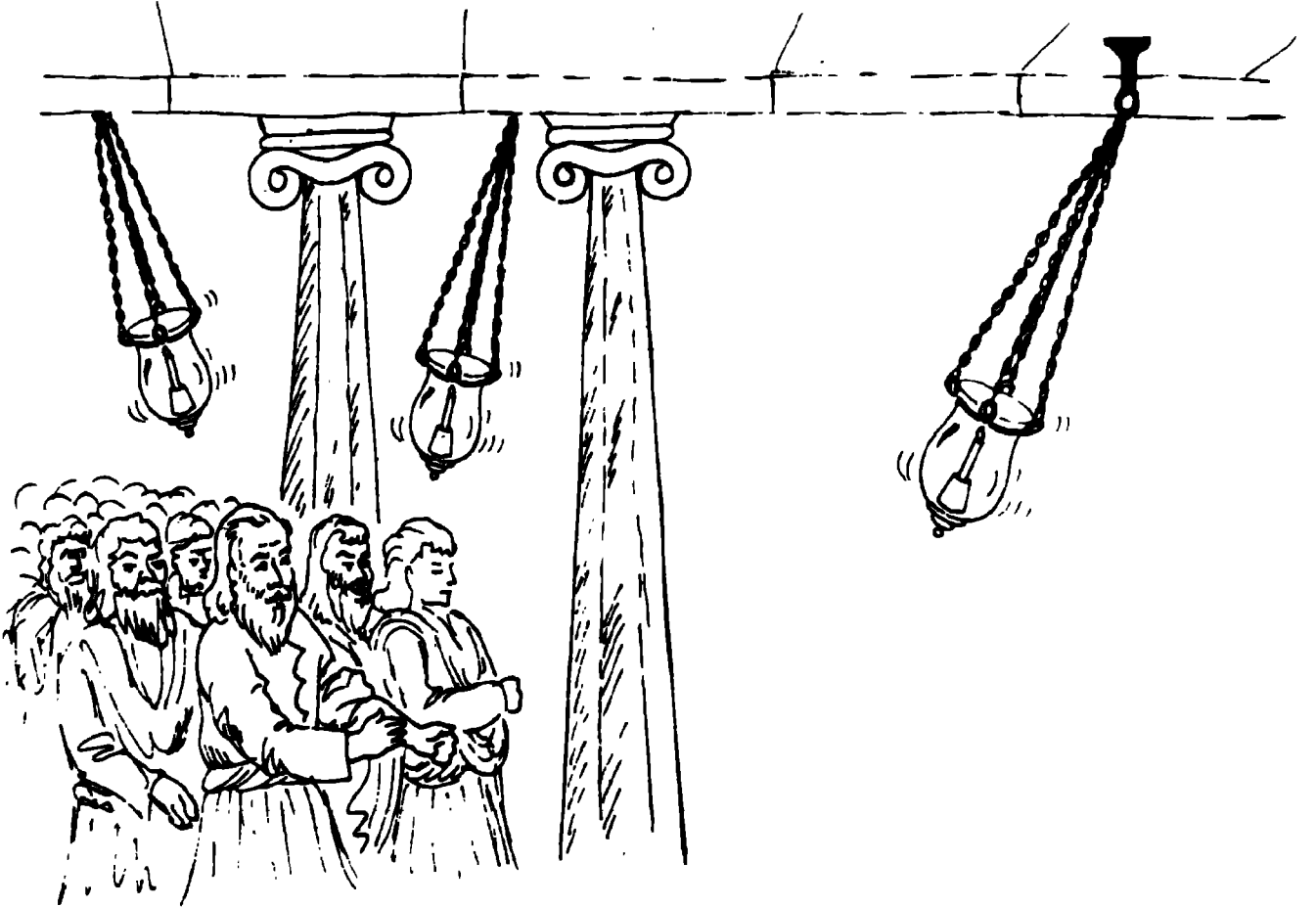
চিত্র 3·1 পিসার গির্জায় বাতির আন্দোলন। কথিত আছে এই দেখেই গ্যালিলিও রৈখিক দোলনের সূত্রাবলী আবিষ্কার করেন।

গ্যালিলিও এবং পরবর্তী চারশো বছরের বিজ্ঞানের সৌভাগ্য যে বাতিগুলোর দোলনের বিস্তার খুব অল্প ছিল। তা যদি না হ'ত তাহলে গ্যালিলিও অরৈখিক দোলনের অপরিচ্ছন্ন জটিলতার মুখোমুখি পড়তেন আর, তার মধ্যে থেকে তিনি বিশৃঙ্খলা আবিষ্কার করতে পারতেন বলেও মনে হয় না—গ্যালিলিওর মস্তিষ্ক যত উঁচুদরেরই হোক না কেন, তাঁর কাছে আধুনিক ক্যালকুলেটরের সমতুল্য কোন যন্ত্র ছিল না; কেয়স দেখতে পাওয়ার জন্য ঐ যন্ত্রটা অপরিহার্য।

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত হলেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরকম প্রায়ই ঘটে থাকে। এবিষয়ের একজন সমালোচক একবার মন্তব্য করেছিলেন: বিজ্ঞানে সত্যকে জানা দরকার ঠিকই কিন্তু 'পূর্ণ সত্য'কে না জানলেও চলে; ঐ আংশিক জানার ওপরে নির্ভর করেই বিজ্ঞান এগোয়। গ্যালিলিও যে নিয়ম আবিষ্কার করলেন তাতে সত্যের একটা অংশ ধরা পড়ল—কিন্তু তাতেই বিজ্ঞান এক ধাপ এগিয়ে গেল। দোলনের বিস্তার যখন অল্প হয় তখন দোলকের গতিপথ প্রায় সরলরেখা বরাবর হয়; বিচ্যুত দোলককে তার সাম্যের অবস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য ক্রিয়াশীল বল ঐ অবস্থান থেকে চ্যুতির সমানুপাতিক হয়। অর্থাৎ বিস্তার অল্প হলে দোলক একটি রৈখিক সিস্টেম। তার গতি নির্ণায়ক সমীকরণটি রৈখিক, দোলনকাল বিস্তারের ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রথাগত বিজ্ঞানে এই সরল দোলক এক অত্যন্ত সুন্দর সিস্টেম বলে পরিচিত। এর গতির সমীকরণের সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব। তা ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর উপযোগীতা কম নয়। যে কোন পর্যাবৃত গতিকেই অনেকগুলো সরলদোলক জাতীয় গতির সমষ্টি হিসেবে প্রকাশ করা সম্ভব—এটা গত শতাব্দীর ফরাসী গণিতজ্ঞ জোসেফ ফুরিয়ের প্রমাণ করে দেখান। আর এ থেকেই সরল দোলকের মূল মডেলের গুরুত্ব বেড়ে যায়। কিন্তু বিশৃঙ্খলা অবলোকনের জন্য এরকম রৈখিক সিস্টেম মোটেই উপযুক্ত নয়। তার জন্য দোলকটা বেশ অনেকটা করে দুলতে আরম্ভ করা দরকার।

বিস্তার (amplitude) বড় হলে দোলককে সাম্যবস্থায় ফিরিয়ে আনার বল সাম্যাবস্থা থেকে চ্যুতির সমানুপাতিক হয় না, ঐ দুই রাশির মধ্যেকার সম্পর্ক অরৈখিক হয়ে যায়।

যদি কৌণিক চ্যুতি (angular displacement) θ হয়, তাহলে ফেরৎ আনার বল $\sin\theta$ র সঙ্গে সমানুপাতিক; $\sin\theta$ র সঙ্গে θ র সম্পর্ক অরৈখিক। θ খুব ছোট হলে তার মান এবং $\sin\theta$ র মান প্রায় সমান হয়ে যায়।

সেই জন্যই বিস্তার সামান্য হলে দোলকের আচরণ রৈখিক হয়। দোলক যখন অরৈখিক তখন কিন্তু দোলনকাল বিস্তারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে - বিস্তার বাড়লে দোলনকাল বাড়ে। যত বেশি বেশি শক্তি একটা দোলককে সরবরাহ করা যাবে তার দোলনের বিস্তার ততই বাড়তে থাকবে। বাড়তে বাড়তে এক সময় সেটা

পুরো গোল হয়ে ঘুরে আসতে থাকবে। তখন তার গতি ঘূর্ণন এবং দোলনের একটা মিশ্রণ। ঘূর্ণন কেননা সেটা পুরো গোল হয়ে ঘুরে আসছে। দোলন - কারণ প্রতিবারই একটা বল তাকে প্রাথমিক সাম্যাবস্থায় (অর্থাৎ খাড়া অবস্থায়) ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিকে চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করার একটা ভালো পদ্ধতি আছে। ধরা যাক রেখচিত্রে x – অক্ষ বরাবর আমরা দোলকের সাম্যাবস্থা থেকে বিচ্যুতি (displacement) নির্দেশ করছি, আর y–অক্ষ বরাবর করছি এর কৌণিক বেগ
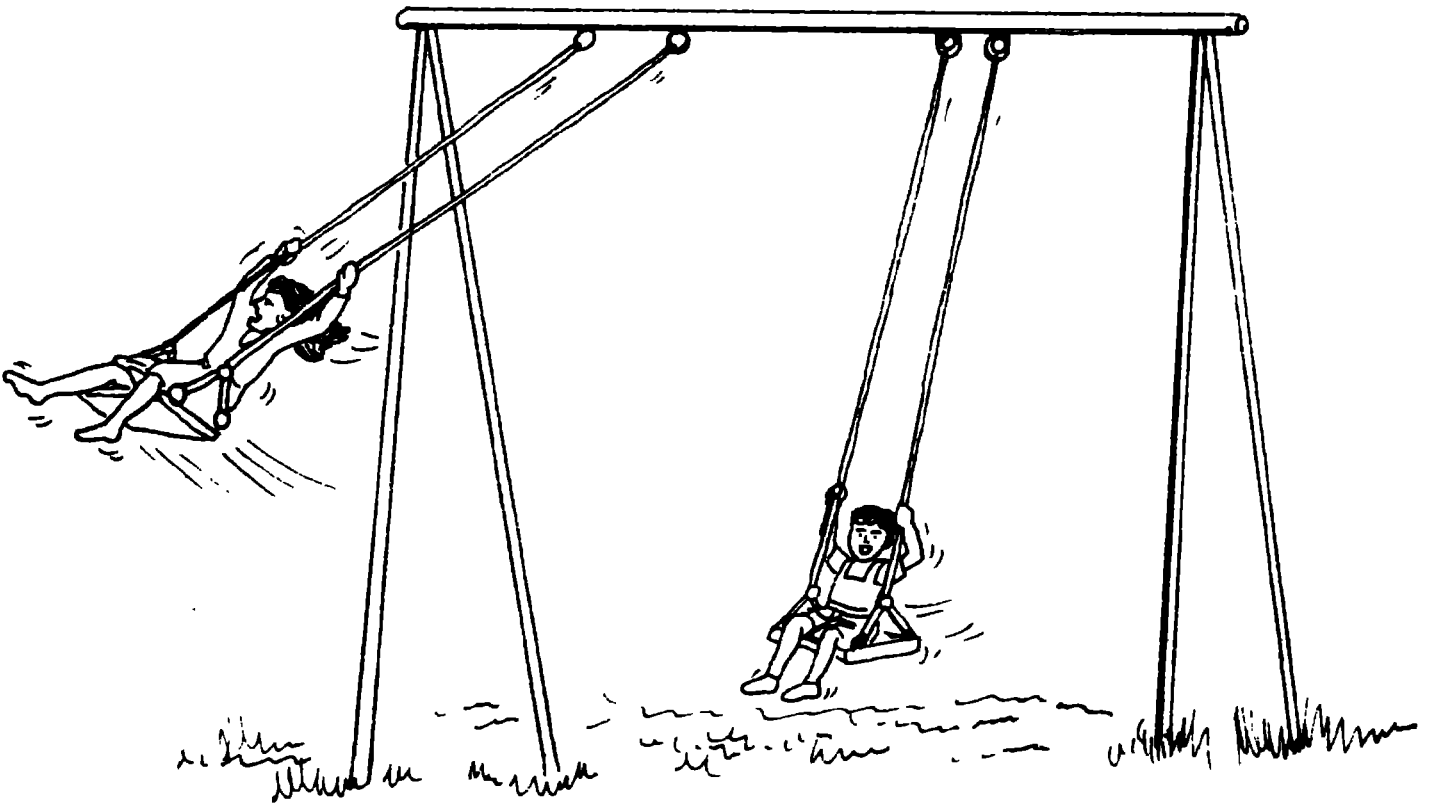
চিত্র 3·2 বাচ্চাদের পার্কে দোলনা। বিস্তার খুব বেশি হলে তার সঙ্গে সঙ্গে দোলনকালের মান বেড়ে যায়।

(angular velocity)। তাহলে xy-তলে একেকটা বিন্দু দোলকের একেক মুহূর্তের গতীয় অবস্থা প্রকাশ করবে। দোলক যেই দুলতে শুরু করে, তার অবস্থান ও বেগ প্রতিমুহূর্তে বদলাতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে xy-তলে ঐ বিন্দুটিও স'রে স'রে গিয়ে একটা রেখা অঙ্কন করে। xy-তলকে এক্ষেত্রে দোলকটির 'ফেজ্ স্পেস' (phase space) বলা হয়। এখানে স্পেস (space) বলতে যে স্থানে দোলকটি সত্যিই গতিশীল সেই জায়গাকে বোঝানো হচ্ছে না। এই স্পেস একটি গাণিতিক কল্পনা—গতিশীল বস্তুর অবস্থা নির্দেশ করতে বিজ্ঞানীরা এই জ্যামিতিক বর্ণনার সাহায্য নেন। দোলকের ফেজ্ স্পেস দ্বি-মাত্রিক। এটি একটি তল। যে সিস্টেমের বর্ণনায় এর চেয়ে বেশি রাশি লাগের তাদের ফেজ স্পেস উচ্চতর মাত্রার হবে।

ফেজ্ স্পেসে সরল, রৈখিক দোলকের গতিপথ বৃত্তাকার (সুবিধামত এককে প্রকাশ করলে)। এক পর্যায়-কাল পরে দোলক তার গতির পুনরাবৃত্তি ঘটায়। ফেজ্ স্পেস সূচক বিন্দুটিও বৃত্ত বরাবর একটি পূর্ণ আবর্তন সম্পূর্ণ করে। যত বেশি শক্তি সরবরাহ করা হবে বৃত্তের ব্যাসার্ধও ততই বড় হবে, কিন্তু বৃত্ত বরাবর আবর্তন সম্পূর্ণ করতে প্রত্যেকবারই সমান সময় লাগবে। (চিত্র 3.3 দ্রষ্টব্য)

অরৈখিক দোলকও তার গতির পুনরাবৃত্তি ঘটায়। যতক্ষণ অবধি এর গতিতে শুধুমাত্র দোলন থাকে ততক্ষণ ফেজ্ স্পেসে এর গতিপথ বদ্ধ বক্ররেখা বা লুপ এর আকৃতির হয় — কেবল তার আকার বৃত্তের মত না হয়ে উপবৃত্তের (ellipse) মত হয়। কিন্তু শক্তির সরবরাহ যদি এতটাই হয় যাতে দোলক গোল হয়ে ঘুরতে সক্ষম হয় তখন ফেজ্ স্পেসে চিত্রটা বদলে যায়। তখন গতিটা ঘূর্ণন এবং দোলনের মিশ্রণ এবং চিত্র তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে (চিত্র 3.4 দ্রষ্টব্য)।
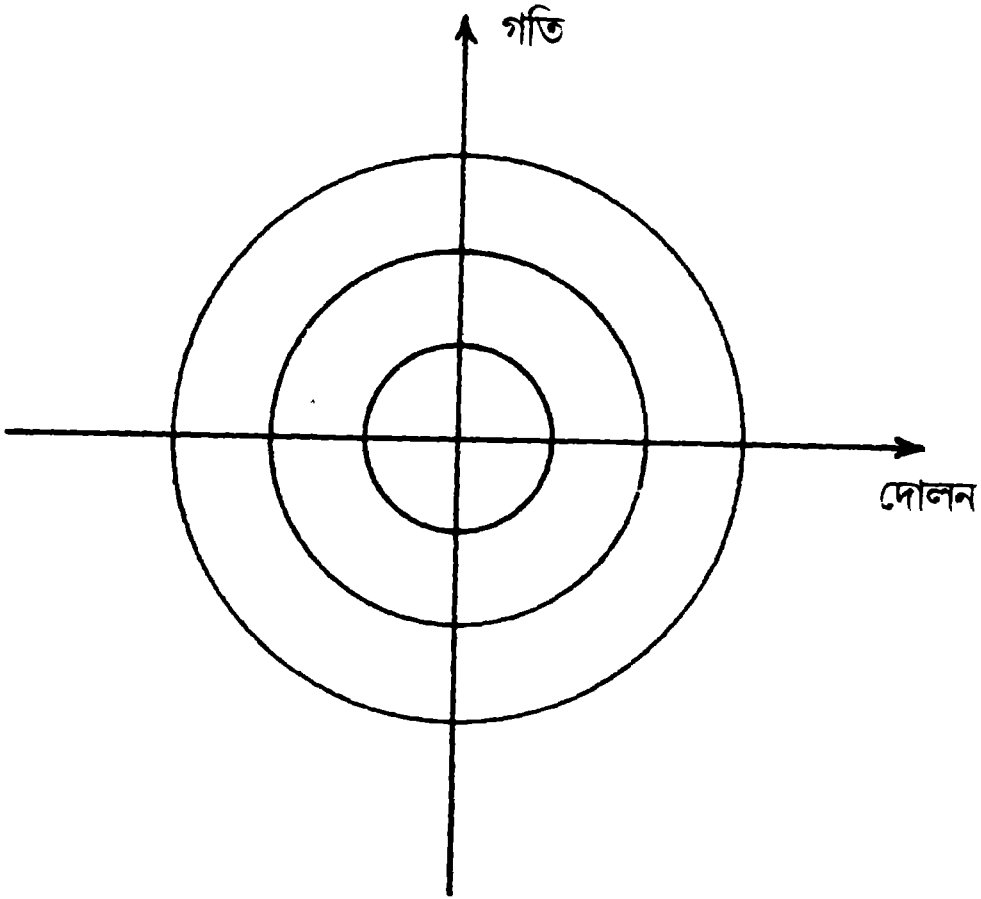
চিত্র 3·3 ফেজ স্পেসে রৈখিক (বাধাহীন) দোলকের পথরেখা। (বিভিন্ন শক্তির জন্য)।

বাস্তব জীবনে রৈখিক বা অরৈখিক কোন ধরনের দোলকই একবার দুলিয়ে ছেড়ে দিলে চিরকাল দুলতে থাকে না। যে বায়ুর মধ্যে দিয়ে দোলক আন্দোলিত হচ্ছে তার সান্দ্রতাজনিত বাধা, যে বিন্দু থেকে দোলকটি টাঙানো সেখানে ঘর্ষণের বাধা —এই সবের জন্য দোলকটির শক্তি একটু একটু করে তাপ শক্তিতে
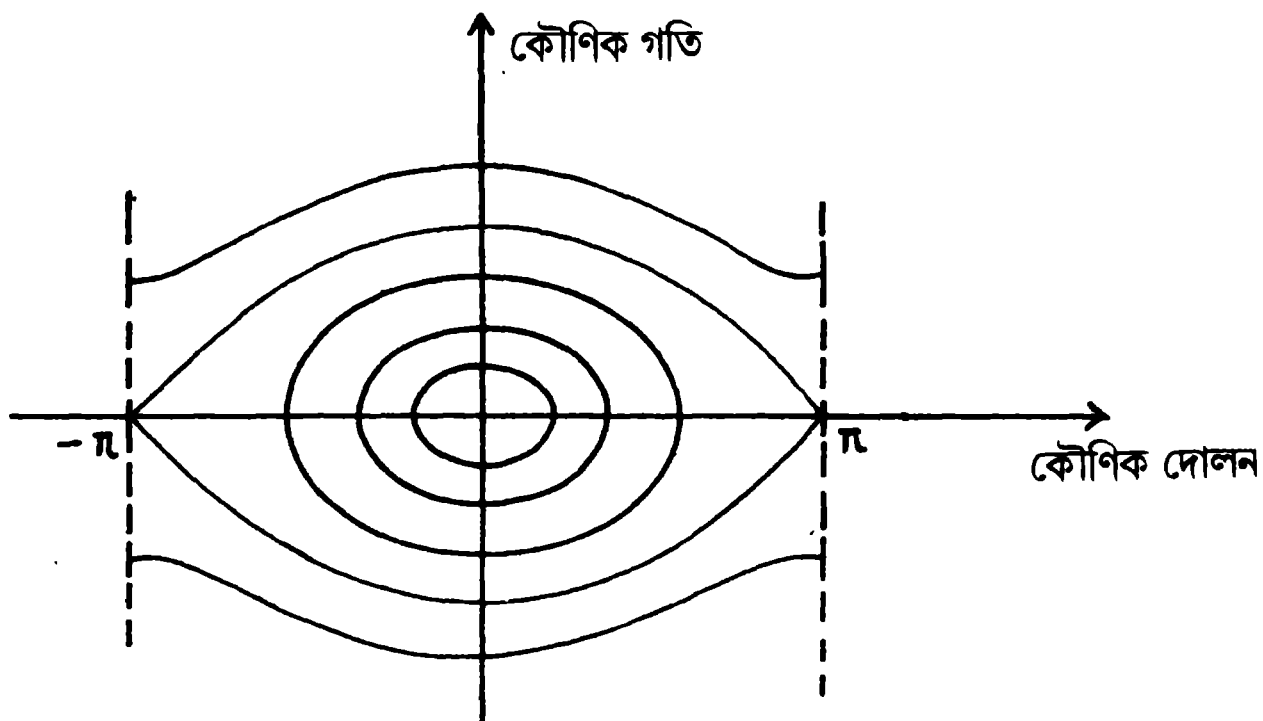
চিত্র 3·4 ফেজ স্পেসে অরৈখিক (বাধাহীন) দোলকের পথরেখা।

রূপান্তরিত হতে থাকে। ক্রমাগত শক্তিক্ষয়ের ফলে দোলকটি একসময় থেমে যায়। এইরকম বাধাপ্রাপ্ত দোলকের ফেজ্—চিত্র বৃত্তাকার হতে পারে না কেননা কোনোবারই দোলনশেষে সেটি ঠিক আগের অবস্থায় ফিরছে না। এক্ষেত্রে ফেজ্ স্পেসে চিত্রটি একটি স্পাইরালের আকারের হবে—শক্তিক্ষয়ের ফলে যার ব্যাসার্ধ ক্রমাগত কমে চলেছে (চিত্র 3.5 নং)। ছোট হ'তে হ'তে স্পাইরালটি একটি বিন্দুতে —ফেজ্ স্পেসের মূল বিন্দুতে (origin) এসে ঠেকে। তার মানে দোলকটি তার সাম্যাবস্থায়—স্থির, খাড়া অবস্থায়—ফিরে আসে।

বাধাপ্রাপ্ত দোলককে এই পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করার উপায় কি? স্পষ্টতই বাইরে থেকে ক্রমাগত শক্তির যোগান দিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ কোনো বাহ্যিক বল দোলকটিকে চালাবে। যেমন ইলেকট্রনিক দেওয়াল ঘড়িগুলোকে চালায় তার ভেতরের ব্যাটারী। ঘড়ির পর্যাবৃত্ত গতিকে শক্তি যোগাতে গিয়ে ব্যাটারী ফুরিয়ে যায়, তখন সেটা বদলে দিতে হয়। বাধাপ্রাপ্ত কিন্তু বাহ্যিক বলদ্বারা চালিত দোলক নিজে নিজে থেমে যাবে না।

মনে করা যাক একটা বাধাপ্রাপ্ত রৈখিক দোলককে চালাচ্ছে বাইরের কোন পর্যাবৃত্ত বল। একটা দোলককে আরেকটা দোলক চালাতে পারে—যদি তাদের আলম্ববিন্দু দুটি সংযুক্ত থাকে। বৈদ্যুতিক সার্কিটের ক্ষেত্রে এর তুলনা পাওয়া যাবে। সেই ক্ষেত্রে যেখানে বর্তনী (circuit) রয়েছে রোধ R, ক্যাপা-সিটেন্স C এবং ইনডাকটেন্স L। এই LCR বর্তনীকে যদি এ. সি. (A.C.) উৎসের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তাহলে তার আচরণ পর্যাবৃত্ত বলদ্বারা চালিত এবং বাধাপ্রাপ্ত দোলকের মত
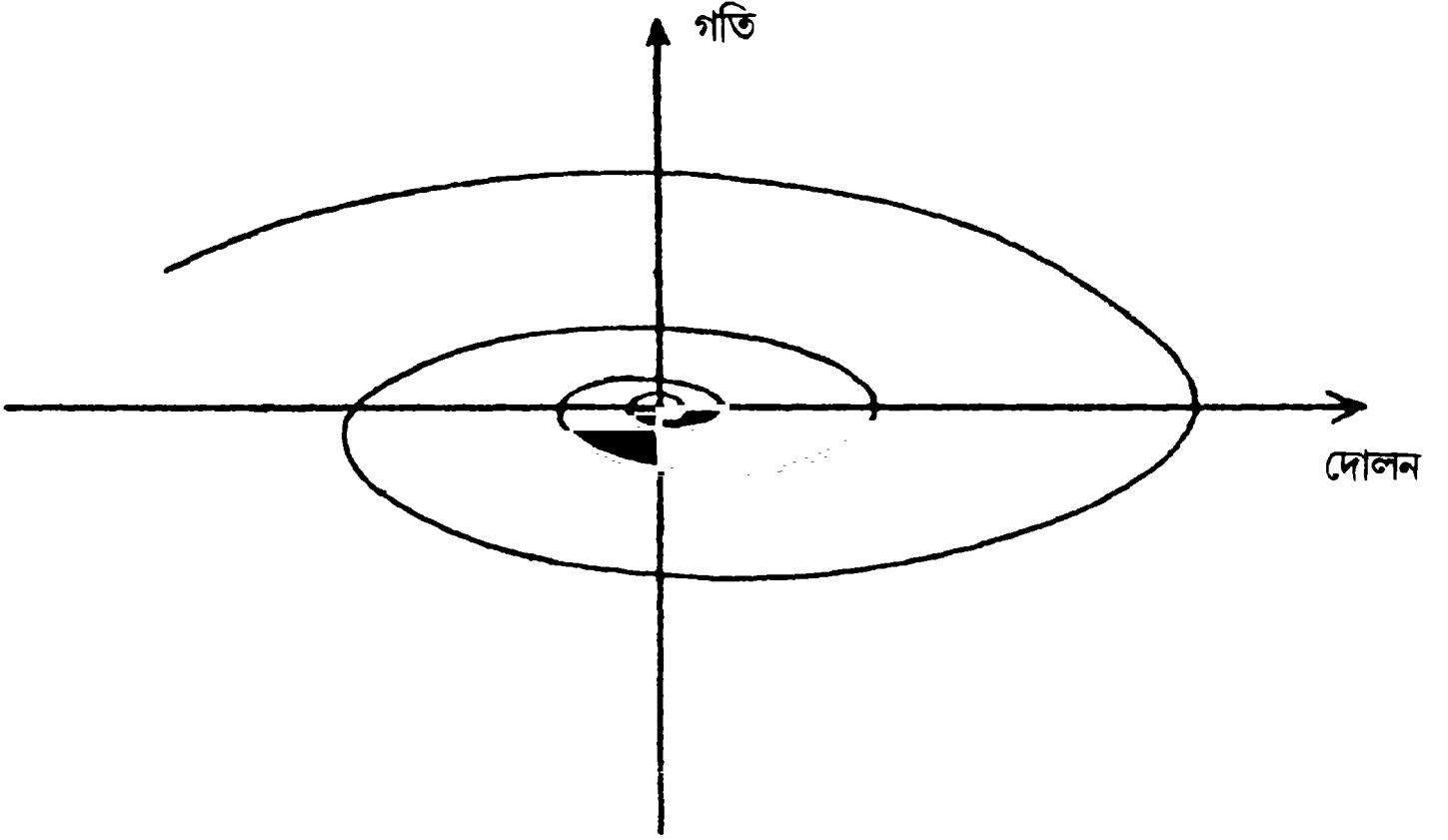
চিত্র 3·5 ফেজ স্পেসে বাধাপ্রাপ্ত দোলকের পথরেখা একটি স্পাইরালের আকার ধারণ করে যা মূলবিন্দুতে গিয়ে শেষ হয়।

হবে। এখন, দোলকটির নিজস্ব পর্যায়কালে রয়েছে, আবার বাইরের বলটিরও নিজের পর্যায়কাল আছে। দোলক কোন পর্যায় অনুযায়ী আন্দোলিত হবে? দেখা যায় প্রাথমিক অস্থির আচরণের পর দোলকটি বাইরে থেকে প্রযুক্ত বলের বশে চলে আসে এবং তারই পর্যায়কাল অনুযায়ী দুলতে থাকে। যদি দোলকের নিজস্ব দোলনকালও ঐ পর্যায়কালের খুব কাছাকাছি হয় তাহলে অনুরণন ঘটে. দোলনের বিস্তার খুব বেশি হয়। নইলে বিস্তার অল্পই থাকে। কিন্তু বাহ্যিক বল যতক্ষণ থাকে দোলকের পর্যাবৃত্ত দোলন একই ভাবে চলতে থাকে, বাধার ফলে কমতে কমতে সেটা স্থির অবস্থায় চলে আসে না।

ফেজ্-স্পেসে বাহ্যিক বল চালিত রৈখিক দোলকের রেখাচিত্র শেষ অবধি বৃত্তাকার হয়ে যায় - প্রাথমিক অস্থিরতার পর্ব শেষ হয়ে গেলে (চিত্র 3.6)। অর্থাৎ দোলকটি নির্দিষ্ট পর্যায়কাল ও বিস্তার নিয়ে দুলতে থাকে—সময়ের সঙ্গে সেটা আর বদলায় না। চূড়ান্ত রেখাচিত্র বাধাহীন রৈখিক দোলকের মত বৃত্তাকারই হয়—কেবল ঐ বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে যে সময় লাগে তা বাহ্যিক বলের পর্যায়কালের সমান, দোলকটির স্বাভাবিক দোলনকালের নয়।

বল প্রয়োগের ফলে দোলকটির বিস্তার যখন বাড়তে থাকে তখনই অরৈখিকতার ভূতের উপদ্রব শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতো সাম্যাবস্থায় ফেরত আনার
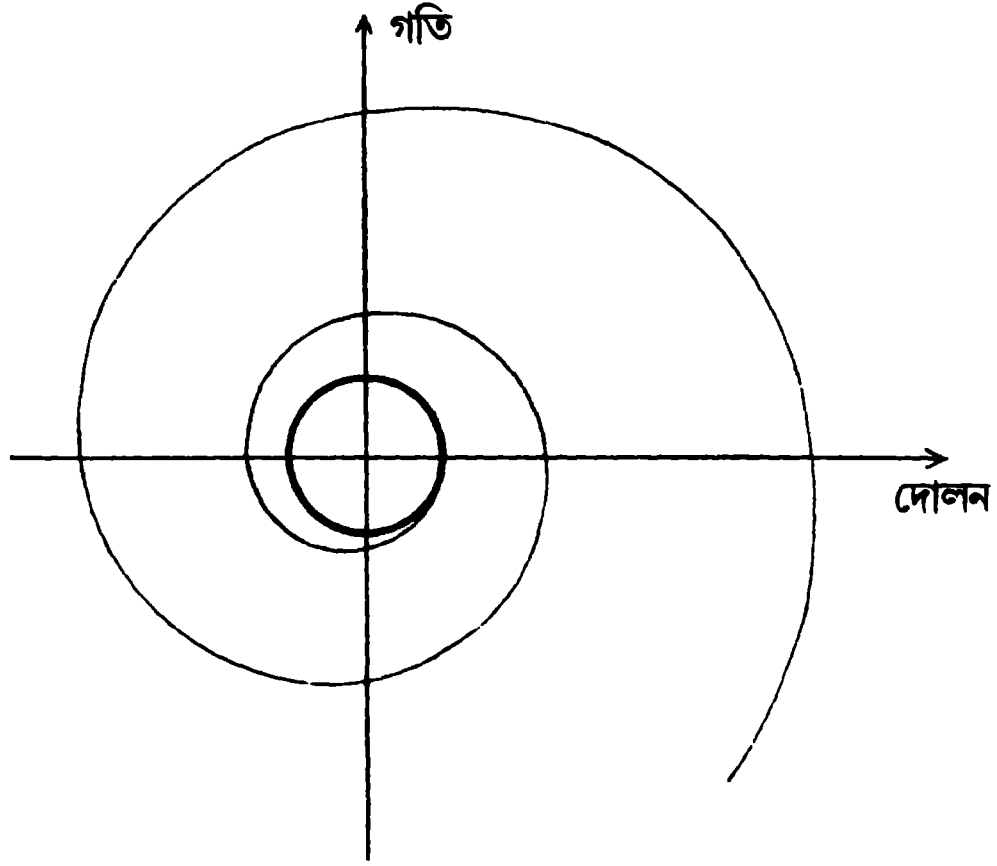
চিত্র 3·6 বহিঃস্থ পর্যাবৃত্ত বলদ্বারা চালিত একটি বাধাপ্রাপ্ত রৈখিক দোলকের ফেজ-চিত্র। মোটা দাগের রেখা স্থায়ী অবস্থা নির্দেশ করছে।

বল অরৈখিক হয়ে যায়। যে দোলকের আচরণ এর আগে অবধি নিয়মানুবর্তিতা এবং সারল্যের প্রতিভূ ছিল তা এবার অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। বাহ্যিক বলচালিত রৈখিক দোলকের মত এর কোন নির্দিষ্ট দোলনকাল থাকে না। পর্যাবৃত্ত এবং অনিয়মিত—এই দুরকম গতিরই সমস্ত লক্ষণ এর মধ্যে দেখা যায়। বাহ্যিক বল এবং বাধাদানকারী বলের সঙ্গে পর্যায়কালের সম্পর্কও খুব জটিল আকার ধারণ করে। আলোচনা সহজ করার জন্য আমরা এখানে বিশেষ এক ধরনের অরৈখিক দোলকের কথাই আলোচনা করব—এই দোলকের সাম্যাবস্থায় প্রত্যানয়ক বল (restoring force) বিচ্যুতির তৃতীয় ঘাতের (cube of the displacement) সঙ্গে সমানুপাতিক।

বাধাদানকারী বল যতক্ষণ বেশ বড় থাকে ততক্ষণ এই অরৈখিক দোলকের আচরণ তার সমতুল্য রৈখিক দোলকের চেয়ে খুব একটা আলাদা হয় না—নির্দিষ্ট পর্যায়কাল থাকে, ফেজ্ স্পেসে রেখাচিত্রটাও বদ্ধ লুপের আকারের হয়—তবে এর আকৃতিটা একটু জটিলতর হয়ে থাকে (চিত্র নং 3.7)। বাধার মান যত কমতে থাকে অরৈখিকতার প্রভাব ততই প্রকট হয়ে ওঠে। লজিস্টিক সমীকরণের ক্ষেত্রে যেমন দেখা গিয়েছিল এক্ষেত্রেও সেইরকম ঘটনা ঘটতে থাকে। বাধাদানকারী বলের মান কমে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এলে হঠাৎই ফেজ্ স্পেসের চিত্রটা একটা লুপ
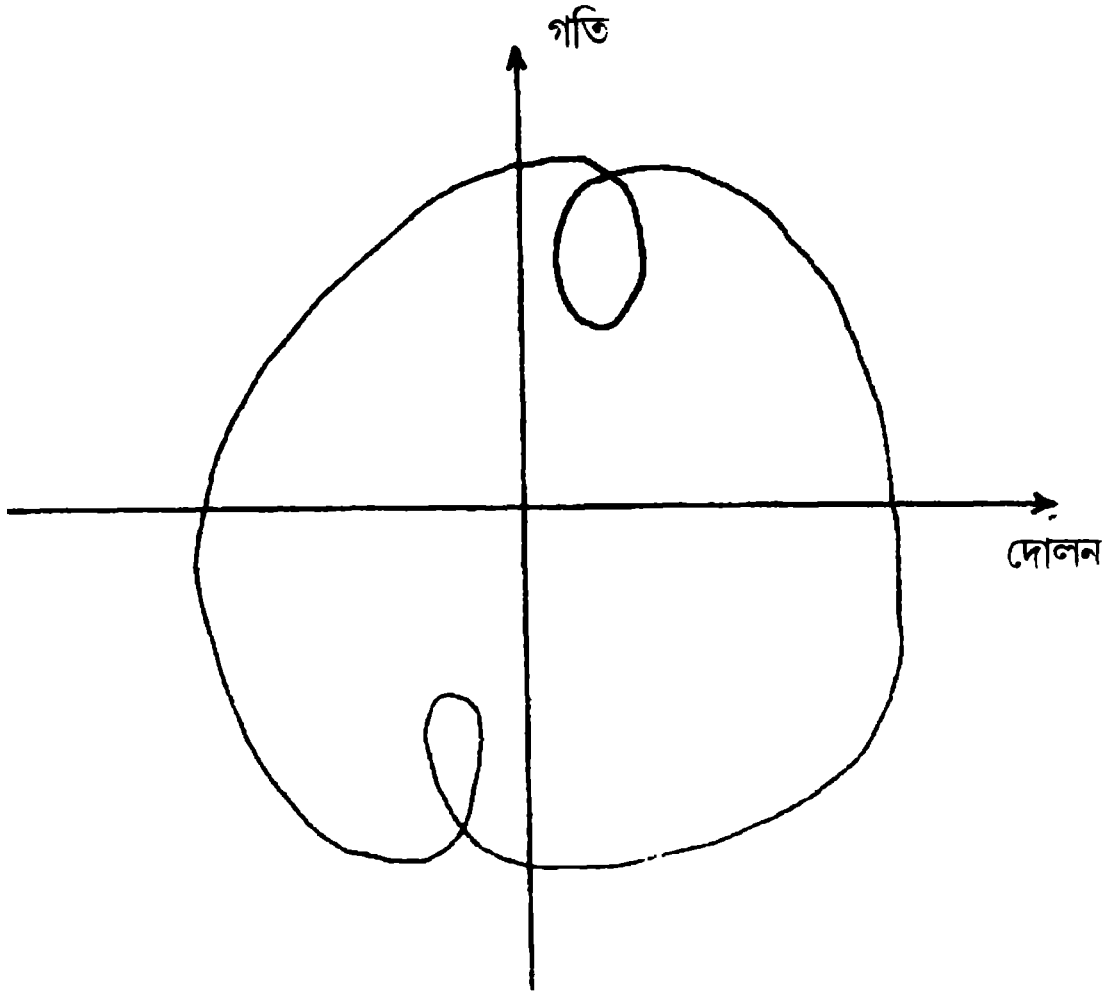
চিত্র 3.7 একটি অরৈখিক দোলকের (গুণগত) ফেজ-চিত্র। প্রাথমিক অস্থিরতার পর্ব দেখানো হয়নি।

থেকে দুটো লুপে পরিণত হয়। দোলকের দোলনকালও দ্বিগুণ হয়ে যায়। বল আরও কমলে আবারও আরেকটা নির্দিষ্ট মানে এসে 'পর্যায়- 4' ধরনের আচরণ শুরু হয়। বলের মান হ্রাস পেতে থাকলে ঐরকমই হঠাৎ হঠাৎ করে পর্যায় দ্বিগুণ হয়ে 8,16 ইত্যাদি পর্যায়ের দোলন সৃষ্টি হয়ে। একটা সীমার পর দোলকের গতি আদৌ পর্যাবৃত্ত থাকে না—চালক এবং বাধাদানকারী বলের একটা নির্দিষ্ট মানে সেটা সম্পূর্ণ অপর্যাবৃত্ত হয়ে যায়। এইখানেই বিশৃঙ্খলার শুরু।

এ সব কিছু অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, মনে হতে পারে এগুলো শুধু তত্ত্বের ক্ষেত্রেই সত্যি। কিন্তু ঘটনা তা নয়—হাতে কলমে এমন দোলক তৈরি করে দেখা হয়েছে যার আচরণ ঠিক ওপরে বর্ণিত দোলকের মতই। চালক বল এবং বাধাদানকারী বলকে সঠিকমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করে এটা করা সম্ভব হয়েছে। এ সবকিছুর পূর্বশর্ত হচ্ছে অরৈখিকতা। কোন রৈখিক দোলকের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখতে পাওয়া অসম্ভব। আর বিশৃঙ্খলতা এসে পড়লেই ভবিষ্যতের পূর্বানুমান অসম্ভব হয়ে পড়ে—ঠিক লোরেঞ্জ যেমন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। বিশৃঙ্খল অঞ্চলে দোলকের আচরণ আগে থেকে অনুমান করা অসম্ভব। বাহ্যিক বলদ্বারা পরিচালিত এবং বাধাপ্রাপ্ত দুটো অরৈখিক দোলক যদি গঠনের দিক দিয়ে এক রকম হয় এবং দোলন শুরুও করে প্রায় এক অবস্থা থেকে তাহলেও পরবর্তীকালে তাদের আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হয়ে যাবে বিশৃঙ্খলার প্রভাবে।
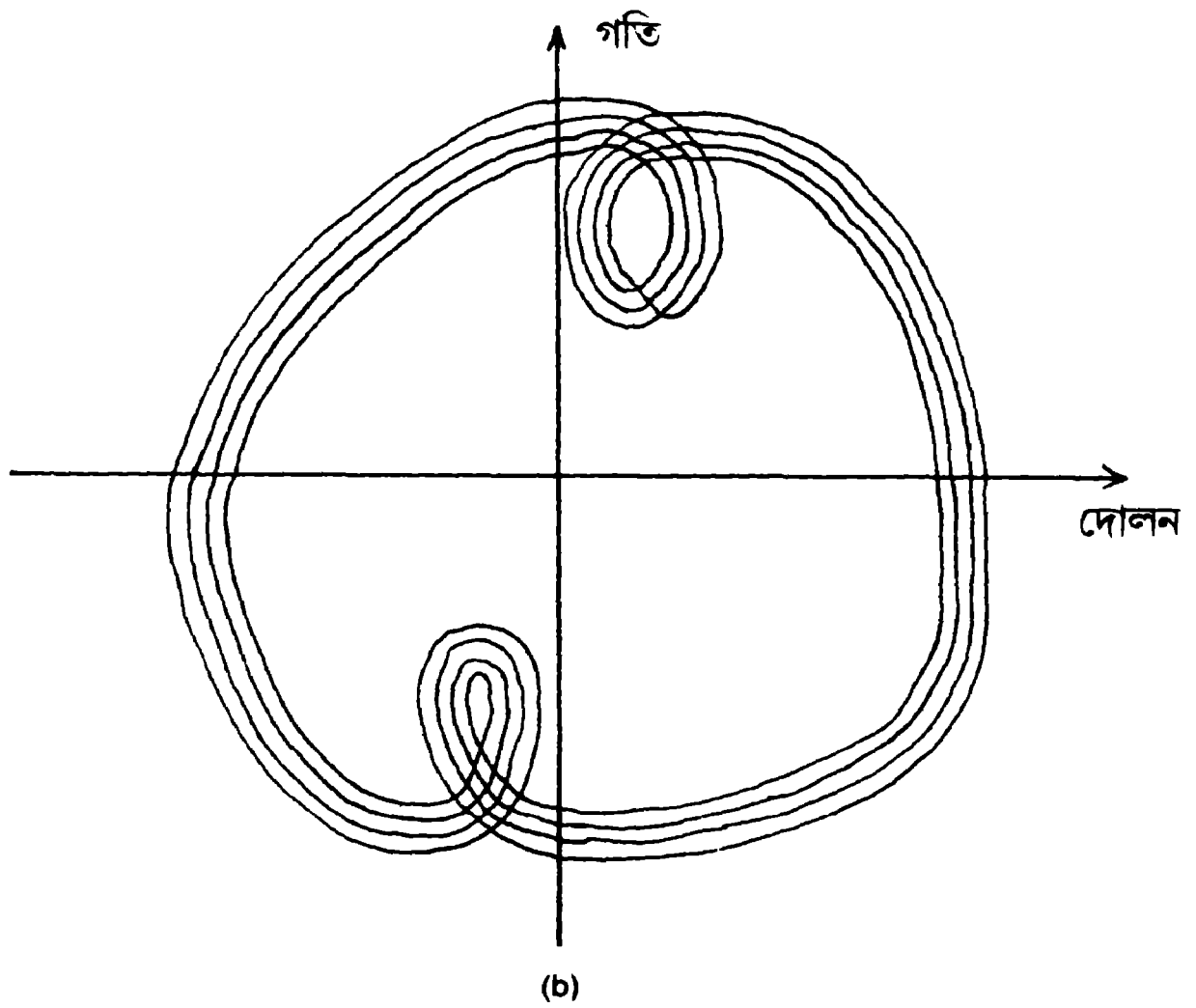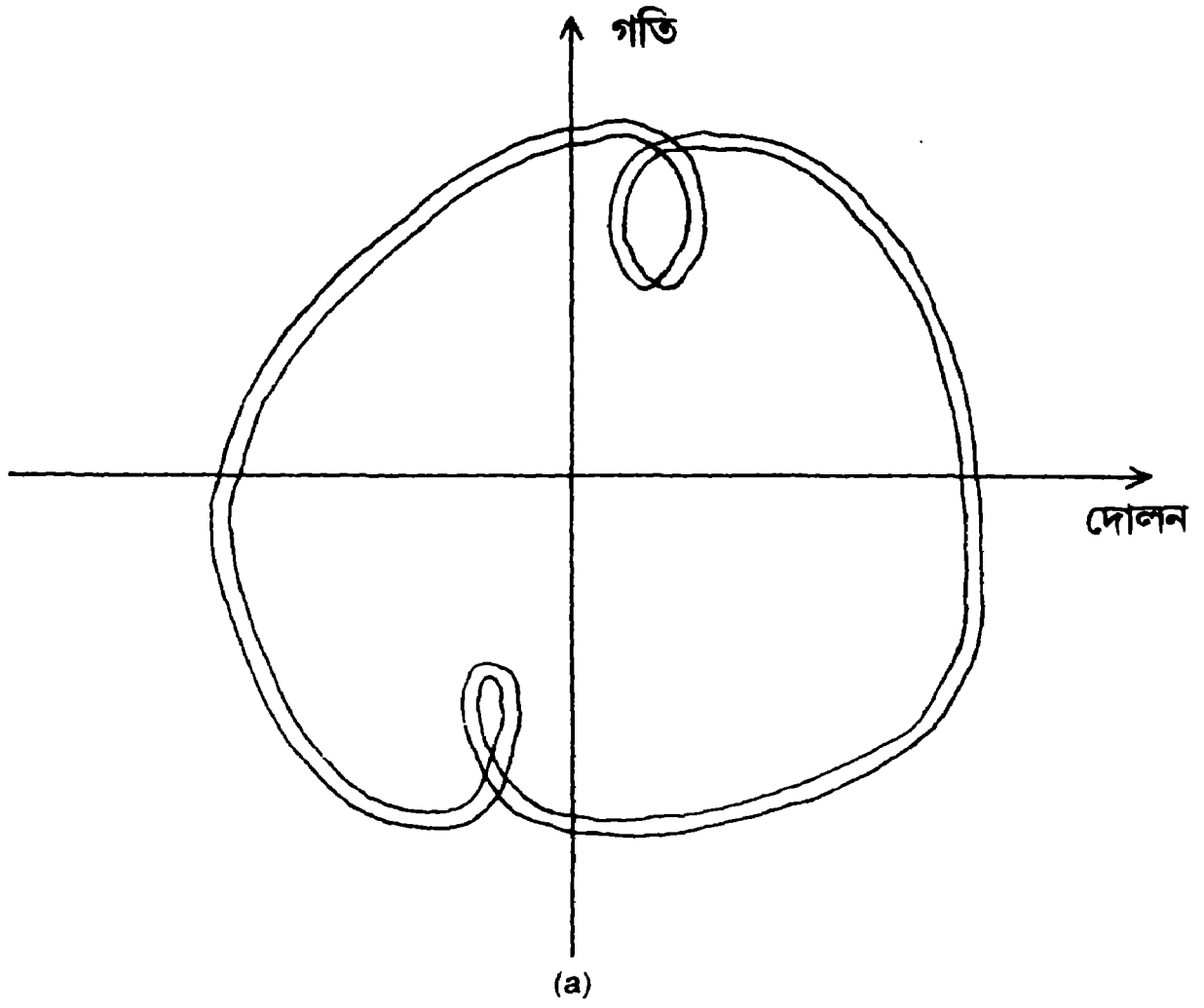
চিত্র 3·8 অরৈখিক বৃদ্ধিতে দোলকের পর্যায় দ্বিগুণ হওয়া।

বিশ্বজগত ঘড়ির মত নিখুঁতভাবে কাজ করে চলে—নিউটনীয় বিজ্ঞান এই বিশ্বাস ভর করেই চলেছে। ঘড়ি যেমন নির্ভুল নিয়মে টিক্ টিক্ করে চলে, বিশ্বও তেমনি নিজেকে প্রকাশ করে ত্রুটিশূন্য নিশ্চয়তাবাদের নিয়মের মধ্যে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি যে ঐ ঘড়িটার গতিই হয়ত পর্যাবৃত্ত নয়। একটা অরৈখিক ঘড়ি খুবই খামখেয়ালী আচরণ করতে পারে। অনিয়মিত সেই গতি আগে থেকে হয়ত অনুমানই করা যাবে না। এই বোধ আমাদের নম্র করেছে। আমরা আর লাপ্লাসের মত স্পর্ধায় নিশ্চয়তাবাদের কথা বলতে পারব না—কারণ সেই নিশ্চিত আচরণের প্রতিভূ যে সরল দোলক সেই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে আছে। যে দর্শন চার শতাব্দী ধরে ঐ দোলন বজায় রেখেছিল তার ভিত্তিমূলে টান পড়েছে। গির্জাঘরের বাতির দোলন আজ বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে।

চার

সত্যের মুখোমুখি

কোন বিজ্ঞানী যখন একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার বা ব্যাখ্যা করেন তখন তাঁর কাজকে উত্তম মানের বিজ্ঞানচর্চা বলেই ধরা হয়। বিজ্ঞান এবং দর্শন এক জিনিস নয়। ক্ষেত্র নির্বিশেষে প্রযোজ্য কিন্তু ধোঁয়াটে কথাবার্তার চেয়ে একটা ছোটমাপের স্পষ্ট বক্তব্য বিজ্ঞানীদের বেশি পছন্দ। অধিকাংশ সময়ে কিছু নির্দিষ্ট সিস্টেমের সুনির্দিষ্ট অংশ নিয়েই গবেষণা করেন বিজ্ঞানীরা। আবহাওয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন এডোয়ার্ড লোরেঞ্জ, রবার্ট মে'র আগ্রহ ছিল পোকামাকড়ের সংখ্যাতত্ত্বে, অনেককাল আগে গ্যালিলিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন বৃহস্পতির চাঁদের দিকে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সার্বজনীনকে স্পর্শ করার একটা ইচ্ছে বিজ্ঞানের অন্তস্তলে থেকে যায়—প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্তর্লীন ঐক্যকে আবিষ্কারের এক আকুতি। সার্বজনীন নীতি যেখানে শুধু গুণগত বর্ণনা সেখানেও তা থেকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব। কিন্তু যেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যা-পরিমাণের ভিত্তিতে কোন সার্বজনীন নিয়ম সূত্রায়িত করা সম্ভব হয়, যখন বিভিন্ন ধরনের সিস্টেমকে প্রকাশ করা যায় একই গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে বা একেবারে আলাদা আলাদা পরিস্থিতিতে একটি বিশেষ সংখ্যা বার বার আত্মপ্রকাশ করে তখন বিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে কোন বড় সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

নিউটনীয় বিজ্ঞানে বা এই শতাব্দীর কোয়ান্টাম তত্ত্বে এই সার্বজনীনতা আছে বলেই তাদের স্থান এত উচ্চে। নিউটনের অভিকর্ষের মান যদি বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন হ'ত তাহলে বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর খ্যাতির পরিধি ঘর্ষণের সূত্র আবিষ্কারকের চেয়ে বেশি হ'ত না। ঘর্ষণের সূত্রগুলোও দরকারী, সেগুলোর আবিষ্কারও যথেষ্ট ভালো মানের কাজ। কিন্তু সার্বজনীনতার মধ্যে যে শক্তি ও সৌন্দর্য আছে তা ঐ জাতীয় নিয়মের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। ঘর্ষণের সূত্রগুলো অত্যন্ত সীমিত কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহার যোগ্য। মহাকর্ষের সূত্র প্রযোজ্য সমগ্র বিশ্বে।

একটিমাত্র গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে, সেখানে আপেলের ভূপৃষ্ঠে পতন, গ্রহদের সূর্য প্রদক্ষিণ, প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উপগ্রহদের আবর্তন ইত্যাদি সবকিছুর ব্যাখ্যা করা যায়। আইনস্টাইনের মত করে আমরাও বলতে পারি যে ঐ ধরনের আবিষ্কারেই সত্যি সত্যি প্রকাশ পায় কিভাবে "তিনি চিন্তা করেন", বাকি আর সব তুচ্ছ খুঁটিনাটির ব্যাপার।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো সার্বজনীন। তা যদি না হত তাহলে তাদের 'মূলসূত্র' বলার কোন ভিত্তি থাকত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের প্রয়োগক্ষেত্রের একটা সীমা আছে—তার বাইরে গেলে ঐ নিয়মগুলো আর খাটে না। সসীম হলেও ঐ প্রয়োগক্ষেত্রের পরিসর বিপুল এবং তার মধ্যে অসংখ্য ধরনের ঘটনার সন্নিবেশ ঘটেছে। বড় মাপের এবং আলোর তুলনায় কম বেগে গতিশীল যে কোন বস্তুর ক্ষেত্রে নিউটনের সূত্রাবলী প্রযোজ্য। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ সূত্রে বেগ আলোর তুলনায় কম হওয়ার শর্তটি অপসারিত হয়—ত্বরণহীন, সুষম যেকোন বেগে গতিশীল দর্শকের ক্ষেত্রে ঐ তত্ত্ব প্রযোজ্য। এই প্রয়োগক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হয় আপেক্ষিকতার সাধারণ সূত্রে এসে যেখানে ত্বরণসহ যে কোন বেগেই বস্তু গতিশীল হতে পারে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের শ্রোয়ডিংগার সমীকরণ সমস্তরকম অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রথম দৃষ্টিতে সম্পর্কহীন মনে হয় এরকম বহু ব্যাপারের মধ্যে ঐক্য-সাধন ভালো তত্ত্বের লক্ষ্য। পার্থিব এবং মহাজাগতিক গতির মধ্যে ঐক্য সাধন করেছিলেন নিউটন। ম্যাক্সওয়েলের কাজে বিদ্যুত, চুম্বক ও আলোর মধ্যেকার ঐক্য ধরা পড়েছিল। আর আইনস্টাইন একীভূত করলেন দেশ, কাল এবং জড়বস্তুকে।

বর্তমান শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞান চর্চায় একীকরণ একটা মূল প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেছে। বছর তিরিশেক আগে অবধিও বস্তুজগতের মৌলিক প্রক্রিয়া হিসেবে চারটি বলকে চিহ্নিত করা হ'ত, এরা হ'ল—অভিকর্ষজ বল; তড়িৎবাহী বস্তুরা পরস্পরের সঙ্গে যে বলের মাধ্যমে বিক্রিয়া করে সেই তড়িৎচুম্বকীয় বল; পরমাণুর কেন্দ্রে নিউটন ও প্রোটনকে একসঙ্গে বেঁধে রাখতে সক্ষম 'জোরালো' বল; আর তেজষ্ক্রিয়ার জন্য দায়ী 'ক্ষীণ' বল। সম্প্রতিকালে স্টিভেন ওয়াইনবার্গ এবং আবদুস সালামের কাজের ফলে দেখা যাচ্ছে যে তড়িৎচুম্বকীয় এবং ক্ষীণ বল আসলে একটাই বলের দুটি রূপ। আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বছর ব্যয় করেছিলেন মহাকর্ষ এবং তড়িৎচুম্বকীয় বলকে একীকরণের চেষ্টায়। তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। সমসাময়িক আরেকজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী উল্‌ফ্‌গ্যাট্‌ পাউলি এ প্রসঙ্গে সরস মন্তব্য করে বলেছিলেন "ঈশ্বর যা পৃথক করে সৃষ্টি করেছেন নশ্বর মানুষ তাকে কখনোই এক করতে পারবে না"। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এতে দমে যান নি।

একীকরণের চেষ্টা সমানে চলেছে। জোরালো এবং ক্ষীণ বলকে একত্র করে 'গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিয়োরী' প্রস্তাব করা হয়েছে। অভিকর্ষের সঙ্গে বাকি তিনটি বলের মিলন ঘটানোর প্রচেষ্টায় অসাধারণ উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন তত্ত্বের প্রস্তাব দিয়েছেন। একীকরণের উচ্চতম শিখরে পৌঁছনোর আগে আরও অনেক উপত্যকা পেরিয়ে, শৃঙ্গ অতিক্রম করে এগোতে হবে তাঁদের। কিন্তু সেই স্বপ্ন তাঁরা ত্যাগ করেন নি।
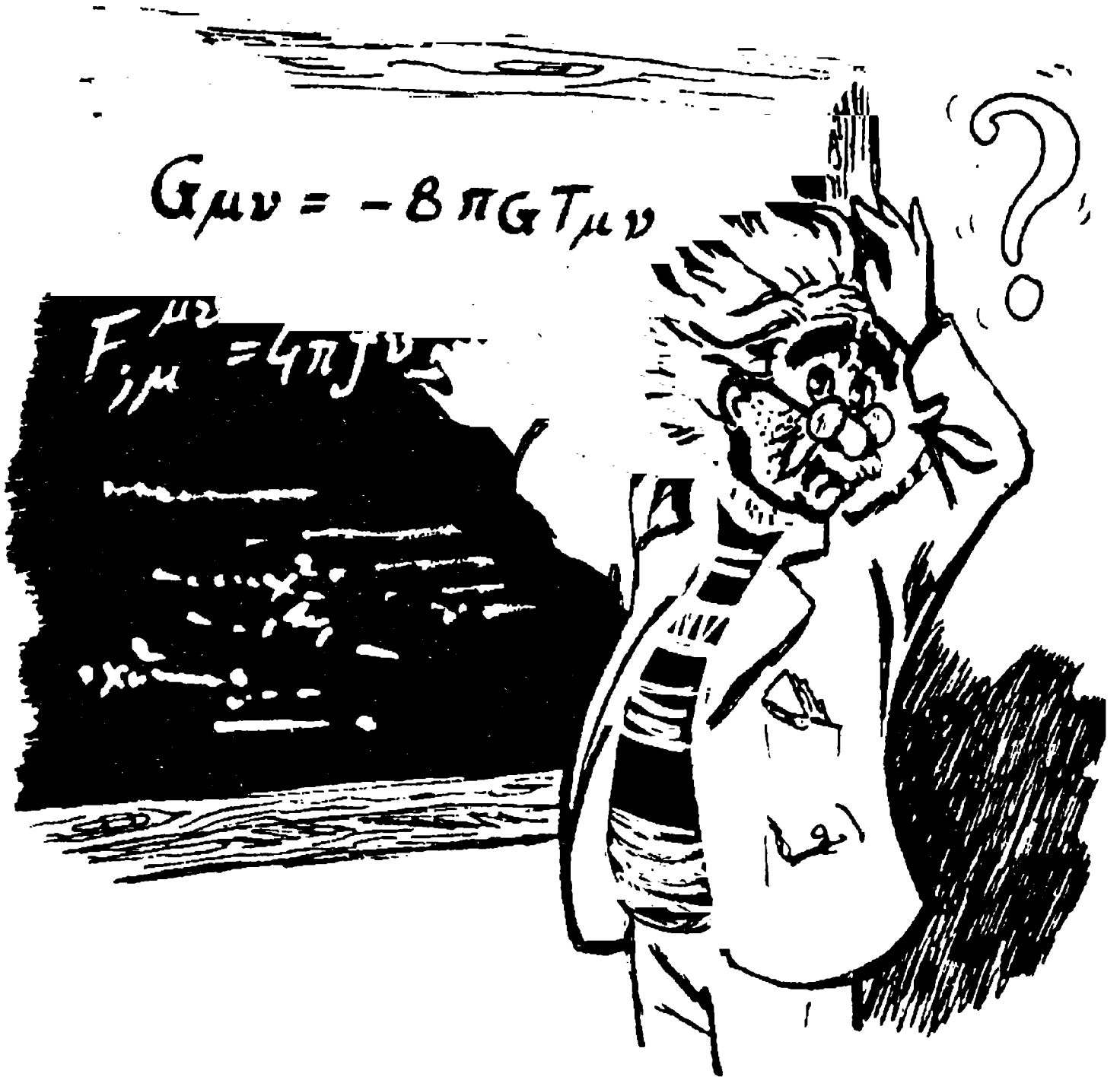
চিত্র 4·1 আইনস্টাইন মহাকর্ষ এবং তড়িৎচুম্বকীয় বলকে একীভূত করার চেষ্টা করেন—কিন্তু ব্যর্থ হন।

মূল সূত্রগুলো সার্বজনীন হওয়া মানে অবশ্যই এই নয় যে সর্বক্ষেত্রে যাবতীয় সিস্টেমের আচরণও অভিন্ন হবে। আগেও আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি

(প্রথম অনুচ্ছেদ) এবং দেখেছি যে কোন বিশেষ সিস্টেমের আচরণ প্রাথমিক অবস্থা এবং মূল সূত্র এই দুইয়ের ওপরই নির্ভর করে। এরই ফলে একই মূল সূত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও অসংখ্য আলাদা আলাদা সিস্টেমের আচরণে এত রকম-ফের, প্রকৃতির জগতে এত আশ্চর্যরকমের বৈচিত্র্য। কোন সিস্টেমের প্রাথমিক অবস্থা অনিয়ন্ত্রিত পারিপার্শ্বিক ঠিক করে দিতে পারে আবার মানুষ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সেটাকে বেছেও নিতে পারে। মহাজাগতিক গ্যাসপিণ্ডের একজায়গার ঘনত্ব হঠাৎ করে বেড়ে গেলে কালক্রমে পারমাণবিক বিক্রিয়ার শক্তিতে সেটা একটা জ্বলন্ত নক্ষত্রে পরিণত হতে পারে, আবার, গ্যাসপিণ্ডের আকারের ওপর নির্ভর করে, তা থেকে তৈরি হতে পারে এক শীতল গ্রহ। দুটোই ঘটবে পদার্থবিজ্ঞানের একই নিয়মাবলীর অধীনে।

আবার প্রাথমিক অবস্থা সুনিপুণভাবে নির্বাচন করে পদার্থবিজ্ঞানের নিউক্লিয়াস ও পরমাণু সংক্রান্ত একই নিয়ম খাটিয়ে তৈরি করা যেতে পারে একটি পরমাণু-চুল্লী অথবা এক পরমাণু-বোমা। এখানেও মূল নিয়মগুলো একই, কিন্তু আচরণ বিভিন্ন। সূত্রগুলো সরল এবং সার্বজনীন—আচরণবিশিষ্ট এবং জটিল। একটা সিস্টেম যত জটিল সেটা ততই অন্যের চেয়ে আলাদা, অনন্য—তার আচরণের বিশিষ্টতাও তত বেশি। জটিলতার চূড়ান্ত উদাহরণ মানুষ—তাই দু-জন মানুষ কখনও একরকম হয় না। জটিলতা এবং আচরণের সাদৃশ্য—এই দুটো কখনই একসঙ্গে পাওয়া সম্ভব নয়।

কেয়স আবিষ্কারের আগে এরকমটাই ভাবা রেওয়াজ ছিল। কিন্তু এখন জানা গেছে যে আলাদা আলাদা সিস্টেমের বিশৃঙ্খল আচরণের পেছনে এক ধরনের সার্বজনীনতা প্রচ্ছন্ন থেকে যেতে পারে। অরৈখিকতার মাত্রা বেড়ে গেলে পরিবেশে পোকার সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির পর্যায় দ্বিগুণ হ'তে হ'তে কিভাবে সেটা বিশৃঙ্খলার দিকে চলে যায় তা আমরা দেখেছি। আবার অরৈখিক দোলকের আচরণও ঠিক একই পদ্ধতিতে বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। কেন এমন হয়? এদুটো ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক কি? গঠনের দিক দিয়ে কোন মিল নেই এমন দুটো সিস্টেমের আচরণের মধ্যে এরকম মিল কোথা থেকে আসে—সেই আচরণ এত জটিল হওয়া সত্ত্বেও? হয়ত কেউ যুক্তি দেবেন যে সিস্টেম আলাদা হলেও তাদের পরিচালক সূত্রটি নিশ্চয়ই অভিন্ন; কিন্তু তা সত্যি নয়। লজিসটিক সমীকরণ এবং অরৈখিক দোলকের সমীকরণে গাণিতিক দিক থেকে কোনোই মিল নেই। ফলে এক্ষেত্রে যে সার্বজনীনতার দেখা মিলছে তার পেছনের যুক্তিটা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভীষণরকম আলাদা সিস্টেমগুলোকে অরৈখিকতার ভূত একইরকম আচরণে বাধ্য করছে বলে মনে হচ্ছে। এবং এটা যে শুধু এই দুটো সিস্টেমের

ক্ষেত্রেই সত্যি তা নয়। আমরা আজ জানি যে দ্বি-বিভাজন এবং পর্যায় দ্বিগুণ করার মধ্যে দিয়ে বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়ে এমন সিস্টেমের সংখ্যা অগণিত।

বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিহিত সার্বজনীনতার কাহিনীর এটাই সব নয়—এটা শুরু মাত্র। গল্পটার গোড়া খুঁজতে যেতে হবে 1975 সনে, আমেরিকার লস অ্যালামস্ ল্যাবরেটরীতে—অ্যাটম বোমার জন্মস্থান বলে যে জায়গাটা পরিচিত। ঐরকম ভয়ানক জায়গাতেই একটা খুব সুন্দর সংখ্যা আবিষ্কৃত হ'ল ঐ বছর—একটা নতুন সার্বজনীন ধ্রুবক। তার নাম এখন ফাইগেনবম (Feigenbaum) ধ্রুবক। কোন বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত প্রকাশকারী ধ্রুবক 'π' (পাই), কিংবা স্বাভাবিক লগারিদ্‌মের বেস হিসেবে পরিচিত সংখ্যা 'e' ইত্যাদি ধ্রুবকেরা গণিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, নবাগত ফাইগেনবম ধ্রুবকের স্থান হয়েছে তাদের পাশেই।

তরুণ, অন্যমনস্ক পদার্থবিজ্ঞানী ফাইগেনবম লস অ্যালামসে লজিস্‌টিক সমীকরণ নিয়ে কাজ করছিলেন। রবার্ট মে'র মত তিনিও দ্বি-বিভাজন এবং পর্যায় দ্বিগুণ হওয়া দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার চেয়েও বেশি কিছু ধরা পড়ল। তিনি লক্ষ করলেন যে পরপর দুটো দ্বি-বিভাজনের মধ্যেকার ফারাক ক্রমশ কমে আসে। λ যত বাড়ে তত ঘন ঘন দ্বি-বিভাজন ঘটে। যেমন প্রথম কয়েকটা দ্বি-বিভাজন ঘটে λ–র এই মানগুলোয়—3·000, 3·450, 3·544, 3·564 এবং 3·569। ফাইগেনবম দেখে আশ্চর্য হলেন যে সংখ্যাগুলোর মধ্যে গুণোত্তর শ্রেণীর আকারে একটা শৃঙ্খলা লুকিয়ে আছে। সেটা দেখতে গেলে λ-র পরপর দুটো মানের বিয়োগফলগুলো নিতে হবে। ঐ সংখ্যাগুলো হবে—0·450, 0·094, 0·020 এবং 0·004। এটি একটি ক্রম-হ্রাসপ্রাপ্ত গুণোত্তর শ্রেণী (geometric series) যার পরপর দুটো পদের মধ্যে সাধারণ অনুপাত (common ratio) প্রায় 5। আরও বেশি সংখ্যায় দ্বি-বিভাজন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে সাধারণ অনুপাতের মানটা ক্রমশ 4·669-এর খুব কাছে পৌছে যাচ্ছে। দ্বি-বিভাজন শেষ অবধি সিস্টেমকে বিশৃঙ্খলায় পৌছে দেয়—কিন্তু ঐ বিভাজন মোটেই এলোমেলোভাবে ঘটে না। ক্রমানুসারী দ্বি-বিভাজন এতটাই নিয়মমাফিক হচ্ছিল যে ফাইগেনবম আগে থেকে λ-র পরবর্তী মান অনুমান করে ফেলছিলেন, তাঁর ধীরগতি কম্পিউটার গণনা শেষ করে অনেক পরে জানাচ্ছিল যে সত্যিই ঐ মানে লজিসটিক সমীকরণে দ্বি-বিভাজন ঘটছে। মিচেল ফাইগেনবম স্বভাবতই খুব উত্তেজিত বোধ করছিলেন।

কিন্তু গল্পের ক্লাইম্যাক্সটা আসতে তখনও দেরী। বড় আবিষ্কারের আগে অনেক

সময় একটা ষষ্ঠেন্দ্রিয় কাজ করে—সেইরকম একটা আন্দাজে ভর করে ফাইগেনবম এবার একটা অন্য অরৈখিক সমীকরণ নিয়ে গণনা শুরু করলেন। লজিস্টিক ম্যাপের দ্বিঘাতী সমীকরণের বদলে তিনি ত্রিকোণমিতির একটা ফাংশন (trigometric function) বাছলেন। স্কুলের ছাত্ররাও জানে যে এই দুটো ফাংশন কত আলাদা রকমের। গ্রাফ আঁকলে দ্বিঘাতী ফাংশনটাকে দেখায় অধিবৃত্তের মত (parabolic), আর সাইন বা কোসাইন ফাংশনের ওঠাপড়া দেখতে লাগে ঢেউয়ের মত। কিন্তু দুটোই অরৈখিক ফাংশন। এক্ষেত্রেও তিনি অবাক হয়ে দেখলেন সেই আগের মতই দ্বিবিভাজন এবং পর্যায় দ্বিগুণ হওয়ার পথ দিয়ে বিশৃঙ্খলা এসে পড়ল। এবারেও দ্বি-বিভাজনের হার দ্রুত থেকে দ্রুততর হ'ল। λ-র পরপর মানের বিয়োগফল এক্ষেত্রেও একটি গুণোত্তর শ্রেণী তৈরি করল। কিন্তু এর পরের বিস্ময়টার জন্য বোধহয় তিনিও প্রস্তুত ছিলেন না। দেখা গেল গুণোত্তর শ্রেণীর সাধারণ অনুপাতের মান 4·669 অর্থাৎ আগের বারে যা পাওয়া গিয়েছিল এক্কেবারে তার সমান! উত্তেজিত মিচেল যতরকম অরৈখিক সমীকরণ দ্বিবিভাজিত হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে তাদের সবাইকে একে একে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করলেন। প্রতিক্ষেত্রেই দেখা গেল গুণোত্তর শ্রেণীর সাধারণ অনুপাত 4·669 হচ্ছে। বিভিন্ন দফায় পাওয়া সংখ্যাগুলো প্রায় সমান না পুরোপুরি সমান তা যাচাই করার জন্য তিনি দশমিকের পর অনেক ঘর অবধি ঐ ধ্রুবকের মান গণনা করলেন। কিন্তু দেখলেন যত ঘরই নেওয়া যাক না কেন ঐ সংখ্যাটির মান প্রতিক্ষেত্রে একদম এক হচ্ছে। দশমিকের পর ছয় ঘর অবধি গেলে ধ্রুবকটির মান দাঁড়ায় 4·669202। ফাইগেনবম বুঝতে পারলেন তিনি প্রকৃতই একটা বড় মাপের সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন।

বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সার্বজনীনতার বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বহুদিন যাবত সচেতন ছিলেন। কিন্তু অনেকগুলো অ-সদৃশ সিস্টেমের জটিল আচরণের ভেতরে এমন কোন সার্বজনীনতা থেকে যেতে পারে যার পরিমাপ এবং সাংখ্যমান নির্ণয়ও সম্ভব—এটা তাঁরা কখনই কল্পনা করেন নি। ফাইগেনবমের খুঁজে পাওয়া সার্বজনীনতা বিষয় হিসেবে বিশৃঙ্খলা বা কেয়সকে বিজ্ঞানচর্চার সম্মুখভাগে নিয়ে এলো। একটা বহুল প্রচলিত ধারণা এর ফলে মিথ্যে প্রমাণিত হ'ল। অনেকে বিশ্বাস করতেন যে বিজ্ঞান ও গণিতের গভীরতম সত্যগুলির সন্ধান একমাত্র বৈশ্লেষিক (analytical) পদ্ধতিতেই পাওয়া সম্ভব—নির্বোধ কম্পিউটারের পক্ষে সেগুলোর হদিস পাওয়া কখনই সম্ভব নয়। দেখা গেল এটা ঠিক নয়। ফাইগেনবমের প্রথম আবিষ্কারের পর অনেক জল গড়িয়ে গেছে। আজ আমরা জানি যে পর্যায়দ্বিগুণকরণ বিশৃঙ্খলায় পৌঁছনোর একমাত্র পথ নয়। তবে ঐ পথে

বহু অরৈখিক সিস্টেম বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতির নানা রকম জটিল আচরণের পেছনে এমন সার্বজনীনতা লুকিয়ে থাকতে পারে যাকে সংখ্যায় নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব—এই বৈপ্লবিক সত্য প্রথম জানা গিয়েছিল ফাইগেনবমের পথে চলতে গিয়েই।

নির্দেশিকার ৪ নং পুস্তকে ফাইগেনবমের আবিষ্কারের গল্প রয়েছে।

পাঁচ

টপোলজি এবং রন্ধনকলা

আমাদের দেশের অনেকেরই রন্ধনপটুতা হিংসে করার মত, বিশেষ করে তাদের চাপাটি বানানোর দক্ষতা। খুব ভালো চাপাটি আরাম করে খেতে খেতে খেয়াল থাকে না যে ওটা বানাতে গিয়ে কতগুলো টপোলজিকাল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। "মালয়ালী রোটি" তৈরি করতে গিয়ে আটার লেচিকে বহুবার টানা পেষা এবং ভাঁজ করা হয় যাতে গুঁড়োটা খুব ভালোভাবে মিশে যায়—আর এই প্রত্যেক স্তরেই টপোলজিকাল রূপান্তর ঘটে। এতগুলো রূপান্তর বোধহয় অন্য কোন ক্ষেত্রে ঘটে না।

অবিকল একরকম না হলেও একই ধরনের রূপান্তর ঘটে 5·1 নম্বর চিত্রে দেখানো টপোলজিকাল পরিবর্তনে — রুটিওয়ালার কথা স্মরণ করে যার নাম রাখা হয়েছে 'বেকারস্ ট্রান্সফরমেশন'(Baker's transformation)। একটা চার চৌকো বর্গাকার ময়দার লেচিকে একদিকে টেনে লম্বা করা হয়, তার লম্ব দিকে জিনিসটা সংকুচিত হয়ে পড়ে। ঐ দ্বিতীয় দিক বরাবর ওটাকে কেটে দুটো টুক্‌রো এমনভাবে জোড়া লাগানো হয় যাতে লেচিটা দেখতে আবার বর্গাকার হয়ে যায়। এটা অসংখ্যবার করলে রান্নাঘরেই বিশৃঙ্খলা বা কেয়স তৈরি হয়ে যাবে!

এটা যে হবে তা যাচাই করার জন্য ভাবা যাক প্রথম বর্গাকার লেচিটার কেন্দ্রকে ঘিরে মুগের ডালের মিহি গুঁড়োর একটা বৃত্ত রয়েছে। প্রথমবার টানলে বৃত্তটা একদিকে লম্বা এবং অন্যদিকে খাটো হয়ে গিয়ে একটা ডিম্বাকৃতি বক্ররেখার চেহারা নেবে। এবার মাঝবরাবর কেটে জোড়া লাগালে আগে প্রায় গায়ে গায়ে ছিল এরকম বেশ কিছু মুগডালের দানা অনেক দূরে দূরে চলে যাবে। এটা বহুবার করলে কাছাকাছি থাকা অধিকাংশ দানাই পরস্পরের থেকে অনির্দিষ্ট দূরত্বে চলে যাবে। বেশিরভাগ দানার গতিপথ (trajectory) বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে এই বেকারস্ ট্রান্সফরমেশনের নিশ্চিত নিয়মবদ্ধ প্রণালীতেও। লেচির মধ্যে বহু সংখ্যক চিহ্নিত দানা থাকলে এরকম হতেই পারে যে এখন যে দুটো দানা কাছাকাছি আছে শুরুতে
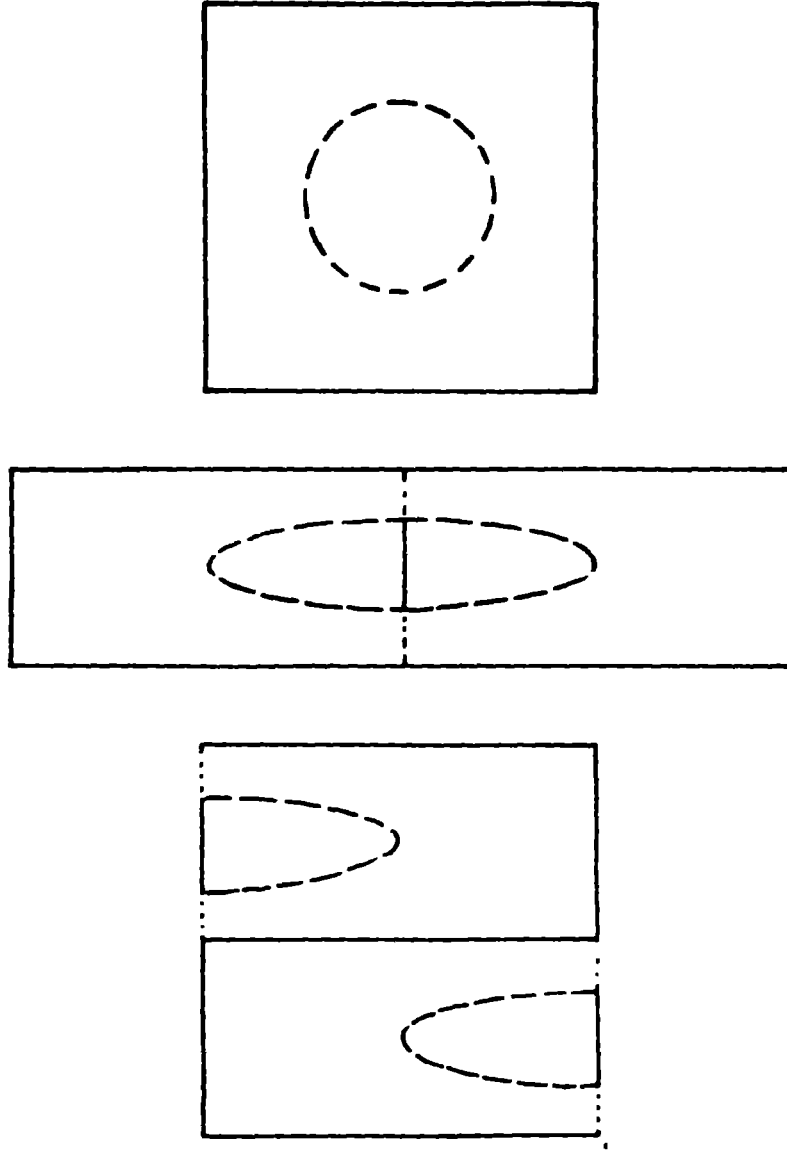
চিত্র 5·1 "বেকারস্ ট্রানসফরমেশন"। মিহি মুগডালের দানা ছড়ানো বর্গাকৃতি রুটিতে বারংবার রূপান্তর ঘটালে অধিকাংশ দানার পথরেখা বিশৃঙ্খল হয়ে থাকে।

তারা হয়ত অনেক দূরে দূরে ছিল।

হ্যামিলটোনিয়ান সমীকরণ যে সমস্ত সিস্টেমের গতিপথ নির্ধারিত করে ফেজ্ স্পেসে তাদের আচরণ এই জাতীয় টপোলজিকাল রূপান্তর দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব —এটা প্রথম বুঝতে পারেন মহান গণিতজ্ঞ স্টিফেন স্মেল (stephen smale)। গতিবিদ্যায় নিউটনের সমীকরণেরই আরও সাধারণীকৃত রূপ হ'ল হ্যামিলটনের সমীকরণ—এর গাণিতিক গঠন আরও সুষম? এটা নিয়ে কাজ করাও সহজতর। কোন ভৌত সিস্টেমে বিশৃঙ্খলার অনুরূপ ঘটনা সৃষ্টি করার জন্য স্মেল একটা খেলনা—মডেলের প্রস্তাব দেন। পরে এটা খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে—নাম হয় 'অশ্বক্ষুরাকৃতি ম্যাপ'। গণিতে 'ম্যাপ' বলতে এক সেট থেকে অপর এক সেটে রূপান্তর বোঝানো হয়। স্মেলের রূপান্তরটা অনেকটা বেকারস্ ট্রান্সফরমেশনের মত। একটা বর্গাকার চতুর্ভুজকে এখানেও টেনে একদিক লম্বা এবং তার লম্ব দিকে

খাটো করা হচ্ছে। কিন্তু কেটে জোড়া দেওয়ার বদলে এখানে সেটাকে দু-ভাঁজ করে ছোট করা হচ্ছে (চিত্র 5.2)। এটা বহুবার করা হ'লে দেখা যাবে আগে অনেক দূরে দূরে ছিল এরকম অনেক বিন্দু কাছাকাছি চলে এসেছে।
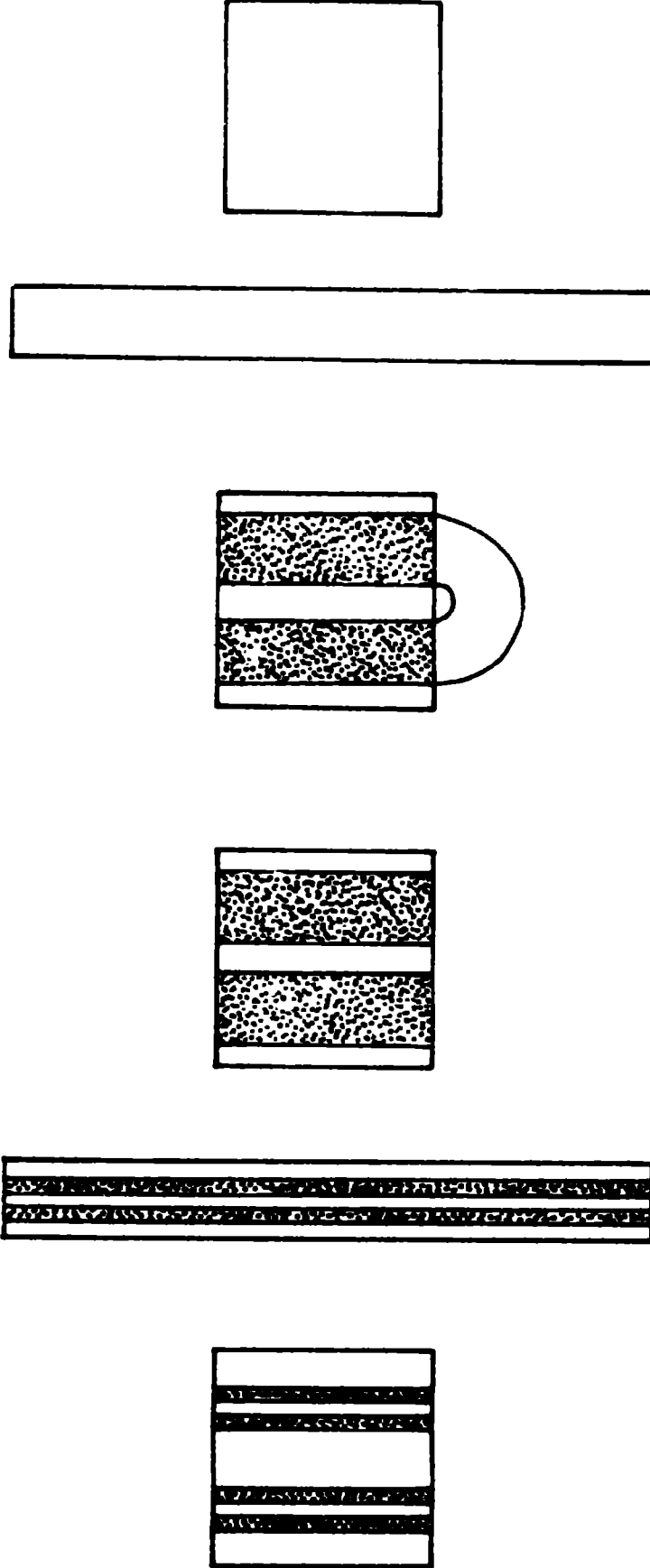
চিত্র 5·2 স্টিফেন স্মেল প্রস্তাবিত অশ্বক্ষুরাকৃতি ম্যাপ যাতে বিশৃঙ্খলার প্রতিরূপ দেখা যায়।

টপোলজিতে স্মেলের অসামান্য দখল ছিল। টপোলজিকে অনেক সময় রবার-শীটের জ্যামিতি বলা হয়। রবারের শীট বা পাতলা চাদরের ওপর একটা ত্রিভুজ এঁকে ঐ শীটটাকে প্রয়োজন মত টেনে সেটাকে অন্য যে কোনো বদ্ধ বহুভুজ বা

রেখার রূপ দেওয়া সম্ভব—অর্থাৎ ত্রিভুজটাকে একটা চতুর্ভুজ বা বৃত্তে রূপান্তরিত করা সম্ভব। কিন্তু কোনভাবেই সেটা থেকে বলয়াকৃতির একটা চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। টপোলজিতে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত পরস্পরের সমতুল্য—কিন্তু বলয় বা রিং এদের সমগোত্রীয় নয়। একইভাবে ত্রিমাত্রিক দেশে একটা গোলক টপোলজির বিচারে একটা ঘনকের সমতুল্য—কিন্তু মোটা বালার আকারের টোরাস (Torus) তা নয়। দুটো বস্তুর বিভিন্ন অংশ কিভাবে জোড়া সেটা তুলনা করা টপোলজির কাজ—তাদের একইরকম গিঁট বা গর্ত আছে কি না, তাদের বিভিন্ন অংশ যে রেখায় এসে মিশেছে তা বস্তুটির বাইরেও বর্ধিত হ'তে পারে কি না, ইত্যাদি তার বিচার্য। বস্তুত প্রকৃত মাপ বা আকৃতির খুঁটিনাটির সে আগ্রহী নয়। টপোলজি একগুচ্ছ জ্যামিতিক নকশার একেবারে মূল ধর্ম—কেননা আদিতে এসেছে বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগসূত্র থাকা বা না থাকার ধারণা (নিরবচ্ছিন্নতা বা continuity)। তারপর দুটো বিন্দুর মধ্যেকার দূরত্বের মাপের ধারণা এসেছে। এই দূরত্বের মাপের ধারণা যখন আমরা প্রবর্তন করি তখনই ত্রিভুজেরা চতুর্ভুজ বা বৃত্তের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে এবং আমরা সাধারণ জ্যামিতির ক্ষেত্রে ফিরে আসি।

কিন্তু জ্যামিতির এই বিমূর্ত শাখার সঙ্গে বিশৃঙ্খলার সম্পর্ক কি? সেটা বোঝার জন্য সেই লজিসটিক সমীকরণের $x_{n+1} = \lambda x_n (1-x_n)$ প্রতি দৃষ্টিপাত করব:
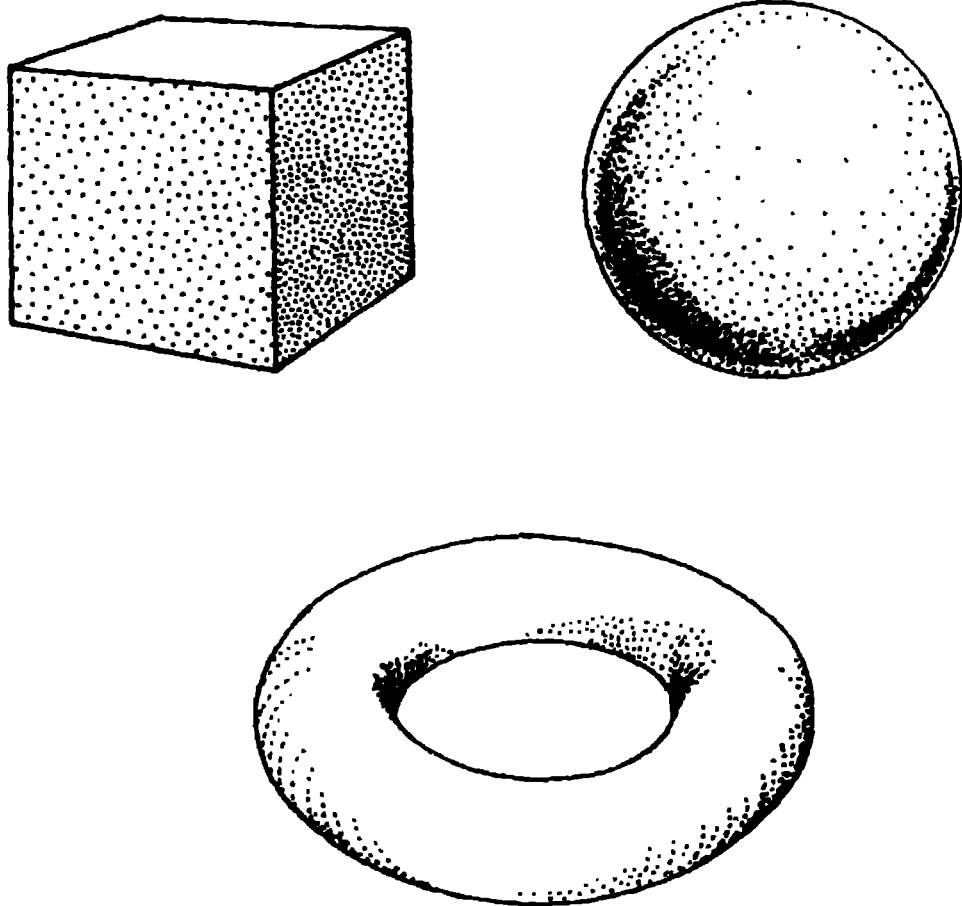
চিত্র 5·3 টপোলজিতে একটা ঘনক গোলকের সমতুল্য, কিন্তু মোটা বালার আকৃতির 'টোরাস' তা নয়।

এবার জ্যামিতির দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে বিচার করে দেখব। 0 থেকে 1 এর মধ্যবর্তী কোন মান দিয়ে শুরু করলে ফলস্বরূপ সমীকরণ থেকে আবার ঐ দুই মানের মধ্যবর্তী একটি সংখ্যাই ফিরে পাওয়া যায়—অর্থাৎ এটা এমন একটা 'ম্যাপ' যাতে 0 থেকে 1 এর মধ্যবর্তী অঞ্চল আবার তাতেই ফিরে আসে। আমরা জানি λ র মান 3.57 থেকে 4 এর মধ্যে থাকলে বিশৃঙ্খল অঞ্চল পাওয়া যায় — যার মাঝে মাঝে পর্যাবৃত্তির ফালি থাকে আমরা সহজ একটা মান $\lambda = 4$ নেব এবং দেখব একক দৈর্ঘ্যের একটা সরলরেখার ওপর এর কি প্রভাব। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে 0 থেকে $^1/_2$ এর মধ্যবর্তী অংশটা ম্যাপ হয়ে 0 থেকে 1 অবধি বিস্তৃত অংশে পড়বে, একবার পুনরাবৃত্তির ফলে। কিন্তু যেহেতু মানের নিম্ন ও উর্ধ্বসীমা বাঁধা, $^1/_2$ থেকে 1 অবধি অংশটাকেও 'ভাঁজ' হয়ে ফিরে আসতে হবে ঐ 0–1 অঞ্চলের মধ্যেই, যেমন 5.4 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তির মানে দাঁড়াবে বার বার টানা এবং ভাঁজ করা। টানার ফলে কাছাকাছি থাকা বিন্দুগুলো দূরে সরে যায়, ভাঁজ করার ফলে সিস্টেমটা ওপরে নীচে বাঁধা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
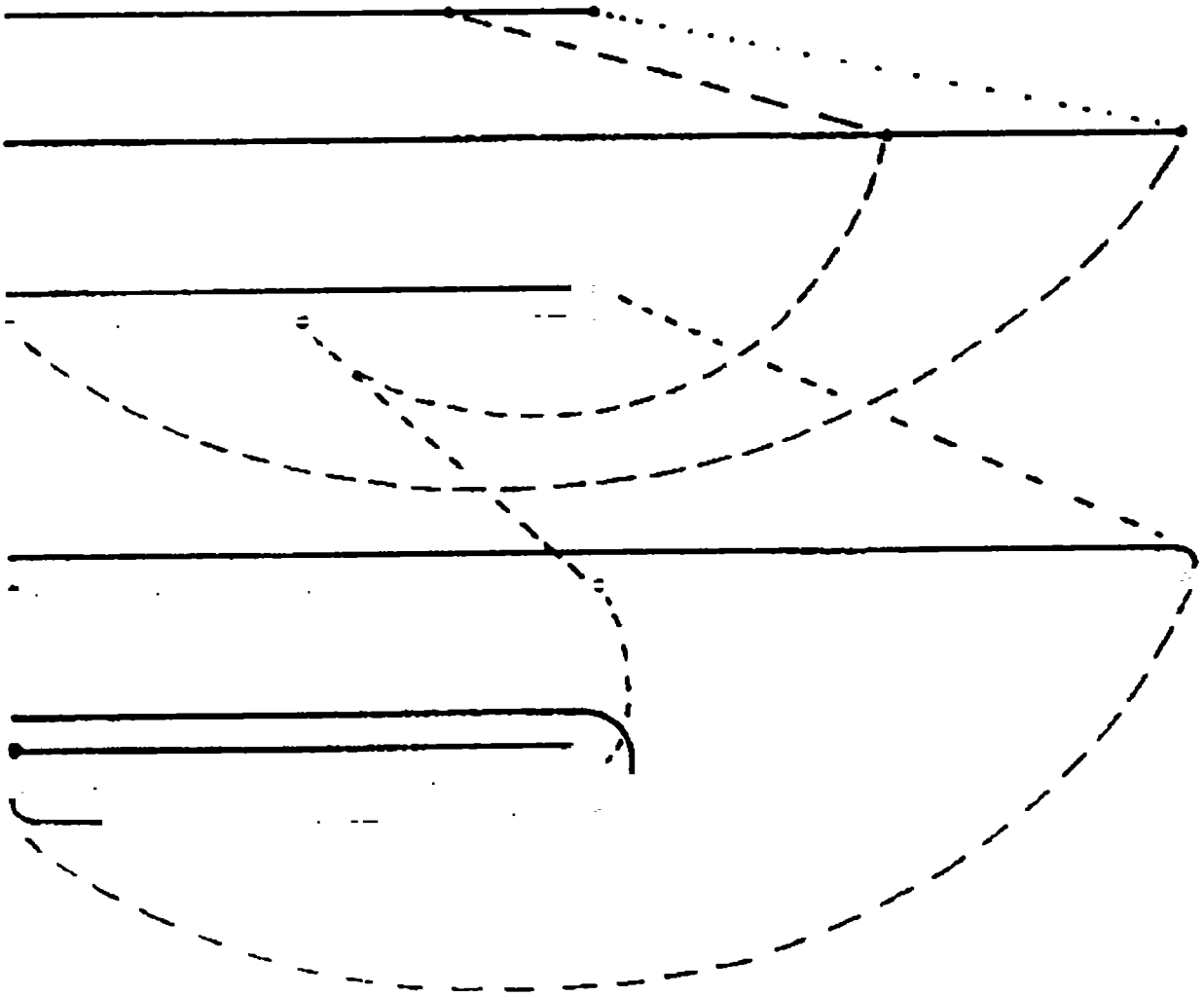
চিত্র 5·4 টানা এবং ভাঁজ করা হিসেবে লজিসটিক ম্যাপকে দেখানো হচ্ছে। পুনরাবৃত্তির দুটি ধাপ চিত্রায়িত হয়েছে।

আমরা এক্ষুনি যেটা দেখলাম সেটা একটা সরল এক-মাত্রিক রূপান্তর।

দোলকের মত কোনো বাস্তব সিস্টেমের ফেজ স্পেসের মাত্রা এর বেশি, এমন কি তিনের চেয়ে বেশিও হতে পারে। (যেমন, দোলকের গতি যদি একটা তলে সীমাবদ্ধ না থাকে)। বহুমাত্রিক ফেজ্ স্পেসে সিস্টেমের গতিরেখা এবং তার টপোলজিকাল বিশ্লেষণ মোটেই সহজ নয়। কিন্তু মূল ধারণাটা সে ক্ষেত্রেও অপরিবর্তিত থাকে —রেখাগুলির আকৃতি এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট নকশা সিস্টেমের প্রকৃত গতি নির্ধারণ করে। সিস্টেম যদি সংরক্ষী হয় অর্থাৎ তার মোট শক্তির পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে ফেজ্ স্পেসে তার নির্দেশক বিন্দু যে আয়তনের মধ্যে থাকে তা স্থির থাকে। অন্যদিকে বাধাপ্রাপ্ত দোলকের মত যে সমস্ত সিস্টেমে শক্তির অবক্ষয় (dissipation) ঘটে ফেজ্ স্পেসে তাদের আয়তন সংকুচিত হয়। প্রাথমিক অবস্থার প্রতি বিশৃঙ্খল সংস্থা যে অত্যন্ত সংবেদনশীল তার পরিচয় পাওয়া যায় গতিরেখাগুলির আচরণে—কাছাকাছি থাকা রেখাগুলিও পরস্পরের থেকে এক্সপোনেনশিয়াল হারে দূরে সরে যায়। কিন্তু বিশৃঙ্খল অবস্থাতেও ফেজ্ স্পেসে তারা একটা সসীম আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ক্রমাগত পরস্পর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে যে পথরেখারা তারা সীমাবদ্ধ আয়তনে আঁটিবে কি করে? একমাত্র উপায় তাদের 'ভাঁজ' করে দেওয়া। টানা, সংকুচিত করা, ভাঁজ করা—এই জাতীয় টপোলজিকাল রূপান্তরের মধ্যে দিয়েই গতিশীল সিস্টেমের আচরণ প্রকাশিত হয়। এটা দেখার একটা নতুন ধরন। গতিবিদ্যা আলোচনার চিরাচরিত ধারা থেকে স্বতন্ত্র। নিউটন, লাইবনিট্স্ নির্দেশিত সনাতনী ধারায় মূল গতীয়-সমীকরণ অনুযায়ী সিস্টেমের প্রতি মুহূর্তের গতি বিচার করা হয়। আর এই নতুন পদ্ধতিতে সিস্টেমের গতির ইতিহাস ফেজ্ স্পেসে তার গতিরেখার জ্যামিতিক নকশায় সামগ্রিকভাবে ধরা এবং বিশ্লেষণ করা হয়।

গণিতের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে দেখলে এই ধারণাগুলো সম্পূর্ণ নতুন কিছু নয়। বস্তুত এই শতাব্দীর গোড়ায় বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ আঁরি পোঁয়াকারের (Henre Poincare) চিন্তায় এর অনেকগুলোই ধরা পড়েছিল। অনেকেই হয়ত জানেন না যে পোঁয়াকারে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিষ্কারের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। তবে সত্যের খাতিরে এটাও বলতে হবে যে জড়বিশ্বে ঐ ধারণার সুগভীর তাৎপর্য তিনি আইনস্টাইনের মত স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন নি। গণিতশাস্ত্রে পোঁয়াকারের অসামান্য দখল ছিল। টপোলজির ক্ষেত্রে তিনি পথপ্রদর্শকদের একজন এবং গতিবিদ্যায় এর প্রয়োগের সম্ভাবনার কথাও তিনি অনেকের আগে হৃদয়ঙ্গম করেন। শুধু তাই নয়, বিশৃঙ্খলা বা কেয়সের সম্ভাবনার কথা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেন তিনি—যদিও 'কেয়স' শব্দটার প্রচলন হয় অনেক পরে, সম্প্রতিকালে। আর বিষয় হিসেবে তার উত্থানও সাম্প্রতিক। মানুষের জীবনের যে রকম, সে রকম বিজ্ঞানেও সঠিক ধারণার জন্য একটা সঠিক সময় বাঁধা থাকে। পোঁয়াকারের

বিশৃঙ্খলার ধারণা একটু বেশি আগে উপস্থিত হয়েছিল। ঐ ধারণা উপযুক্ত আকার ধারণ করল এ শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়ায়। তখন রঙ্গমঞ্চে মনুষ্যসৃষ্ট এক অতিশক্তিশালী যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে যার নাম কম্পিউটার।

নির্দেশিকার 2, 8 এবং 18 নং পুস্তক দ্রষ্টব্য।

অ্যাঁকাব্যাঁকা জ্যামিতি

ছয়

সুন্দর এবং কুৎসিত

সৌন্দর্যের প্রকৃত অবস্থান দ্রষ্টার চোখে। কিন্তু সেই দ্রষ্টা কোন না কোন সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। আর প্রত্যেক সংস্কৃতির, প্রত্যেক যুগের সৌন্দর্য বিচারের নিজস্ব কিছু মাপকাঠি—কিছু অলিখিত নিয়ম থাকে। সৌন্দর্য বিচারের প্রাচীনতম মাপকাঠির একটি হ'ল প্রতিসাম্য (symmetry)। যেখানে সুষম নকশার মধ্যে প্রতিসাম্য বিরাজমান, যেখানে অংশগুলো ছন্দোবদ্ধভাবে সমগ্রের মধ্যে মিশে যায়। সেখানেই সৌন্দর্যের দেখা মেলে। নারীর সুন্দর মুখের গঠনে স্থান বা দেশের প্রতিসাম্য প্রকাশিত—তার সুন্দর অঙ্গসঞ্চালনে সময় বা কালের ছন্দোবদ্ধতা প্রকাশিত হয়। যা সুন্দর তাকে প্রতিসম হ'তেই হবে।

প্রতিসাম্যের এই ধর্ম সমন্ধে বহু যুগ ধরেই মানুষ সচেতন। যে ত্রি-মাত্রিক দেশে আমরা বাস করি তার সাধারণ ধর্ম ইউক্লিডীয় জ্যামিতির আলোচ্য বিষয়—কিন্তু সমবাহু ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত, শঙ্কু, চোঙ বা গোলকের মত প্রতিসম বস্তুর প্রতি গ্রীক-জ্যামিতির বিশেষ মনোযোগ ছিল। ত্রিমাত্রিক বস্তুদের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিসাম্য রয়েছে গোলকের আকৃতিতে। তাই আকাশের গ্রহতারারা একটি খ-গোলকের গায়ে আটকে আছে—এরকম কল্পনা করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। বাস্তব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে পুরো না মেলা সত্ত্বেও প্রতিসাম্যের ধারণা আঁকড়ে থাকার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'ল গ্রহদের কক্ষ সম্বন্ধীয় টলেমির মডেল। পরে কেপ্‌লার যখন দেখালেন যে গ্রহদের কক্ষগুলি পুরো বৃত্তাকার নয়—উপবৃত্তাকা তখন সেই আবিষ্কার অবিশ্বাস এবং আতঙ্কের কারণ হল। ঈশ্বর সৃষ্ট গ্রহ তারকারা কি করে বৃত্তের নিখুঁত প্রতিসাম্য ত্যাগ করে অন্য পথে ভ্রমণ করতে পারে?

স্কুলে আমরা সুষম আকারের বস্তুদের জ্যামিতি শিখি—কখনও বা তারা প্রতিসাম্য থেকে সামান্য বিচ্যুত। এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। সুষম বস্তুর ধর্মাবলী সরল, তা বোঝা বা মনে রাখা সহজ। কোন বৃত্তের ব্যাসকে π (পাই) দিয়ে গুণ করলে তার পরিধি পাওয়া যায়। শঙ্কুর আয়তন পেতে গেলে ব্যাসার্ধের বর্গ,

উচ্চতা এবং π (পাই) এর এক তৃতীয়াংশের গুণফল নিতে হবে। সুষম জ্যামিতিক ধারণা বিজ্ঞানের নানান আলোচনায় এসে পড়ে। বৃত্তাকার পারমাণবিক কক্ষপথ, চতুস্তলক আকারের অণু, ষড়ভুজ বা বর্গক্ষেত্রের মত ল্যাটিসের কথা বার বারই সেখানে পাওয়া যায়। প্রতিসাম্যের ধারণা বহু স্থাপত্য এবং শিল্পের কাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে। গথিক গির্জা, মীনাক্ষী মন্দির বা তাজমহলের সুষম, ছন্দোবদ্ধ আকার এর নিদর্শন।

চিত্র 6·1 সুষম জ্যামিতিক আকার এবং প্রতিসাম্য চিত্রকলা ও স্থাপত্যকে চিরদিন উদ্বুদ্ধ করেছে।

কিন্তু এখানে একটা রহস্য আছে। আমাদের আশপাশের প্রাকৃতিক বস্তুর স্বাভাবিক আকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম। পৃথিবীর ওপরটা উল্টোপাল্টা ভাঙাচোরায় ভর্তি। দূর থেকে দেখলে পাহাড় খুব মসৃণ ঢেউ খেলানো মনে হয় কিন্তু আসলে তার আকৃতি বেশ জটিল। ঢেউয়ের ওপর ঢেউ—তার ওপরে ঢেউ—এইরকম আর কি। মেঘের আকৃতি বিচিত্র—কিন্তু অসম। ম্যাপে যেরকম আঁকা থাকে কোন দেশের সীমারেখা সেরকম মসৃণ কদাচ নয়—বহুসংখ্যক বাঁক এবং খোঁচাওয়ালা কোণায় ভর্তি। আকাশের বিদ্যুৎ কখনও সরলরেখা ধরে এগোয় না—তার গতি জটিল আঁকাবাঁকা পথে। ফার্ণ গাছের পাতার মত আপাত দৃষ্টিতে

যাদের সুষম মনে হয় এরকম বহু জিনিস খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে তাদের পরিসীমা আসলে আঁকাবাঁকা।

সুষম আকারের বস্তুর জ্যামিতির সঙ্গে প্রকৃতির এইসব স্বাভাবিক আকৃতির কোন যোগ আছে বলে মনে হয় না। গ্রীকরা ভাবতেন যে 'ঈশ্বরীয়' আকৃতি সর্বদাই নিখুঁত এবং প্রতিসম—তার থেকে বিচ্যুতি ঘটে মর্ত্যবাসী মানুষের ত্রুটিতে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা তা নয়। প্রকৃতির জ্যামিতি আঁকাবাঁকা খোঁচাওয়ালা অ-প্রতিসম আকৃতির জ্যামিতি বলেই প্রতিভাত হচ্ছে। যে বিজ্ঞানীর চোখে এটা প্রথম ধরা পড়ে তাঁর নাম বেনোয়া ম্যান্ডেলব্রট। মূলত একজন গণিতজ্ঞ হলেও বাঁধাধরা পথে চলেন নি তিনি কোনোদিন—অর্থশাস্ত্র, যন্ত্রবিদ্যা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র অবধি বহু-বিস্তৃত ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছেন। জ্যামিতিক ব্যাপারে একটা বিশেষ ধরনের বোধের তিনি অধিকারী। প্রকৃতির নিজস্ব জ্যামিতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর একটা মন্তব্য এইরকম: "মেঘের আকার বলের মত নয়, পাহাড়গুলোও অবিকল শঙ্কু—আকৃতির নয়"।

কিন্তু প্রাকৃতিক বস্তুর আকৃতি অসম হয়ে থাকে এটা বলার মধ্যে ভয়ঙ্কর বিপ্লবী তত্ত্ব কি লুকিয়ে আছে? এটা তো বহুদিন ধরেই জানা এবং কেউই তাতে খুব একটা আশ্চর্য হয় না। আকৃতিগুলো অসম শুধু এটা বলেই ম্যান্ডেলব্রটের বক্তব্য শেষ হয় না। তাঁর বক্তব্য—ঐ আপাত অনিয়মিত রূপের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের নিয়মানুগ প্রতিসাম্য লুকিয়ে আছে। এই প্রতিসাম্য আমাদের পরিচিত ঘূর্ণন বা সরলরৈখিক সরণের সাপেক্ষে নয়—এ হ'ল মাপ বা স্কেলের সাপেক্ষে অপরিবর্তনীয়তা । প্রকৃতির বহু স্বতঃস্ফূর্ত নকশা বিভিন্ন মাপের স্কেলে একইরকম দেখায়। একটা পাহাড় একটা পাথরের টুক্‌রো, একখণ্ড মেঘ কিংবা সমুদ্রের তটরেখা—এইজাতীয় কোন ভূ-প্রাকৃতিক বস্তুর শুধুমাত্র ছবি দেখে জিনিসটা কত বড় বা ছোট তা বোঝা সম্ভব নয়। যখন একটি মন্দির বা গাছের মত চেনা-মাপের বস্তু ঐ ছবির অন্তর্ভুক্ত হয়—তখনই একমাত্র প্রথমোক্ত বস্তুগুলির মাপ আন্দাজ করা যেতে পারে। ঐ সব প্রাকৃতিক নকশার কোনো অন্তর্নিহিত মাপের স্কেল নেই। ছোট মাপে তাদের যেমন দেখতে লাগে, কোন একটি অংশকে বিবর্ধিত করলেও সেই একইরকম দেখতে হয়।

এরকম লুকিয়ে থাকা ছন্দের ব্যাপারটা সত্যিই খুব আশ্চর্যকর। জটিল, এলোমেলো কারণের ফলস্বরূপই অসম এবং জটিল আকৃতির সৃষ্টি হয়। মেঘ তৈরি হওয়ার পদ্ধতির খুঁটিনাটিগুলো এত জটিল যে সেটা আজও অবধি পুরো বুঝে ওঠা যায়নি। সাগরের ঢেউয়ের অনিয়ন্ত্রিত, খাপছাড়া আঘাতে আঘাতে তটরেখার সৃষ্টি হয়। এই তটরেখা বা মেঘ কি পাহাড়ের অসম আকৃতির তলায় কোন সুপ্ত নিয়ম রয়ে গেছে এটা কল্পনা করা বেশ শক্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবসংখ্যার পরিবর্তনের

যেরকম ধারা লক্ষ করেছি আমরা এখানে আকার ও আকৃতির মধ্যে সেই জাতীয় নিয়মানুবর্তিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথম ক্ষেত্রে একটা সরল নিশ্চিতরূপে জানা নিয়ম দ্বারা পরিচালিত সিস্টেমের আচরণ সময়ের সঙ্গে তার পরিবর্তনের ধারা, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছিল। আর এক্ষেত্রে দেশে বা স্থানে উৎপন্ন আপাত শৃঙ্খলাহীন কিছু আকৃতির মধ্যে এক ধরনের প্রতিসাম্য—মাপ বা স্কেলের সাপেক্ষে রূপে অপরিবর্তনীয়তা অর্থাৎ স্ব-সাদৃশ্য লুকিয়ে থাকছে। এটাই ম্যান্ডেলব্রট সবার নজরে আনলেন। দু-ক্ষেত্রেই মূল কথাটা এক—কেবল এলোমেলো কারণ থেকে জটিল আচরণের সৃষ্টি সব সময়ে নাই হ'তে পারে—দেশ বা কালে জটিল নকশা সৃষ্টিকারী পদ্ধতির পেছনে একটা সরল সুশৃঙ্খল নিয়ম থাকতে পারে।
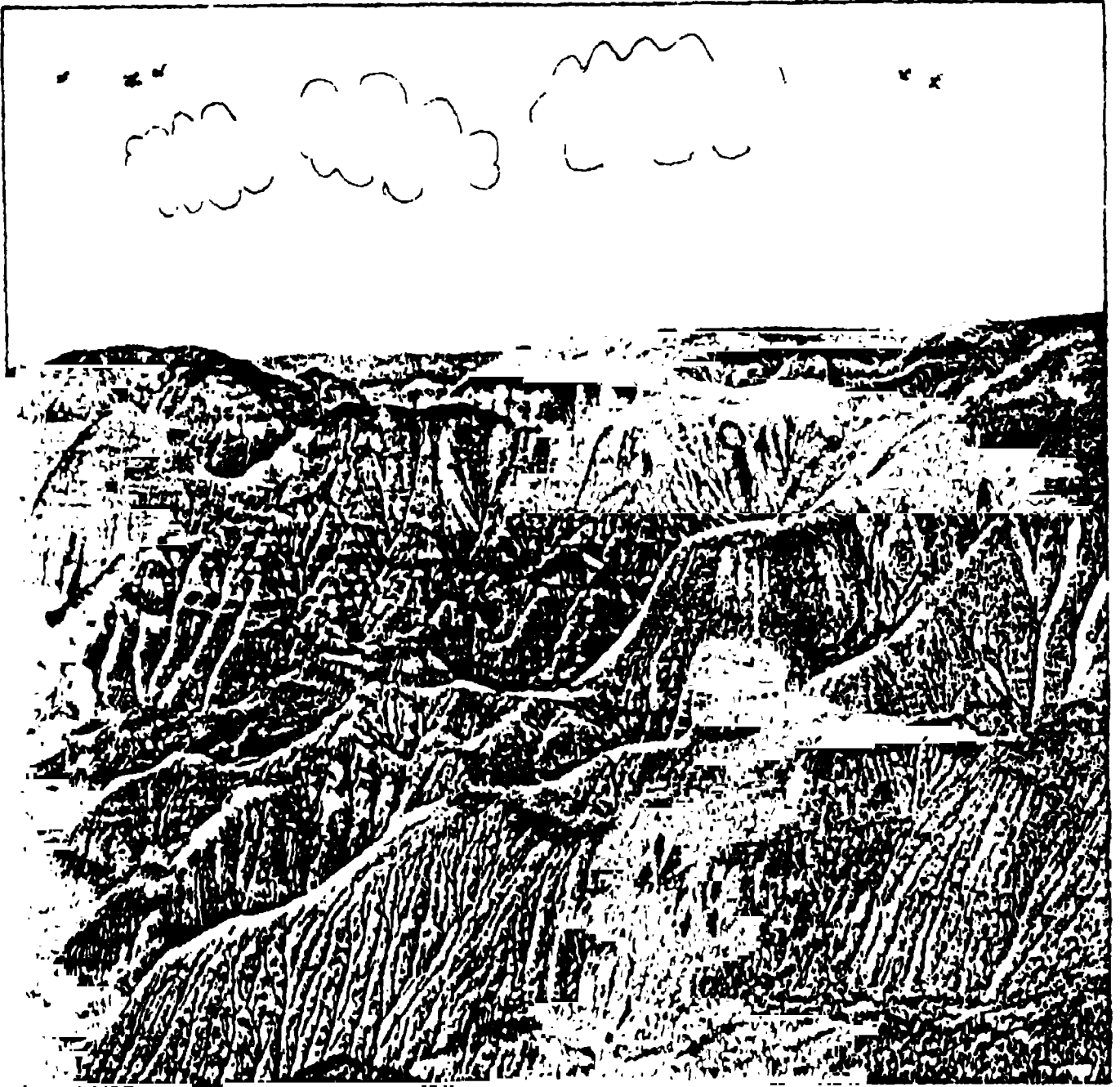
চিত্র 6·2 কোনো ভূ-প্রাকৃতিক দৃশ্যের (যেমন একটি পাহাড়ের) শুধুমাত্র আলোকচিত্র দেখে তার মাপ আন্দাজ করা যায় না, যদি না তার মধ্যে চেনা মাপের (একটা মন্দির-টন্দিরের মত) কোন বস্তুকেও দেখা যায়।

প্রতিসাম্য থেকে সৌন্দর্য আসে। কিন্তু বহুকাল ধরে আমরা প্রতিসাম্য বলতে ঘূর্ণন বা সরলরৈখিক সরণের সাপেক্ষে অপরিবর্তনীয়তা বুঝে এসেছি। এখন বোঝা যাচ্ছে প্রকৃতি আরও এক ধরনের প্রতিসাম্য পছন্দ করে। অসম, 'কুৎসিত' আকারের প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে এই প্রতিসাম্য সুপ্ত থাকে। এখানে সৌন্দর্যের অভাবটা কেবল ওপর ওপর। একটু গভীরে গেলেই ঐ প্রতিসাম্যের খোঁজ পাওয়া যায়। এর স্বরূপ উন্মোচিত করে তাকে অনুধাবন করলেন ম্যাণ্ডেলব্রট। এই অনুসন্ধান তাঁকে অভিনব ধারণার উপান্তে নিয়ে গেল। জ্যামিতিক বস্তুর মাত্রা বা ডাইমেনশন পূর্ণসংখ্যা না হয়ে ভগ্নাংশও হতে পারে—এই হ'ল সেই ধারণা।

নির্দেশিকার 8, 10 এবং 18 নং পুস্তক দ্রষ্টব্য।

সাত

গ্রেট ব্রিটেনের তটরেখা

আজকাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায়। সঙ্কোচনের ফলে এখন ব্রিটেনের তটরেখাই সেই সাম্রাজ্যের সীমানা। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল সেই তটভূমি কত লম্বা? 'ইংল্যান্ডের তটরেখার সঠিক দৈর্ঘ্য কত?" খুবই নিরীহ দেখতে এই প্রশ্নটাকে বিখ্যাত করে তোলেন ম্যান্ডেলব্রট, আর এটার উত্তর খুঁজতে গিয়ে অসাধারণ কিছু ধারণার সামনে গিয়ে পড়ি আমরা। এই ধারণাগুলোর একটা বড় অংশ উনিশ শতকের গণিতবিদ্যার স্তূপে চাপা পড়ে ছিল। সেগুলোকে খুঁড়ে বার করে ম্যান্ডেলব্রট তার সংস্কার এবং পরিবর্ধন ঘটালেন এবং তাদের অসামান্য গুরুত্ব সম্বন্ধে জগতের আর সবাইকে সচেতন করলেন।

ওপরের প্রশ্নটার উত্তর সংক্ষেপে এইরকম : তটরেখা কতটা লম্বা তা নির্ভর করবে সেটাকে মাপার জন্য ব্যবহৃত মাপকাঠির দৈর্ঘ্য কত তার ওপর। যেমন, ধরা যাক, 10 মিটার লম্বা একটা টেপ দিয়ে তটরেখা মাপা হ'ল। এর ফলে দৈর্ঘ্যের একটা মান পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটাকে নির্ভুল বা চূড়ান্ত মান বলা যাবে না কেননা 10 মিটারের চেয়ে অনেক ছোটমাপের বাঁক বা অসমতাগুলো পরিমাপে অগ্রাহ্য করা হবে। একমিটারের একটা স্কেল নিলে আঁকাবাঁকা রেখার আরও বেশি ডিটেল ধরা যাবে, ফলে দৈর্ঘ্যের মান আগের বারের চেয়ে বেশি হবে। এইভাবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর আকারের মাপকাঠি নিতে থাকলে তটরেখার দৈর্ঘ্যের পরিমাপ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে থাকবে।

মাপকাঠির স্কেলের ওপর তটরেখার দৈর্ঘ্যের এই নির্ভরশীলতাকে আরেকভাবেও দেখা যায়। ধরা যাক কোন এনসাইক্লোপিডিয়ায় একটি দেশের তটরেখার দৈর্ঘ্য 10,000 কিলোমিটার বলে লেখা আছে। যদিও এই জাতীয় তথ্যের সঙ্গে কোন স্কেলে তা মাপা হয়েছে তার কোন উল্লেখ থাকে না—আমরা ধরি পরিমাপের মূল স্কেল, অর্থাৎ মাপকাঠির দৈর্ঘ্য, 1 কিলোমিটার। এখন এই সীমান্তরেখা রক্ষা করার জন্য কতজন প্রহরীর প্রয়োজন হবে? উত্তরটা নির্ভর

করবে কত দূরে দূরে তাদের দাঁড় করানো হচ্ছে তার ওপর। যদি দুজন প্রহরীর মধ্যে 1 কিলোমিটার করে ফাঁক রাখা হয় তাহলে, স্পষ্টতই, 10,000 জন প্রহরী লাগবে। কিন্তু যদি আমরা তটরেখা বরাবর একটা 'মানবশৃঙ্খল' রচনা করতে চাই, তাহলে? সেক্ষেত্রে দু'জন প্রহরীর মাঝে ফাঁকটা হবে প্রায় এক মিটার করে। আর যেহেতু ফাঁকটা এক কিলোমিটার থেকে কমে একমিটার হচ্ছে, অর্থাৎ সেটা 1,000 গুণ কমে যাচ্ছে, আমাদের মনে হবে এক্ষেত্রে 10,000 x 1,000 জন অর্থাৎ এক কোটি প্রহরীর দরকার হবে।
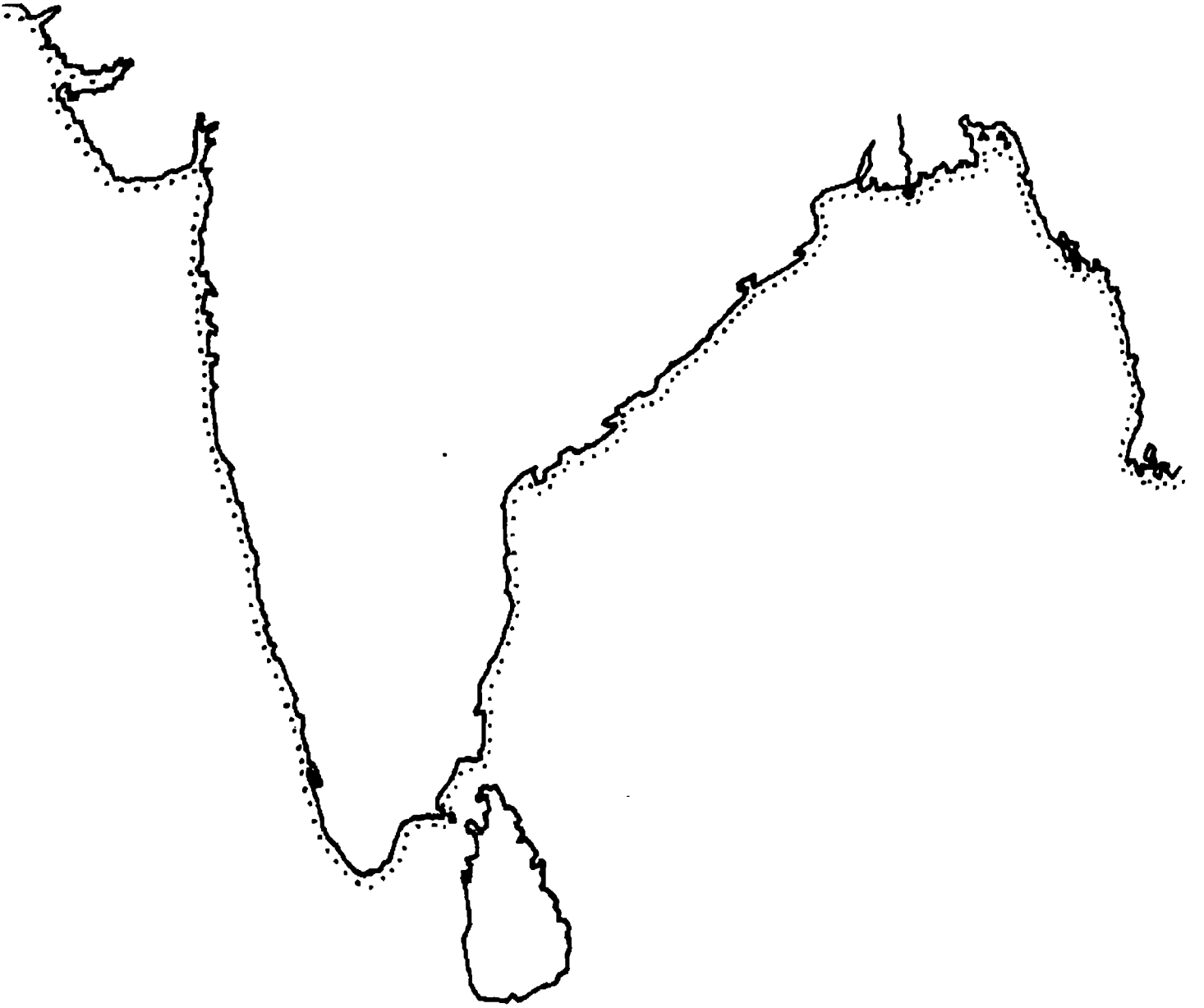
চিত্র 7·1 ভারতের তটরেখা বরাবর সৈনিক বসানোর চিত্র। বক্তব্যের ব্যাখ্যা মূল গ্রন্থাংশে আছে।

এই উত্তরটা ভুল। সরলরেখা অথবা বৃত্ত বা অধিবৃত্তের মত মসৃণ, নিষ্কোণ বক্ররেখা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমাদের মনে যে ধারণার জন্ম হয় তার ওপর

নির্ভর করে চলতে গিয়েই এই ভুল। ঐ জাতীয় রেখার কোন নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যকে ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত করলে, টুকরোর মোট সংখ্যা এবং প্রতি টুকরোর দৈর্ঘ্য পরস্পরের ব্যাস্তানুপাতিক হবে। এক মিটার দীর্ঘ রেখার জন্য এক সেন্টিমিটারের 100 টা টুকরো বা এক মিলিমিটারের 1000 টা টুকরো দরকার হবে। যদি প্রতি টুকরোর দৈর্ঘ্য "l" এবং "N" সংখ্যক টুকরো জুড়ে "L" দৈর্ঘের রেখা তৈরি হয় তাহলে স্পষ্টতই, $L = N \times l$ বা $N \propto {}^{1}/_{l}$। মসৃণ, নিষ্কোণ বক্ররেখার সুনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য থাকে। বক্ররেখাকে ছোট ছোট জ্যা-তে বিভক্ত করে আমরা তার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার চেষ্টা করতে পারি। প্রতিটি জ্যা যদি 'l' দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হয় এবং 'N' সংখ্যক জ্যা জুড়ে বক্ররেখাটিকে তৈরি করা যায় তাহলে $N \times l$ ঐ রেখার দৈর্ঘ্যের একেবারে সমান না হলেও প্রায় সমান হবে। এক্ষেত্রে জরুরী কথাটা হ'ল এই যে 'l' যত ছোট হবে এবং তার ফলে 'N' যত বড় হতে থাকবে $N \times l$ এর মান রেখার দৈর্ঘ্যের প্রকৃত মানের তত কাছাকাছি যেতে থাকবে। অঙ্কের ভাষায় বলা যায়— l-এর মান শূন্যের এবং N-এর মান অসীমের খুব কাছাকাছি চলে গেলে $N \times l$ একটি নির্দিষ্ট সীমাস্থ মানে উপনীত হবে। $N \times l$-এর ঐ মানকে বক্ররেখার প্রকৃত দৈর্ঘ্য বলা যায়। অর্থাৎ l ছোট হ'লে, মসৃণ বক্ররেখার ক্ষেত্রে $N \propto l$ সম্পর্কটা খাটে। আর সরলরেখার ক্ষেত্রে তো সম্পর্কটা সবসময়েই সত্যি (চিত্র নং 7·2 দ্রষ্টব্য)। কিন্তু একটা দেশের তটরেখা মসৃণ এবং নিষ্কোণ নয়। যত ছোট স্কেলে সেটাকে নিরীক্ষণ করা হবে তত বেশি করে নতুন নতুন কোণা এবং বাঁক দেখা দেবে। ঐ রেখার দৈর্ঘ্য, তাই, সুনির্দিষ্ট নয়। মাপকাঠির দৈর্ঘ্য যত কমে রেখার দৈর্ঘ্যের পরিমাপ তত বাড়ে। আর মসৃণ বক্ররেখার ক্ষেত্রে যেরকম হয়, এক্ষেত্রে $N \times l$-এর মান সেরকম কোন নির্দিষ্ট মানে উপনীত হয় না। l ছোট হ'তে থাকলে N এত দ্রুত হারে বড় হয় যে $N \times l$-এর মান সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পরিস্থিতিটা অবশ্য যতটা মনে হচ্ছে অতটা হতাশ হওয়ার মত নয়। তটরেখাটা 'যা খুশী তাই' ধরনের কোন ব্যাপার নয়। তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা নিয়ম আছে—বিভিন্ন স্কেলে সেটার রূপ একইরকম অর্থাৎ স্ব-সদৃশ। এবং l কমতে থাকলে N যে বাড়ে তার মধ্যেও একটা নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। মসৃণ রেখার মত এক্ষেত্রে $N \propto {}^{1}/_{l}$ হয় না ঠিকই কিন্তু প্রায় ঐ রকমই সহজ একটা সম্পর্ক এক্ষেত্রেও বজায় থাকে : $N \propto {}^{1}/_{l^D}$,

যেখানে D একটি মিশ্র ভগ্নাংশ (পূর্ণসংখ্যা নয়) এবং এর মান 1 থেকে 2-এর মধ্যে থাকে। log N এবং log l-এর মধ্যে যদি গ্রাফ টানা যায় তাহলে তার নতিকোণ (Slope) থেকে D-র মান জানা যাবে। ধরা যাক কোন একটা বিশেষ তটরেখার জন্য D = 1·25 (প্রায়)। এবার সেই পুরানো প্রশ্নটার আমরা উত্তর
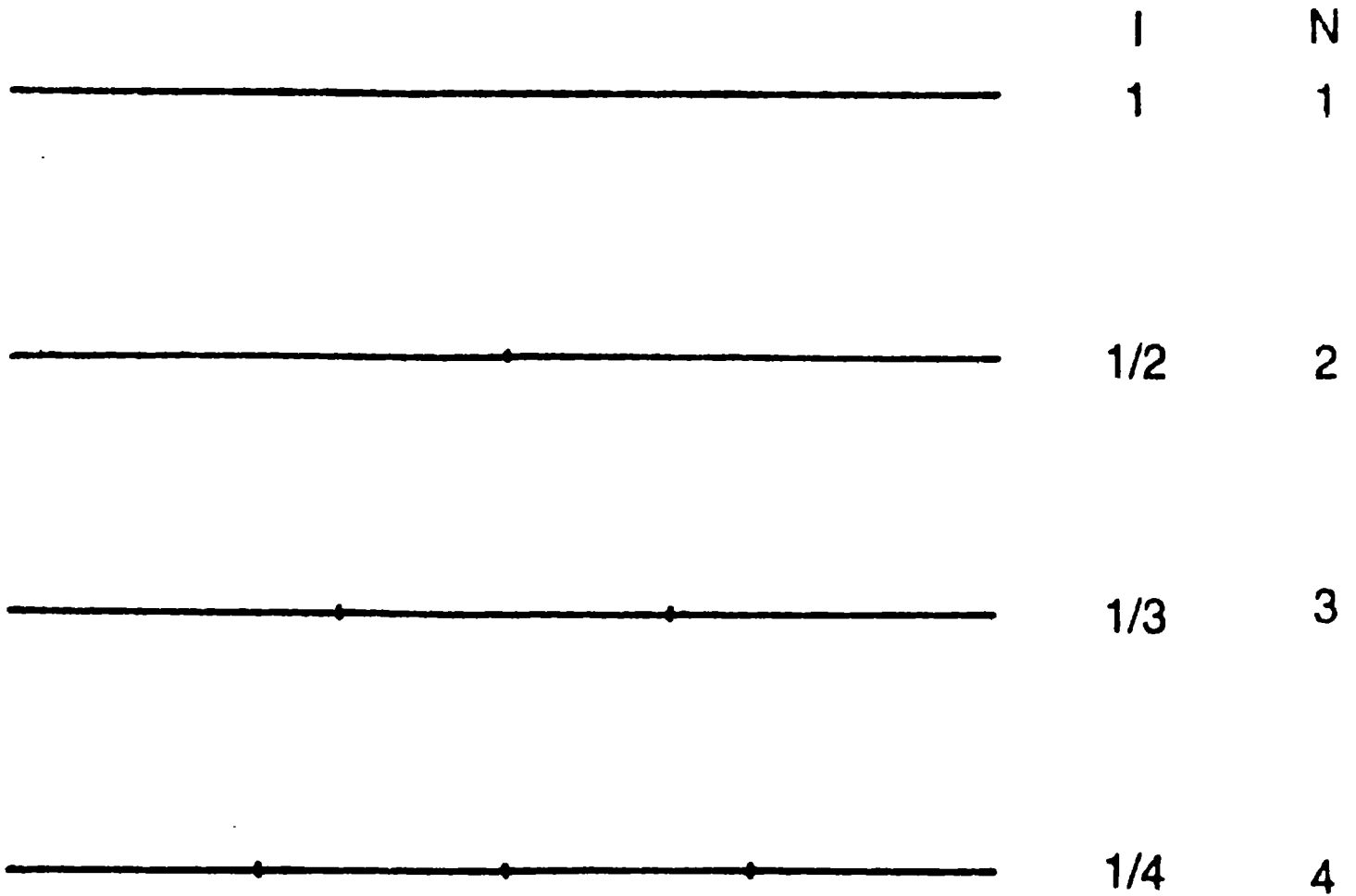
চিত্র 7·2 একটি সরলরেখাকে ক্ষুদ্রতর l দৈর্ঘ্যের অংশে ভেঙে ফেলা। ক্ষুদ্র অংশগুলির সংখ্যা N তার দৈর্ঘ্য l-এর ব্যস্তানুপাতিক। $N \propto {}^{1}/_{l}$

দিতে পারব। l যদি 1000 গুণ কমে যায়, N তাহলে $(1000)^{1\cdot25}$ গুণ অর্থাৎ প্রায় 5623 গুণ বেড়ে যাবে। বিভিন্ন তটের জন্য D-র মান বিভিন্ন হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূল কথাটা সবক্ষেত্রে একই—মাপকাঠির দৈর্ঘ্য বা স্কেলের সঙ্গে যতবার সেটাকে ফেলে মাপা হচ্ছে সেই সংখ্যার একটা সহজ গাণিতিক সম্পর্ক বর্তমান। আঁকাবাঁকা, কুঞ্চিত তটরেখার জটিল চেহারার অন্তরালে একটা আশ্চর্য নিয়ম ক্রিয়াশীল রয়ে গেছে। N x l-এর মান কোন সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে না — শুধু বেড়েই চলে কিন্তু $N \times l^{D}$ একটা নির্দিষ্ট, সসীম মানে উপনীত হয়। আমরা এই $N \times l^{D}$ রাশিটিকেই তটরেখার দৈর্ঘ্য আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু কোন রাশিকে কি নাম দেওয়া হচ্ছে তার থেকেও মূল্যবান কথা হ'ল এই যে প্রত্যেক তটরেখার ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত সম্পর্কটা সত্য : $N \propto {}^{1}/_{l^{D}}$

যেখানে D একটি ধ্রুবক। এই D কে তটরেখার মাত্রা বা ডাইমেনশন বলা হয়।

কোন সরলরেখা বা মসৃণ বক্ররেখার জন্য আমরা দেখলাম, $N \propto {}^{1}/_{l}$ হয়। ওপরের সংজ্ঞা অনুযায়ী তাহলে ঐ সব রেখার জন্য D-এর মান দাঁড়াচ্ছে 1। একটা বর্গাকার পাতের ডাইমেনশন কত হবে? ধরা যাক বর্গক্ষেত্রটির একেকটা

বাহু 10 সেন্টিমিটার করে লম্বা। 1 সেন্টিমিটার বাহুওয়ালা কতগুলো বর্গক্ষেত্র ঐ বড় বর্গক্ষেত্রটাকে ভরাট করতে লাগবে? এর উত্তর হ'ল 100 টা, বরং সবারই এটা জানা। এখন, প্রত্যেক বাহু 1 মিলিমিটার করে হ'লে সেরকম বর্গক্ষেত্র লাগবে 10,000 টা। তাহলে দেখা যাচ্ছে দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি 1 সেন্টিমিটার থেকে 1 মিলিমিটার হয়ে গেলে অর্থাৎ 10 গুণ কমে গেলে ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর সংখ্যা 100 গুণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ বর্গাকার পাতের জন্য $N \propto {}^1/_{l^2}$ এবং তার মাত্রা D-এর মান 2. একইরকম যুক্তিতে দেখানো যায় যে একটা ঘনত্বের (cube) ডাইমেনশন 3.

আমরা সাধারণভাবে মাত্রা বা ডাইমেনশন বলতে যা বোঝাই তার সঙ্গে এই ধারণার কোন দ্বন্দ্ব নেই। কোন সরলরেখা বা মসৃণ বক্ররেখার ওপর একটি মূলবিন্দু একবার ঠিক করে নিয়ে তার সাপেক্ষে অন্য কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্দেশ করতে মাত্র একটি সংখ্যা প্রয়োজন হয় — তাই ঐ রেখার মাত্রা এক। একটি সমতলে ঐ ভাবে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করতে দুটি সংখ্যা লাগবে — তাই তার মাত্রা দুই। ত্রিমাত্রিক দেশে বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্দেশ করতে একইভাবে তিনটি সংখ্যা লাগবে। তাই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পরিচিত ক্ষেত্রে যখন D-এর মান 1, 2 বা 3-এর মত পূর্ণসংখ্যা হয় তখন $N \propto {}^1/_{l^D}$ সম্পর্কটার অর্থ বেশ পরিষ্কারই
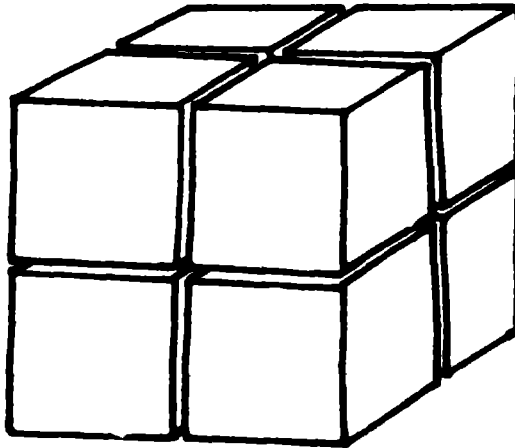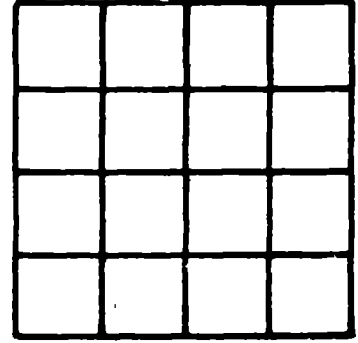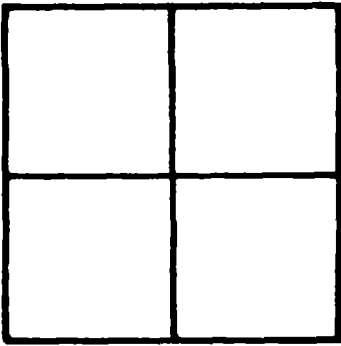
চিত্র 7·3 কোন বর্গক্ষেত্রকে ভরাট করতে যে ক্ষুদ্রতর বর্গক্ষেত্র লাগে তাদের বাহুর দৈর্ঘ্য অর্ধেক করলে প্রয়োজনীয় সংখ্যা চর্তুগুণ হয়, অর্থাৎ $N \propto {}^1/_{l^2}$; তাই বর্গক্ষেত্রের মাত্রা 2। ঘনকের ক্ষেত্রে সম্পর্কটা হ'ল $N \propto {}^1/_{l^3}$; তাই তার মাত্রা 3।

বোঝা যায়। কিন্তু এই সম্পর্কটার একটা বাড়তি সুবিধা হ'ল এই যে যখন D পূর্ণসংখ্যা নয় তখনও ওটা খেটে যায়। কোণা এবং বাঁকে ভর্তি বক্ররেখার ক্ষেত্রে D-র মান ভগ্নাংশ হয় এবং তখনও ঐ সম্পর্কটা সত্যি থাকে। এর ফলে মাত্রা বা ডাইমেনশনের অর্থের একটা সাধারণীকৃত বিস্তৃততর রূপ আমরা পাচ্ছি—যে সংজ্ঞা অনুযায়ী জ্যামিতিক বস্তুর মাত্রা পূর্ণসংখ্যা যেমন হতে পারে তেমন ভগ্নাংশও হতে পারে। যে সব জিনিসের মাত্রা পূর্ণসংখ্যা নয় তাদের নাম দেওয়ার জন্য ম্যান্ডেলব্রট একটি নতুন শব্দ চয়ন করলেন—ফ্র্যাক্‌টাল (Fractals)।

আট

স্ব-সাদৃশ্য—গোড়ার কথা

একটি দেশের সীমারেখা বরাবর চলতে গিয়ে আমরা দুটো মূল্যবান ধারণার সন্ধান পেলাম। প্রথমত ঐ সীমানা স্ব-সদৃশ—অর্থাৎ বিভিন্ন স্কেলে সেটাকে একই রকম দেখতে। দ্বিতীয়ত ও দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি দিয়ে ঐ সীমার দৈর্ঘ্য মাপতে যদি সেটাকে N বার ফেলতে হয় তাহলে $N \propto 1/l^D$, যেখানে D পূর্ণসংখ্যা নয়, তার মান 1 এবং 2 এর ভেতরে। বস্তুত এই দুটোর মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে—সেই সম্পর্কের ভিত্তিটা হ'ল এই যে স্ব-সাদৃশ্যের উৎপত্তি ঘাত-নির্ভর সূত্র (Power law) থেকে।

কোন বিশেষ ঘাতে (power) উন্নীত একটি রাশি যদি অপর একটি রাশির সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রকাশকারী সূত্রকে ঘাত-নির্ভর সূত্র বলা হয়। $y = x$ এইরকম একটি সূত্র যেখানে ঘাতের মান 1। $y = x^2$, $y = 1/x$, $y = x^{1/2}$, $y = x^{2/3}$ এর সবগুলোই ঘাত-নির্ভর সূত্র যেখানে ঘাতের মান 2, -1, $1/2$ ইত্যাদি। একইভাবে কোন বস্তুর মাত্রা নির্দেশকারী সূত্র $N \propto l^{-D}$ ও একটি ঘাতনির্ভর সূত্র যেখানে ঘাতের মান $-D$।

স্ব-সাদৃশ্যের উৎস এইজাতীয় সূত্রে নিহিত থাকবে কেন? উত্তরটা সোজা—ঘাত-নির্ভর সূত্রে কোন অন্তর্নিহিত দৈর্ঘ্যের স্কেলের অস্তিত্ব নেই। দৈর্ঘ্যের যে কোন স্কেলেই সেটা সত্যি। অন্যদিকে $y = \sin(x/l)$ ধরনের সূত্র ঘাত-নির্ভর নয়—এটা ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের উদাহরণ। এর মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত দৈর্ঘ্যের স্কেল রয়েছে—λ রাশিটিকে অবলম্বন করে। কিন্তু $y = x^2$ জাতীয় সূত্রে λ-র তুলনীয় কোন রাশি নেই কেন? কারণটা এই যে x^2-এর একটা সুনির্দিষ্ট মাত্রা বা ডাইমেনশন আছে। x কে যদি মিটারে প্রকাশ করা হয় তাহলে x^2-এর মাত্রা বর্গমিটার হবে। অন্যদিকে ত্রিকোণমিতিক ফাংশন $\sin x$ অনেকগুলো শ্রেণীবদ্ধ পদের যোগফল—ঐ শ্রেণীর বিভিন্ন পদে x-এর ঘাত বিভিন্ন। মাত্রার দিক থেকে বিচার করলে এইরকম একটা শ্রেণী তখনই অর্থবহ হয় যখন x-এর স্থানে একটি মাত্রাশূন্য (dimensionless) রাশি থাকে—আর তা করতে গেলে x কে আরেকটা

দৈর্ঘ্য, λ, দিয়ে ভাগ করতে হবে। বাস্তব জগতে যেসব প্রক্রিয়া এইজাতীয় সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট দৈর্ঘ্য অন্তর্নিহিত থেকে যায়। কিন্তু ঘাত-নির্ভর সূত্র পরিচালিত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেরকম ঘটে না।

খুব সহজ কয়েকটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বোঝা সম্ভব। মহাকর্ষের সূত্রানুযায়ী দুটি বিন্দু-ভরের মধ্যেকার দূরত্ব r হলে মহাকর্ষীয় বল r^2-এর ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। এই সূত্রে কোন অন্তর্নিহিত দৈর্ঘ্যের মাত্রা নেই। একটা গ্রহের ছোট মাপের কক্ষ থেকে অন্য একটার বড় মাপের কক্ষ পেতে গেলে দৈর্ঘ্য ও সময়ের স্কেলকে প্রয়োজন মত বিবর্ধিত করলেই চলে। অন্যদিকে, কোন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আলোর তীব্রতা অতিক্রান্ত দূরত্বের সাপেক্ষে যে সূত্র অনুযায়ী হ্রাস পায় সেটা ঘাত-নির্ভর নয়। এর মধ্যে একটা বিশিষ্ট দৈর্ঘ্য অন্তর্নিহিত রয়েছে যেটা বলে দেয় যে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করলে আলোর তীব্রতা তার প্রাথমিক মানের অর্ধেকে (বা অন্য কোন নির্দিষ্ট ভগ্নাংশে) পরিণত হবে। যখনই এরকম কোন বিশিষ্ট দৈর্ঘ্য সূত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তখন ভিন্ন ভিন্ন স্কেলে সেটার রূপ একরকম হয় না—স্ব-সাদৃশ্যও দেখা যায় না। আর যখন ঐ রকম কোন দৈর্ঘ্য থাকে না তখন দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন স্কেলে রূপভেদ ঘটে না—স্ব-সাদৃশ্য প্রতিভাত হয়।

বহুক্ষেত্রে একটা সমস্যার সমস্ত খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে শুধু স্কেল বদলের সঙ্গে সঙ্গে রূপভেদ ঘটছে কিনা সেটা বিচার করেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা যায়। যেমন ধরা যাক—একটা মানুষ মাপে কত বড় হবে—এই প্রশ্নটা। মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি যে নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বিশিষ্ট দৈর্ঘ্য অন্তর্নিহিত রয়েছে নইলে আমরা লিলিপুটের মত ছোটমাপের লোক থেকে শুরু করে দৈত্যাকৃতি মানব সবই দেখতে পেতাম। কিন্তু তা পাইনা। গ্যালিলিও সর্বপ্রথম এটা লক্ষ করেন যে জীবজন্তুর আকার বৃদ্ধির সূত্র স্কেল-নিরপেক্ষ নয়। একটা মানুষের দৈর্ঘ্যের মাপগুলো যদি দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে তার ওজন বাড়ে আটগুণ। হাড়গুলো দ্বিগুণ চওড়া হওয়ায় তাদের প্রস্থচ্ছেদ চতুর্গুণ হবে—ফলে তাদের ওজন বহন করার ক্ষমতাও ঐ চারগুণই বৃদ্ধি পাবে। আটগুণ বেড়ে যাওয়া ওজন তারা বইতে পারবে না। ফলে ঐরকম বড় স্কেলের একজন মানুষ নিজের ভারেই ভেঙে পড়বে। তাই হাড়ের উপাদানের ভারবহন ক্ষমতা এবং পৃথিবীর অভিকর্ষের (অভিকর্ষজ ত্বরণের) মান—এই দুইয়ে মিলে ঠিক করে একজন মানুষের মাপ কি হবে।

স্কেল সম্বন্ধীয় ধারণা ব্যবহার করলে রৈখিক দোলক সম্বন্ধে যে সূত্র আমরা তৃতীয় অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি সেটা কয়েক লাইনে বের করে ফেলা যায়। আমরা জানি কোন বস্তুর গতিশক্তি হচ্ছে তার ভর এবং গতিবেগের বর্গের গুণফলের অর্ধেকের সমান। আবার দোলকের স্থিতিশক্তি হ'ল সাম্যাবস্থা থেকে তার

সরণের বর্গের সমানুপাতিক। তখন, সরণকে সময় দিয়ে ভাগ করলেই বেগ পাওয়া যায়। সুতরাং সরণ বা দৈর্ঘ্যের স্কেলের পরিবর্তনের সঙ্গে যদি গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তিকে একইভাবে বদলাতে হয় তাহলে কাল বা সময়ের মাপ অপরিবর্তিত রাখতে হবে—সেটা বদলানো চলবে না। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে একটা দোলকের দোলনকাল তার বিস্তারের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করবে না। (সাধারণত ক্যালকুলাস ব্যবহার করে অনুরূপ সিদ্ধান্ত টানা হয়।) একই ধরনের যুক্তি ব্যবহার করে দেখানো যায় যে অভিকর্ষের টানে পতনশীল বস্তুর নির্দিষ্ট দূরত্ব পড়তে যে সময় লাগে তা ঐ দূরত্বের বর্গমূলের সঙ্গে সমানুপাতিক।
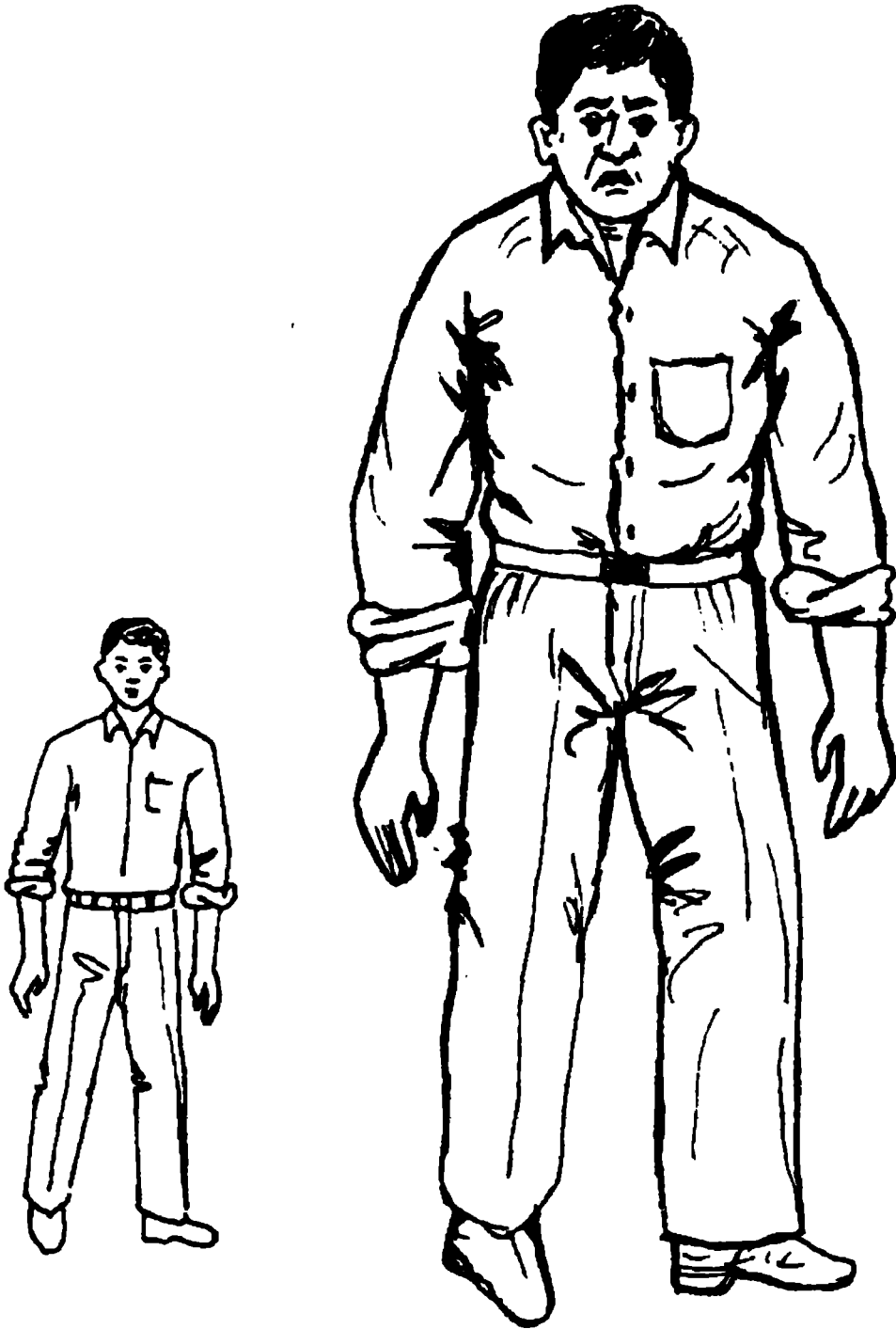
চিত্র 8·1 একজন মানুষের সব কিছু দ্বিগুণ বাড়ালে যে 'দৈত্য' তৈরি হবে সে নিজের ভার বইতে পারবে না। মানুষের আকার নির্ধারক নিয়ম স্কেল নিরপেক্ষ নয়—তাতে অন্তর্নিহিত একটি 'চরিত্রগত' মাপ রয়েছে।

চিত্র ৪·2 প্রকৃতিতে স্ব-সদৃশ (ফ্র্যাকটাল) আকৃতি তখনই দেখা যায় যখন ঐ আকৃতি সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়ায় কোন চরিত্রগত দৈর্ঘ্য অন্তর্নিহিত থাকে না।

প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে তৈরি হওয়া আকার-আকৃতির মধ্যে যে স্ব-সাদৃশ্য দেখা যায় তার মূলে রয়েছে ঘাত-নির্ভর সূত্র। যে মূল ভৌত-প্রক্রিয়াগুলো প্রাকৃতিক বস্তুর আকার নির্ধারণ করছে তারাই ঐ সূত্রের প্রকৃত উৎস। ঐ ভৌত-প্রক্রিয়াগুলি প্রায়শই খুব জটিল হয়ে থাকে এবং তাদের সমস্ত খুঁটিনাটি পরিষ্কারভাবে বোঝাও দুষ্কর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের একটা সাধারণ গুণ রয়েছে—সেটা হ'ল কোন অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের অনুপস্থিতি। সেটা না থাকায় এদের ঘাত-নির্ভর সূত্র দিয়ে প্রকাশ করা যায় এবং স্ব-সাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠে পাহাড় বা তটরেখার আকৃতি নির্ধারিত হয় ভূ-ত্বকের যে অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে তা নিশ্চয়ই মোটের ওপর স্কেল-নিরপেক্ষ। সেইজন্য ঐ অবক্ষয়-প্রক্রিয়ার বিপুল জটিলতা সত্ত্বেও যে আকৃতিগুলো তার দ্বারা সৃষ্ট হয় সেগুলো স্ব-সদৃশ। অবশ্য ভূ-বিজ্ঞানের সমস্ত প্রক্রিয়াই স্কেল-নিরপেক্ষ নয়। তাপশক্তির ব্যাপন যেসব প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মধ্যে বিশিষ্ট দৈর্ঘ্য এবং সময় নিহিত থাকে। তাই তারা যে আকৃতি

তৈরি করে তা ফ্র্যাকটালের মত নয়। যেখানে স্ব-সাদৃশ্য দেখা যায় সেখানেও কিন্তু তার চরিত্র সংখ্যায়ন নির্ভর অর্থাৎ স্কেল পরিবর্তনে নকশাটি মোটের ওপর অপরিবর্তিত থাকবে, একেবারে যথাযথ ভাবে নয়। এছাড়া, স্ব-সাদৃশ্যের চরিত্রগত স্কেল-নিরপেক্ষতা যে মান নির্বিশেষে যে কোন দৈর্ঘ্যেই বজায় থাকে তাও নয়। দৈর্ঘ্যের স্কেলের একটা বিরাট কিন্তু সসীম অঞ্চলেই এটা প্রযোজ্য—যার তলার দিকে রয়েছে মাটি বা পাথরের একটা দানার মাপ (কয়েক মিলিমিটার) আর ওপরের দিকে রয়েছে একটা দেশের সাইজ (10^3 বা 10^4 কিলোমিটার)। তাই, দেখা যাচ্ছে, একটা দেশের স্ব-সদৃশ তটরেখা সংখ্যায়ন-নির্ভর ফ্র্যাকটাল। ফ্র্যাকটালের চরিত্র অনুধাবন করতে হ'লে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে বাস্তব উদাহরণের এইসব সীমাবদ্ধতা থেকে সরে গিয়ে একদম যথাযথ, গাণিতিক, স্ব-সদৃশ্য আকৃতির দিকে নজর দেওয়া এবং তাদের **ফ্র্যাকটাল ডাইমেনশন বা মাত্রা নিরূপণ করা**।

নির্দেশিকার 18 এবং 21 নং পুস্তক দ্রষ্টব্য।

নয়

তুষারকণা এবং টালির নকশা

এ শতাব্দীর গোড়ায় ফন কখ্ (Von Koch) তুষারকণার সীমারেখার মত দেখতে একজাতীয় বক্ররেখার রূপ নির্দেশ করেন—ফ্রাকটালের উদাহরণ হিসেবে ঐ রেখার উল্লেখ বহু জায়গাতে করা হয়। কোন সমবাহু ত্রিভুজের বাহুগুলোকে একটা সহজ নিয়ম অনুযায়ী বার বার রূপান্তরিত করলে কখ্'এর বক্ররেখা পাওয়া যায়। নিয়মটা এইরকম—প্রত্যেক বাহুকে সমান তিনভাগে ভাগ করে তার মাঝের এক-তৃতীয়াংশ মুছে দিয়ে সেখানে ঐ ক্ষুদ্রতর মাপের একটা সমবাহু ত্রিভুজ খাড়া করতে হবে। একবার এটা করলে সমবাহু ত্রিভুজ একটি তারার ('ডেভিডের তারা') মত দেখতে হয়ে যায়। বার বার করার ফলে যে আকৃতিটা বেরিয়ে আসে তা 9·1 চিত্রে দেখানো হয়েছে। এই রূপান্তর অসংখ্যবার করলে যে বক্ররেখার সৃষ্টি হয় তারই নাম কখ্'এর রেখা।
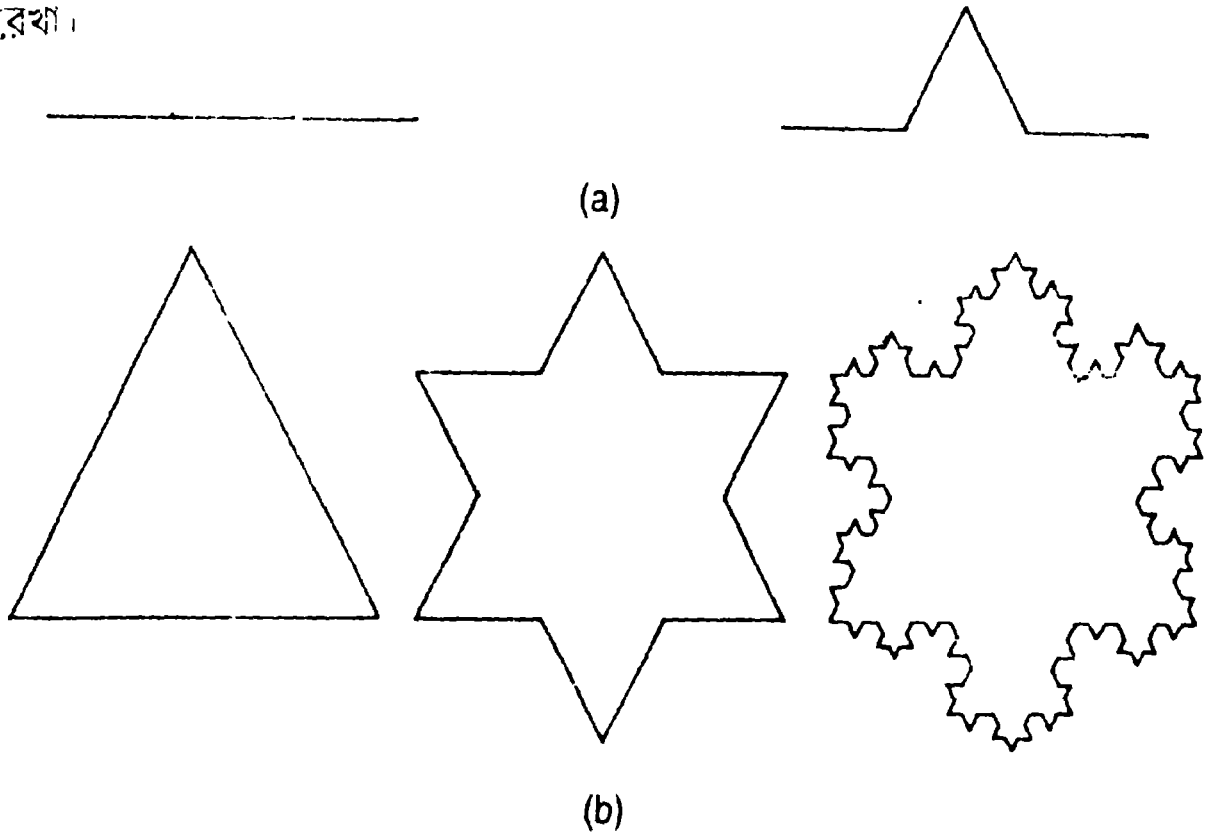
চিত্র 9·1 (a) কখ্'এর তুষারকণার আকৃতি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় রূপান্তর। (b) সমবাহু ত্রিভুজ থেকে প্রথম, তৃতীয় এবং বহু পুনরাবৃত্তির পর সৃষ্ট আকৃতি।

অঙ্কের চোখে কখের ঐ রেখা একটা বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার। অধিবৃত্ত বা উপবৃত্তের মত মসৃণ, নিরবচ্ছিন্ন বক্ররেখার প্রত্যেক বিন্দুতে নতিমাত্রা (slope) সুনির্দিষ্ট। কখের রেখা নিরবচ্ছিন্ন কিন্তু কোন বিন্দুতেই তার নির্দিষ্ট নতিমাত্রা বলে কিছু নেই। আবার আরেক দিক দিয়ে দেখলে কখের রেখা সারল্যের প্রতীক। সমস্ত স্কেলেই এটা স্ব-সদৃশ্য। 9·1 (খ) চিত্রের ঐ বক্ররেখার যেকোন একটা অংশের আকৃতি বৃহত্তর রেখারই অনুরূপ। একই রূপান্তর বারংবার করার ফলেই এই স্ব-সাদৃশ্যের উৎপত্তি। কিন্তু কখের রেখার দৈর্ঘ্য কত? প্রত্যেকবারের রূপান্তরের জন্য ঐ রেখার দৈর্ঘ্য $^4/_3$ গুণ করে বাড়ে। যদি শুরুতে ত্রিভুজটার পরিসীমা 3 একক হয়ে থাকে তাহলে একবার রূপান্তরের পর যে 'তারা'টা পাওয়া যায় তার পরিসীমা $3 \times {}^4/_3 = 4$ একক। এইভাবে n বার রূপান্তর ঘটালে পরিসীমার দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় $({}^4/_3)^n \times 3$, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য সীমাহীনভাবে বাড়তে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে কখের বক্ররেখার দৈর্ঘ্য অসীম। এটা খুবই আশ্চর্যজনক, কারণ সমতলের ওপর রেখাটি সীমাবদ্ধ জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে। বস্তুত প্রথম ত্রিভুজটাকে ঘিরে তার শীর্ষবিন্দুগুলো স্পর্শ করিয়ে একটা বৃত্ত আঁকলে তার যা ক্ষেত্রফল হ'ত কখ্-রেখার দ্বারা বেষ্টিত অংশের ক্ষেত্রফল তার চেয়ে কম। সাধারণত একটা সসীম ক্ষেত্রকে বেষ্টন করে থাকা মসৃণ বক্ররেখার দৈর্ঘ্য সসীমই হয়। কিন্তু তলের ওপর সসীম ক্ষেত্রকে বেষ্টন করেও কখ্-রেখা কি করে অসীম দৈর্ঘ্য লাভ করতে পারে? উত্তরটা রয়েছে স্ব-সদৃশ্যের মধ্যে—যার ফলে রেখাটার আঁকাবাঁকার মাত্রাটা সীমাহীন হতে পেরেছে। আর ঐরকম আঁকাবাঁকা অংশগুলোর দৈর্ঘ্য জুড়ে জুড়ে মোট দৈর্ঘ্য হয়ে গেছে অসীম —তার জন্য বক্ররেখাটিকে অসীম অবধি বিস্তৃত হতে হয়নি।

রেখার দৈর্ঘ্য কিভাবে অসীম হয়ে ওঠে তা একটু খুঁটিয়ে বিচার করা যেতে পারে। প্রত্যেক রূপান্তরের ফলে কখ্-রেখার অন্তর্ভুক্ত সরলরেখার টুক্‌রো (ত্রিভুজের বাহু) গুলোর দৈর্ঘ্য কমে এক তৃতীয়াংশ হয়ে যায়। যদি টুক্‌রোর সংখ্যা 3 গুণ বাড়ত তাহলে রেখার মোট দৈর্ঘ্য সসীম হ'ত। কিন্তু তা হয় না, প্রত্যেকবার রূপান্তরে টুক্‌রোর সংখ্যা 4 গুণ বাড়ে, 3 গুণ নয়। এরফলেই রেখার দৈর্ঘ্য সীমাহীন ভাবে বাড়তে থাকে। এরকম n বার ঘটার পর $l_n = {}^1/_{3^n}$ এবং $N_n = 3 \times (4)^n$ হবে। এই N এবং l এর মধ্যেকার সম্পর্কই এক্ষেত্রে ফ্র্যাকটাল মাত্রা (D) নির্ধারণ করবে। এখন, (D)-র সংজ্ঞা হিসেবে আমরা নীচের সম্পর্কটিকে গ্রহণ করতে পারি

$$D = \frac{\log (N_{n+1} / N_n)}{\log (l_n / l_{n+1})}$$

এটা N ∝ $^1/_{l^D}$-র সমতুল্য, কিন্তু একটু বেশি সুবিধাজনক। যেহেতু প্রতিবার N চারগুণ এবং l তিনভাগের একভাগ হয়ে যাচ্ছে। এখানে,

$$D = \frac{\log 4}{\log 3} = 1{\cdot}26 \text{ (প্রায়)}$$

দেখা যাচ্ছে কখের বক্ররেখা এমন একটি ফ্র্যাকটাল যার মাত্রা বা ডাইমেনশন হ'ল 1 এবং 2 এর মধ্যবর্তী একটি রাশি যা পূর্ণসংখ্যা নয়।

একটি মসৃণ রেখার মাত্রা এক। সাধারণ তলের মাত্রা দুই। কখ্-রেখার মাত্রা এই দুইয়ের মাঝামাঝি কি করে হয়? অসীম দৈর্ঘ্যকে একটি সসীম ক্ষেত্রফলের মধ্যে আবদ্ধ রাখার কাজে কখ্-রেখার সাফল্য দেখে বলতেই হয় যে উপলব্ধ স্থানকে ঠিক মত কাজে লাগানোর ব্যাপারে সাধারণ রেখার তুলনায় এর কুশলতা অনেক বেশি। এ যেন রেখা থেকে তল হয়ে উঠতে চাইছে। এরকম যুক্তি শুনে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে কোন রূপান্তরের ফলে এরকম একটা রেখাও কি পাওয়া যেতে পারে যা তলটাকে পুরোপুরি ভরিয়ে দিতে সক্ষম? যতই আশ্চর্য শোনাক—এই প্রশ্নের উত্তর হ'ল হ্যাঁ, সম্ভব। স্ব-সদৃশ হিলবার্ট-রেখার মাত্রা 2। আগ্রহী পাঠক বইয়ের শেষে দেওয়া নির্দেশিকার 18 নং পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা পাবেন।

ফ্র্যাকটালের বিষয়ে জানতে পারার পর স্কুলে শেখা জ্যামিতির অনেকগুলো নিয়ম সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার করে ভেবে দেখতে হয়। যেমন, ঐ রকম একটা নিয়ম হ'ল —দুটো সদৃশ বহুভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত তাদের পরিসীমার বর্গের অনুপাতের সমান হয়। 9·2 নং চিত্রে দুটো সুষম ষড়ভুজ দেখা যাচ্ছে। ছোট ষড়ভুজের প্রত্যেক বাহু একক দৈর্ঘ্য, আর বড়টির প্রত্যেক বাহু তার ঠিক দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যের। বড় ষড়ভুজটির ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$, আর ছোটটির $3\sqrt{3/4}$। এদের অনুপাত 4—দুটো ষড়ভুজের পরিসীমার বর্গের অনুপাতও তাই। এটাই প্রত্যাশিত।

এর পর 9·3 চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। সাতটি সুষম ষড়ভুজ সাজিয়ে একটি বহুভুজ তৈরি হয়েছে; ষড়ভুজের প্রত্যেক বাহু একক দৈর্ঘ্যের। এবার ঐ বাহুর এককটিকে এমনভাবে রূপান্তরিত করা হ'ল যাতে তারা তিনটে টুক্রোয় ভেঙে যায় এবং পাশাপাশি দু'টো টুক্রোর মধ্যেকার কোণ হয় 120^0। এক্ষেত্রে দেখানো যায় যে ঐ ধরনের প্রত্যেক টুক্রোর দৈর্ঘ্য হবে $^1/_{\sqrt{7}}$। এই রূপান্তর বার বার করা হলে যে ধরনের ফ্র্যাকটাল আকৃতি তৈরি হবে তার আদল পূর্বোক্ত চিত্রে দেখানো হয়েছে। ছবিটি স্ব-সদৃশ এবং ভেতরের ছোট, সাতটি ফ্র্যাকটাল বহুভুজের প্রত্যেকটির আকৃতি সব মিলিয়ে গড়ে ওঠা বড় বহুভুজের সদৃশ। এখানেও কি পূর্বে-আলোচিত সদৃশ বহুভুজের ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত নিয়মটা খাটবে?

9·3 নম্বর চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে বড় বহুভুজটির পরিসীমা ভেতরের যেকোন ছোট বহুভুজের 3 গুণ। কিন্তু বড়টির ক্ষেত্রফল ছোট বহুভুজের 7 গুণ মাত্র। অথচ

নিয়ম অনুযায়ী এটা 9 গুণ হওয়া উচিত ছিল। ফ্র্যাকটাল বহুভুজের ক্ষেত্রে, দেখা যাচ্ছে, নিয়মটা বদলানো দরকার—এক্ষেত্রে পরিসীমার বর্গের অনুপাতে ক্ষেত্রফল বদলাচ্ছে না—ঘাতটা 2 না হয়ে হচ্ছে $^2/_D$, যেখানে D হ'ল সীমানার বক্ররেখার ফ্র্যাকটাল মাত্রা। আলোচ্য উদাহরণে D-র মান হবে

$$\frac{\log 3}{\log \sqrt{7}} = 1{\cdot}13 \text{ (প্রায়)।}$$
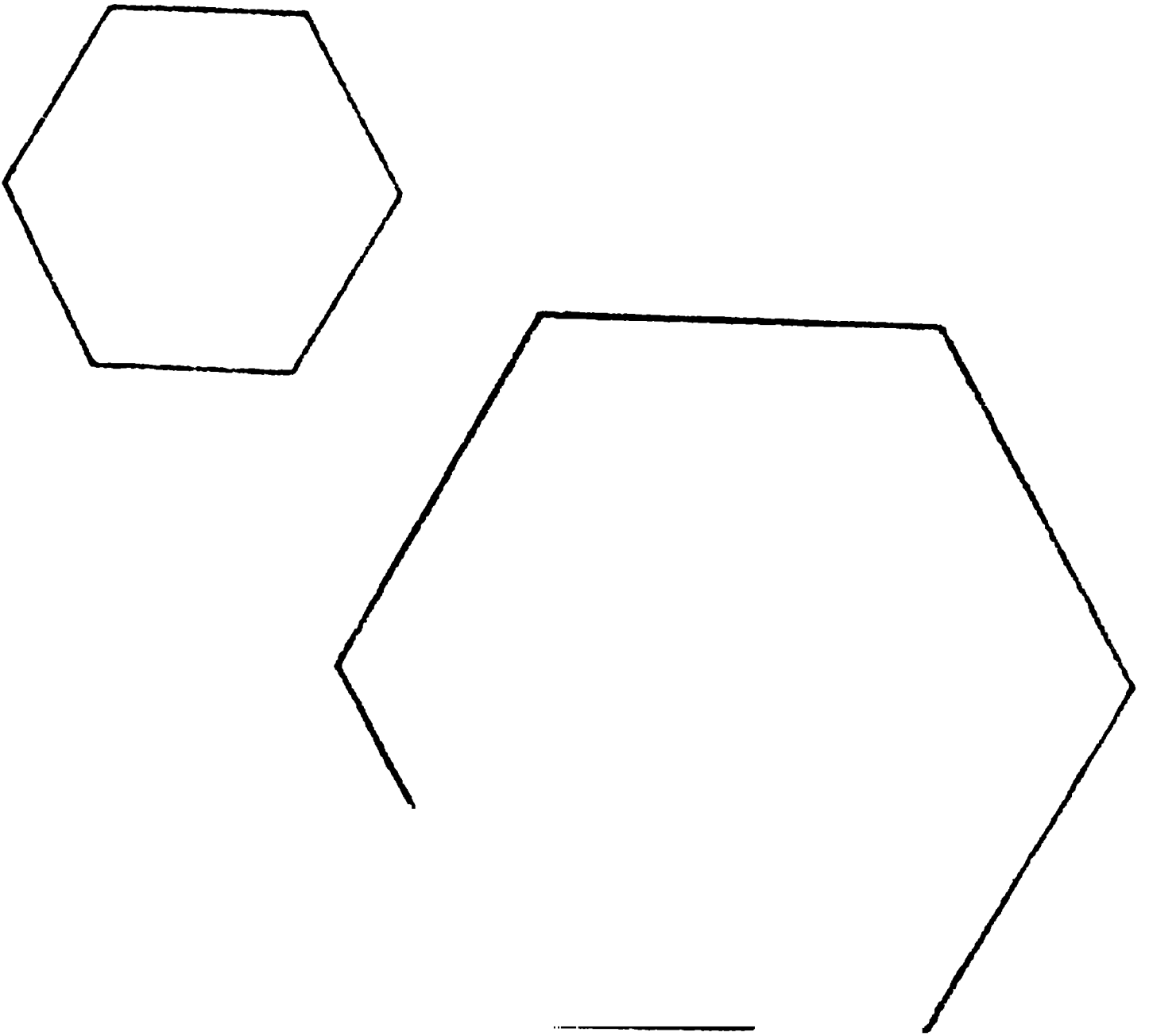
চিত্র 9·2 দুটি সুষম ষড়ভুজ। বড় এবং ছোটটির ক্ষেত্রফলের অনুপাত 4, ওদের পরিসীমার অনুপাতের (2) বর্গের সমান।

তাই ক্ষেত্রফল এক্ষেত্রে $(\text{পরিসীমা})^2$ এর সমানুপাতে না বদলে বদলাচ্ছে $(\text{পরিসীমা})^{2/1{\cdot}13}$ এর অনুপাতে। পরিসীমা 3 গুণ হ'লে, তাই, ক্ষেত্রফল 9 গুণ না

হয়ে $(3)^{2/1.13}$ অর্থাৎ প্রায় 7 গুণ হচ্ছে। বহুভুজের ফ্র্যাকটাল মাত্রা বিবেচনা করে আমরা সঠিক ফল পেলাম। ফ্র্যাকটালের ক্ষেত্রে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নির্ভুল কাজ করে যদি ফ্র্যাকটালের মাত্রা যে পূর্ণসংখ্যা নয়—ভগ্নাংশ—এটা ঠিকমত মনে রাখা যায়.
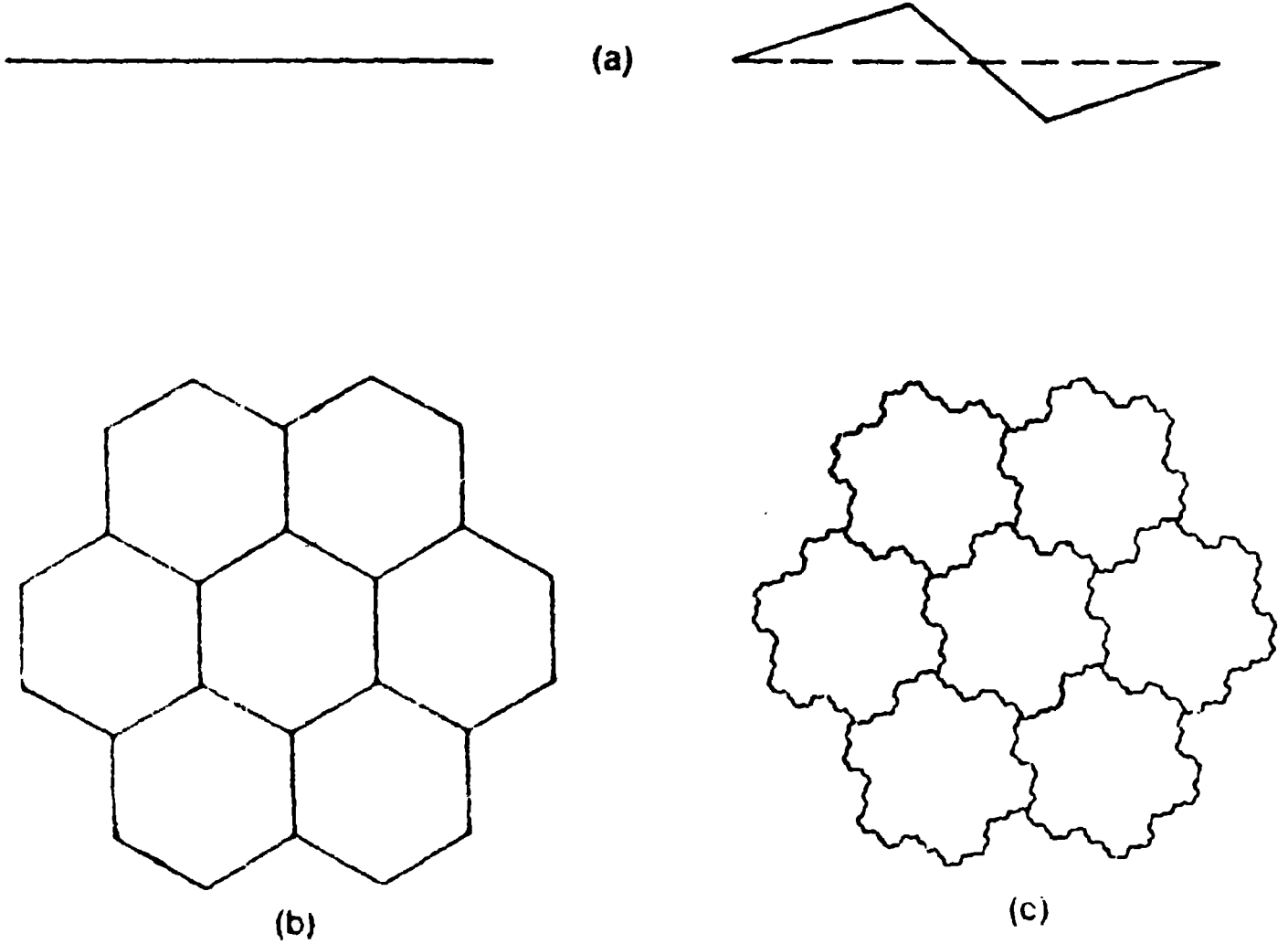
চিত্র ৬·3 (a) ফ্র্যাকটাল টালি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় রূপান্তর। (b) প্রাথমিক আকৃতি ঃ সাতটি ষড়্ভুজাকৃতি টালি একসাথে। (c) ফ্র্যাকটাল টালির আসন্ন রূপ।

ফ্র্যাকটাল টালির আলোচনা নির্দেশিকার 18 নং পুস্তকে রয়েছে।

দশ

ফুটো-ওয়ালা কার্পেট এবং সচ্ছিদ্র বাক্স

বিশেষ কিছু রূপান্তরের বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটালে স্ব-সাদৃশ্য এবং ফ্র্যাকটালের সৃষ্টি হয়। কখ্-এর তুষারকণার ক্ষেত্রে ঐ জাতীয় পুনরাবৃত্তি দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটাতে থাকে। এর উল্টোটাও করা সম্ভব। অর্থাৎ বার বার কোন বস্তুর একটা নির্দিষ্ট অংশ অপসারণ করা যেতে পারে। আর এর ফলে খুব মজার কিছু কার্পেট এবং বাক্স তৈরি হয়।

ফ্র্যাকটাল কার্পেট তৈরির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমরা একটা বর্গাকৃতির কার্পেট নিতে পারি যার বাহুগুলো একক দৈর্ঘ্যের। এটাকে ন'টা সমান আকারের
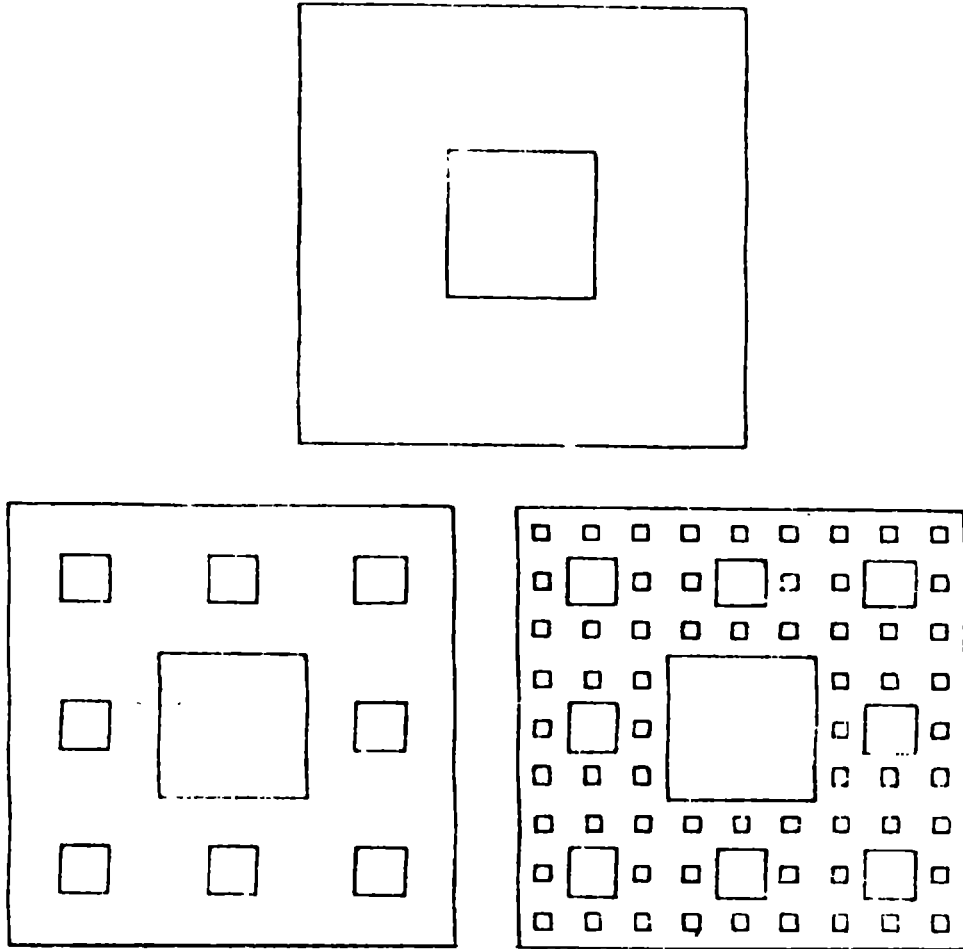
চিত্র 10·1 সিয়েরপিন্স্কি কার্পেট তৈরির প্রথম তিনটে ধাপ। কার্পেটে অসীম দৈর্ঘ্যের পরিসীমা দিয়ে যে পরিমাণ ক্ষেত্র বেষ্টিত থাকে তার মান শূন্য।

বর্গে ভাগ করে কেন্দ্রস্থ বর্গটিকে সরিয়ে নেওয়া হ'ল। এইটাই হ'ল মৌলিক রূপান্তর-যার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে বহুবার। যে আটটা বর্গ ক্ষেত্র বাকি থাকল তাদের প্রত্যেকটিতে এই একই রূপান্তর ঘটানো হ'ল। 10·1 চিত্রের দ্বিতীয় ছবিতে এর ফল দেখা যাচ্ছে। এই পুনরাবৃত্তি অসংখ্যবার ঘটালে যে স্ব-সদৃশ আকৃতি সৃষ্ট হয় তার নাম সিয়েরপিন্স্কি কার্পেট (Sierpinski Carpet)।

কার্পেটের ডাইমেনশন বের করার জন্য সেই আগের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে—যেটা কখ্-রেখার ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর বাহুর দৈর্ঘ্য ছোট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। একদম গোড়ায় পাচ্ছি। $n = 0, L_0 = 1, N_0 = 1$। প্রথম রূপান্তরের পর $n = 1, L_1 = 1/_3, N_1 = 8$। তারপর $n = 2, L_2 = 1/_9, N_2 = 64$। বাহুর দৈর্ঘ্য এক তৃতীয়াংশ হলে তাদের সংখ্যা নয় গুণ হয়ে যাচ্ছে না (যেরকম সাধারণ বর্গক্ষেত্রের বেলায় হয়ে থাকে)। সেটা হচ্ছে মাত্র আটগুণ। তাই সিয়েরপিন্স্কি কার্পেটের ডাইমেনশন 2 হবে না। তার চেয়ে কম হবে। সূত্র অনুযায়ী

$$D = \frac{\log 8}{\log 3} = 1{\cdot}89 \text{ (প্রায়)}$$

এই অদ্ভুত কার্পেটের ক্ষেত্রফল কত হবে? প্রত্যেক রূপান্তরের ফলে ক্ষেত্রফল (8/9) গুণ কমে যায়। n বার পুনরাবৃত্তির পর ক্ষেত্রফল দাঁড়ায় $(^8/_9)^n$; n-এর মান অসীমের নিকটবর্তী হলে ক্ষেত্রফল শূন্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছয়। অর্থাৎ অসংখ্য ছিদ্র যুক্ত ঐ কার্পেট কোনো জায়গায় অধিকার করে না। এবার দেখা যাক ঐ কার্পেটের মোট পরিসীমা কত। শুরুতে পরিসীমার মান 4। একবার রূপান্তরের পর সেটার মান দাঁড়ায় $4+^4/_3$। যখন $n = 2$ হয় তখন পরিসীমার দৈর্ঘ্য $4+^4/_3+^{32}/_9$। পরবর্তী পদগুলো ক্রমশ বড় হতেই থাকে—সীমাহীন ভাবে। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে সিয়েরপিন্স্কি কার্পেটের সীমানার দৈর্ঘ্য অসীম, কিন্তু সেই সীমারেখা যে ক্ষেত্রকে বেষ্টন করে আছে তার মান শূন্য।

ফুটো তৈরি করার এই ধ্বংসাত্মক (নাকি সৃষ্টিশীল?) খেলা যে শুধু বর্গাকৃতি কার্পেটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়। ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রে এটা কিভাবে করা যায় তা 10·2 নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক রূপান্তরে, এখানে, ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে—আর তাদের সংখ্যা বাড়ছে 3 গুণ। এর ফলে যে স্ব-সদৃশ আকৃতি তৈরি হচ্ছে তার ফ্র্যাকটাল মাত্রা

$$\frac{\log 3}{\log 2} = 1.58 \text{ (প্রায়)}।$$

এর নাম সিয়েরপিনস্কি গ্যাস্কেট (Gasket)। শুধু বাহুগুলোকে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে যে সেখানেও প্রতি পদক্ষেপে দৈর্ঘ্য অর্ধেক এবং সংখ্যা তিনগুণ হচ্ছে। অর্থাৎ গ্যাস্কেটের পরিসীমার ফ্র্যাকটাল মাত্রা আর ক্ষেত্রের মাত্রা একদম এক। ফলে
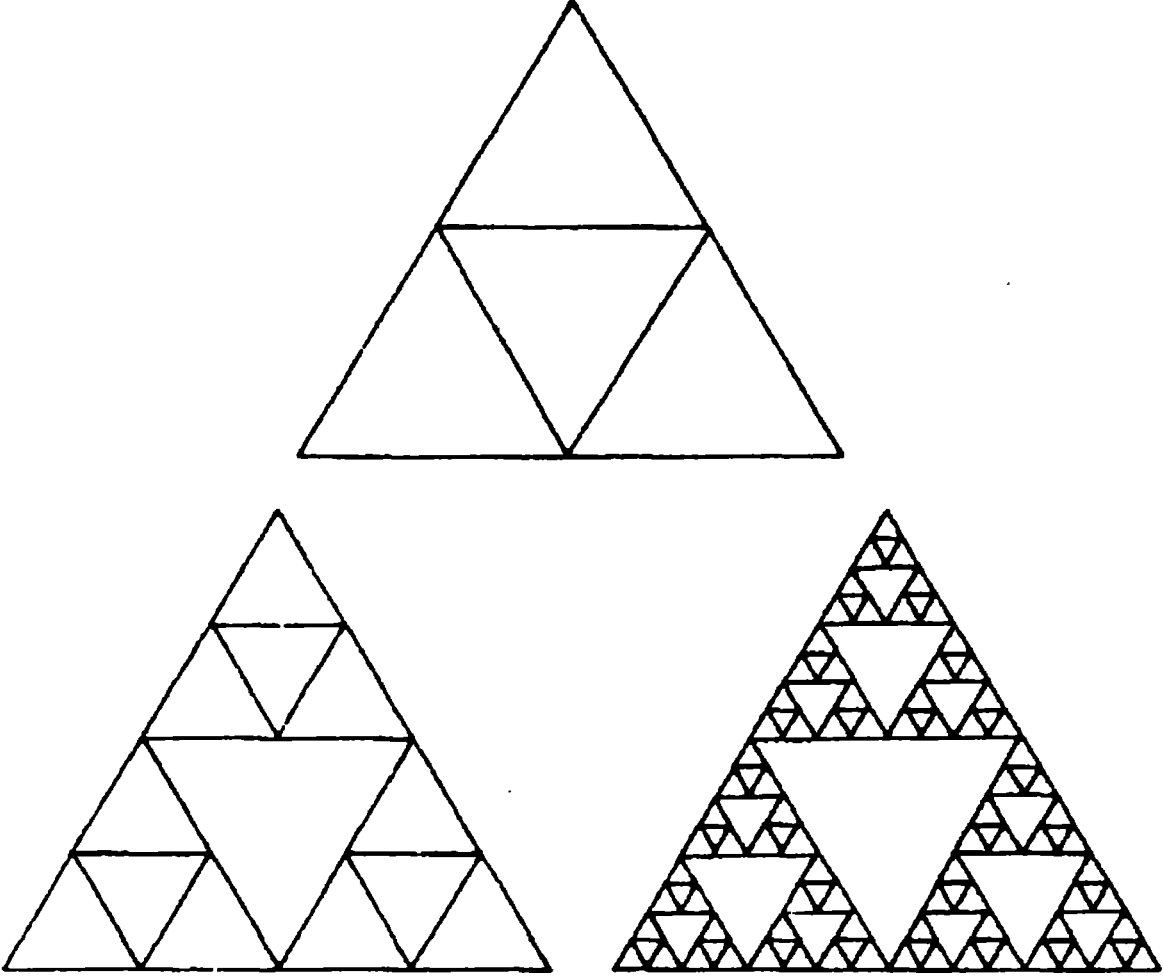
চিত্র 10·2 সিয়েরপিন্স্কি গ্যাস্কেট তৈরির কয়েকটি ধাপ। এর পরিসীমা এবং ক্ষেত্রফল উভয়েরই মাত্রা 1·58। সাধারণ ইউক্লিডীয় দেশে এটা কখনোই হয় না।

একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যেখানে ক্ষেত্রফল গ্যাস্কেটের পরিসীমার সমানুপাতিক, হচ্ছে তার বর্গের সমানুপাতিক নয়।

ত্রিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রেও এরকম করা সম্ভব। ত্রিভুজ নিয়ে শুরু না করে একটা সুষম চতুস্তলক নিয়ে আরম্ভ করা যায়—সেটাকে কেটে অর্ধেক দৈর্ঘ্যের বাহু বিশিষ্ট অষ্টতলকে পরিণত করা যায়। এর ফলে চারখানা চতুস্তলক পাওয়া যাবে। তাদের প্রত্যেকের ওপর রূপান্তরটির পুনরাবৃত্তি ঘটানো যেতে পারে। এখানে প্রতি পদক্ষেপে দৈর্ঘ্য অর্ধেক হলে চতুস্তলকের সংখ্যা 4 গুণ হচ্ছে—সাধারণ ত্রিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রে যেটা আটগুণ হওয়া উচিত ছিল। আর এর ফলে যে সিয়েরপিন্স্কি গ্যাস্কেট তৈরি হচ্ছে তার মাত্রা হচ্ছে

$$\frac{\log 4}{\log 2} = 2$$

অর্থাৎ যে ত্রিমাত্রিক দেশে (space) এর অবস্থান তার চেয়ে গ্যাস্কেটের মাত্রা এক কম। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ফ্র্যাকটালের মাত্রা ক্ষেত্রবিশেষে পূর্ণসংখ্যাও হতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সমমাত্রার সাধারণ রেখা বা তল এবং ফ্র্যাকটাল একই জিনিস।

ত্রিমাত্রিক সিয়েরপিনস্কি কার্পেটের নাম মেঞ্জার (Menger) স্পঞ্জ। একক বাহু-দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ঘনক নিয়ে এক্ষেত্রে শুরু করতে হয়। তাকে সাতাশটা ছোট ঘনকে ভাগ করে কেন্দ্রস্থ ঘনক এবং 6 টি পার্শ্বতলের প্রত্যেকটির মাঝের ঘনকগুলি সরিয়ে ফেলা হয়। অবশিষ্ট 20 টি ঘনকের প্রত্যেকটিতে এই একই রূপান্তরের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয় অসংখ্য বার। ঘনকের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য একেকবারে এক — তৃতীয়াংশ হয়ে যাচ্ছে আর তাদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে 20 গুণ। ফলত এই স্পঞ্জের মাত্রা হ'ল

$$\frac{\log 20}{\log 3} = 2.73 \text{ (প্রায়)}$$

প্রত্যেক পুনরাবৃত্তির ফলে আয়তন কামে যাচ্ছে 20/27 গুণ—তাই স্পঞ্জের চূড়ান্ত আয়তন শূন্য। অন্যদিকে প্রত্যেকবার উপরিতলের ক্ষেত্রফলের যে বৃদ্ধি ঘটে তার যোগফল সীমাহীন—অর্থাৎ ঐ ক্ষেত্রফলের সীমাস্থ মান অসীম। তার মানে মেঞ্জার স্পঞ্জে অসীম ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট তল দিয়ে শূন্য পরিমাণ আয়তন ঘেরা থাকে।
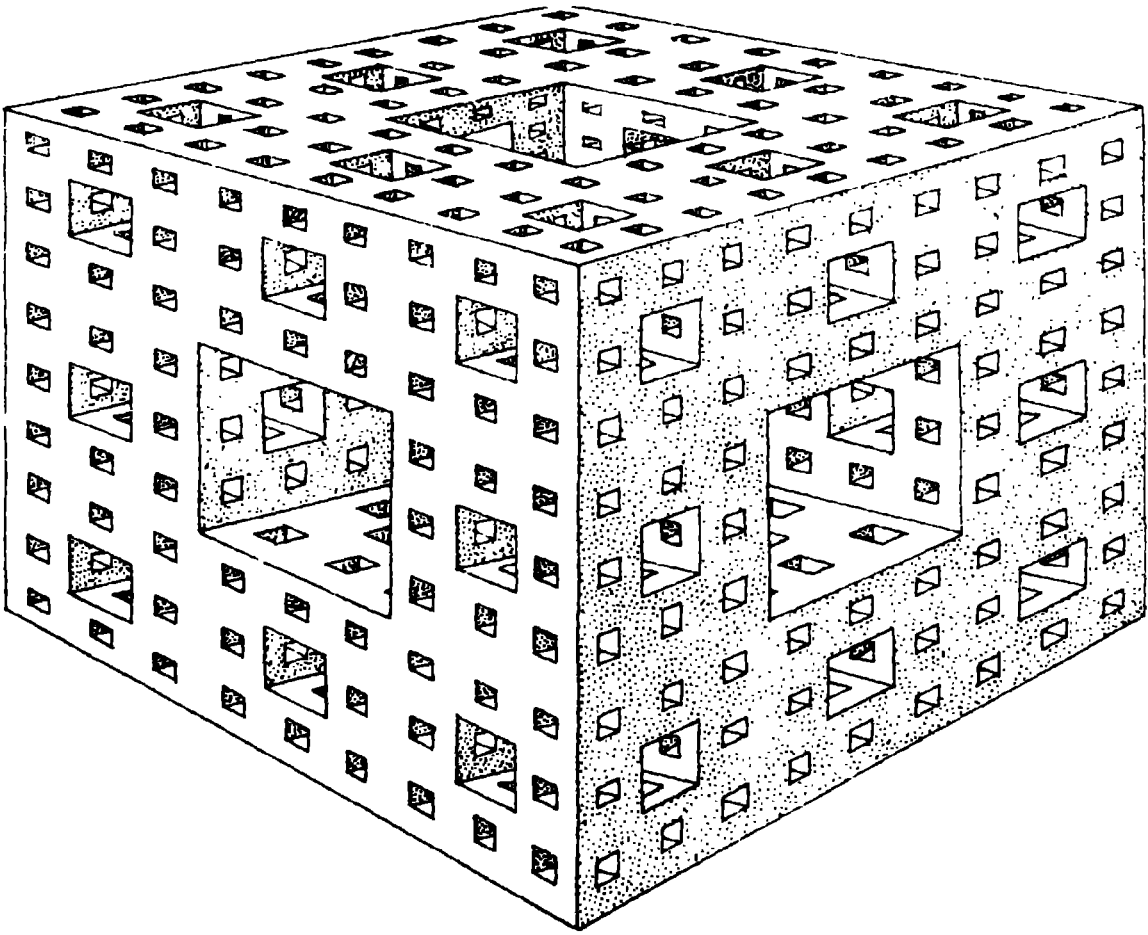
চিত্র 10·3 মেঞ্জার স্পঞ্জ তৈরি হওয়ার পথে—এখানে অসীম বিস্তৃতির তল দিয়ে শূন্য আয়তন বেষ্টিত; ফ্র্যাকটাল মাত্রা 2·73।

এই সব সৃষ্টিছাড়া জিনিসপত্র কি আদৌ কোন কাজে লাগে? উত্তরটা হ'ল 'হ্যাঁ'। মানুষের সংস্কৃতিতে নতুন ধারণাগুলো অনেক সময়েই আগে থাকতে তৈরি হয়ে থাকে — পরে তাদের কেউ কাজে লাগায়। একটা স্তম্ভের শক্তি তার নিরেট গোড়ার বিস্তৃতি থেকে না এসে শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত আকৃতি থেকেও আসতে পারে — এই ধারণাটার বাস্তব প্রয়োগ ঘটে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারে। ঐ টাওয়ারের

আকৃতি অবিকল ত্রিমাত্রিক সিয়েরপিন্স্কি গ্যাস্কেটের মত নয় ঠিকই কিন্তু দুটোতে মিল আছে। বহু ছিদ্রযুক্ত মাধ্যম দিয়ে তরল বা গ্যাসের প্রবাহের মডেল নির্মাণের কাজে সিয়েরপিন্স্কি গ্যাস্কেট ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতির একটা অদ্ভুত রহস্য হ'ল এই যে শুধুমাত্র মননের আনন্দে তৈরি করা শুদ্ধ এবং বিমূর্ত গণিতের অনেক ধারণা পরে অনেক সময়েই একেবারে মাটি ঘেঁষা, বাস্তব সমস্যার সমাধানে কাজে লেগে যায়। বিশুদ্ধ গণিত যে কি করে এবং কেন বাস্তব জগতে এতটা খেটে যায় তা নিয়ে বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী উইগনার অনেক ভাবনা চিন্তা করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে এর পিছনে সত্যিই কোন যুক্তি নেই। এরকম না'ই হ'তে পারত। তবু কেন গণিত বাস্তবের এত উপযোগী তার উত্তর কেউ জানে না।

নির্দেশিকার 8 এবং 18 নং পুস্তক দ্রষ্টব্য।

এগার

পাটিগাণিতিক ধূলিকণা এবং শয়তানের সিঁড়ি

ধুলোর ঝড়ের মত অঙ্কও মাঝে মাঝে আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে। সংখ্যাতত্ত্ব এমন জটিল হয়ে পড়ে যে তাকে ভেদ করে আমাদের মত সাধারণ মানুষ কিছু দেখতেই পায় না। গণিতজ্ঞদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। সেই সংখ্যাটাকে মনে পড়ে —সেই 1729? বিখ্যাত ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ জি. এইচ. হার্ডির কাছেও এটাকে একটা 'ধোঁয়াটে' সংখ্যা বলে মনে হয়েছিল, যার কোন গুণই নেই—কিন্তু তাঁর ছাত্র ও সহকর্মী রামানুজন অলোকসামান্য অন্তর্দৃষ্টিতে সেই আবরণ ভেদ করে দেখালেন যে ঐ সংখ্যাটিরও একটি আশ্চর্য ধর্ম আছে—দুটো সংখ্যার ঘনফলের সমষ্টি হিসেবে দুরকমভাবে যত সংখ্যাকে প্রকাশ করা যায় তাদের মধ্যে 1729 ন্যূনতম, $1729 = 12^3 + 1^3 = 10^3 + 9^3$।

ঊনবিংশ শতকের আরেকজন বিশাল মাপের গণিতজ্ঞ জর্জ ক্যান্টর। তিনি সেট থিওরীর জন্মদাতা। আধুনিক গণিতের ভাষাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এই থিয়োরী, আর আজকাল এমনকি কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চাদেরও এটা শেখানোর চেষ্টা চলেছে। 'অসীম'-এর মত একটা ধোঁয়াটে এবং দুর্নিরীক্ষ্য বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন ক্যান্টর। সমস্ত পূর্ণসংখ্যা নিয়ে তৈরি যে সেট তার মাপ অসীম। আবার তার এক উপসেট (Subset) সমস্ত জোড় সংখ্যার সেট—সেটাও অসীম। তাহলে কি প্রথম অসীমটা দ্বিতীয়ের চেয়ে বড়? ক্যান্টরের উত্তর—না, দুটোই তুল্যমূল্য। আর সমস্ত বাস্তব সংখ্যার (Real Numbers) যে অসীম সেট সেটাও কি এদেরই মত? ক্যান্টর দেখালেন যে তা নয়—এই দ্বিতীয় ধরনের অসীমতা প্রথমটার মত নয়। তিনি এও বললেন যে অসীম সেট কেবল ঐ দুই রকমেরই হয়। পূর্ণসংখ্যার অসীম সেটের মত যার সদস্যদের গোনা যায়, আর বাস্তব সংখ্যার অসীম সেটের মত যার সদস্যদের গোনা যায় না। এছাড়া অন্যরকমের কোন অসীম সেট সম্ভব নয়। এটাই ক্যান্টরের বিখ্যাত হাইপোথিসিস্। গাণিতিক উপায়ে একে প্রমাণ করা যাচ্ছিল না কিছুতেই। শেষ অবধি গণিতজ্ঞরা বের করলেন যে ঐ প্রতিপাদ্যটি সত্য না মিথ্যা

সেটা প্রমাণ করাই অসম্ভব! ফলে তা নিয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ হ'ল।

অসীম নিয়ে ক্যান্টরের গবেষণা এতই বিমূর্ত এবং দুরূহ ছিল যে সমসাময়িক অনেকেই এটাকে পাগলামি বলে ভাবতেন। কিন্তু ক্যান্টর তাঁর কাজ চালিয়ে যান। ওঁর তৈরি করা একটা বিশেষ ধরনের অসীম সেট প্রায় একশো বছর পরে ফ্রাকটাল নিয়ে গবেষণার কাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল।

ক্যান্টরের সেই অসীম সেট কিন্তু তৈরি করা খুব সহজ। একটা একক দৈর্ঘ্যের সরলরেখা নিয়ে সেটাকে সমান তিনভাগে ভাগ করা হ'ল। এবার মাঝের ভাগটা মুছে দেওয়া হ'ল। বাকি দুটো অংশকেও ঠিক একইভাবে তিনভাগে বিভক্ত করে মাঝের অংশগুলো মুছে দেওয়া হ'ল। এইভাবে অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তির পর যা পাওয়া যাবে সেটা আর কোন সরলরেখার টুক্‌রো নয়—কিছু বিন্দুর সমষ্টি। (সরলরেখার কোন অংশ অবশিষ্ট থাকলে সেটাকে ভেঙে ভেঙেও শেষ অবধি ঐ বিন্দুসমষ্টি পাওয়া যাবে।) বিন্দুগুলো সেই প্রথমে নেওয়া সরলরেখার ওপরেই অবস্থান করবে কিন্তু তাদের বণ্টনটা সুষম হবে না—তাদের মধ্যেকার ফাঁকগুলো অসম হবে, যদিও সংখ্যায় তারা হবে অসীম। এই বিচ্ছিন্ন, অসীম সংখ্যক বিন্দু-সমষ্টির নাম দেওয়া হয়েছে পাটিগাণিতিক ধুলো। ধূলিকণার সঙ্গে বিন্দুর তুলনাটা বেশ লাগসই।

ধূলি-সদৃশ এই সংখ্যাদের ধর্ম খুব অদ্ভুত। বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এদের গোনা যায় না অর্থাৎ সেই দিক দিয়ে এরা বাস্তব সংখ্যার অসীম সেটের মত—যা গোনা সম্ভব নয়। আবার, ঐ ছাড়া-ছাড়া বিচ্ছিন্নতার জন্যই বিন্দু-সমষ্টির মোট দৈর্ঘ্যের সীমাস্থমান শূন্য। এদিক দিয়ে এর মিল পূর্ণসংখ্যার অসীম সেটের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় আরও একটা ধর্ম এর আছে—সমস্ত স্কেলেই এটা স্ব-সদৃশ। 11·1 নং চিত্রের তৃতীয় ধাপের ছবিটার বাম দিকের অংশটি লক্ষ করে দেখলে দেখা যাবে যে সেটা দ্বিতীয় ধাপের পুরো ছবিটার মতই দেখতে। পরবর্তী সবকটি ধাপের ক্ষেত্রেই কথাটা প্রযোজ্য। স্ব-সাদৃশের কথা উঠলেই মাত্রার কথাও উঠে পড়ে। এই ধূলিকণার মাত্রা কত?

তার জন্য দেখতে হবে সরলরেখার টুক্‌রোগুলোর দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তাদের সংখ্যা কিভাবে বদলায়। প্রত্যেক ধাপে রেখার টুক্‌রোগুলোর দৈর্ঘ্য এক-তৃতীয়াংশ হয়ে যায়, তাদের সংখ্যা হয় দ্বিগুণ। ফলে ধূলিকণার মাত্রা হিসেবে আমরা পাচ্ছি—

$$\frac{\log 2}{\log 3} = 0{\cdot}63 \text{ (প্রায়)।}$$

ক্যান্টরের সেট, তারমানে, একটা ফ্র্যাকটাল; পূর্ণসংখ্যার সেটের মত এর মাত্রা শূন্যও নয় আবার বাস্তবসংখ্যার নিরবচ্ছিন্ন সেটের মত এর মাত্রা একও নয়। এর মাত্রা এ দুইয়ের মাঝামাঝি।
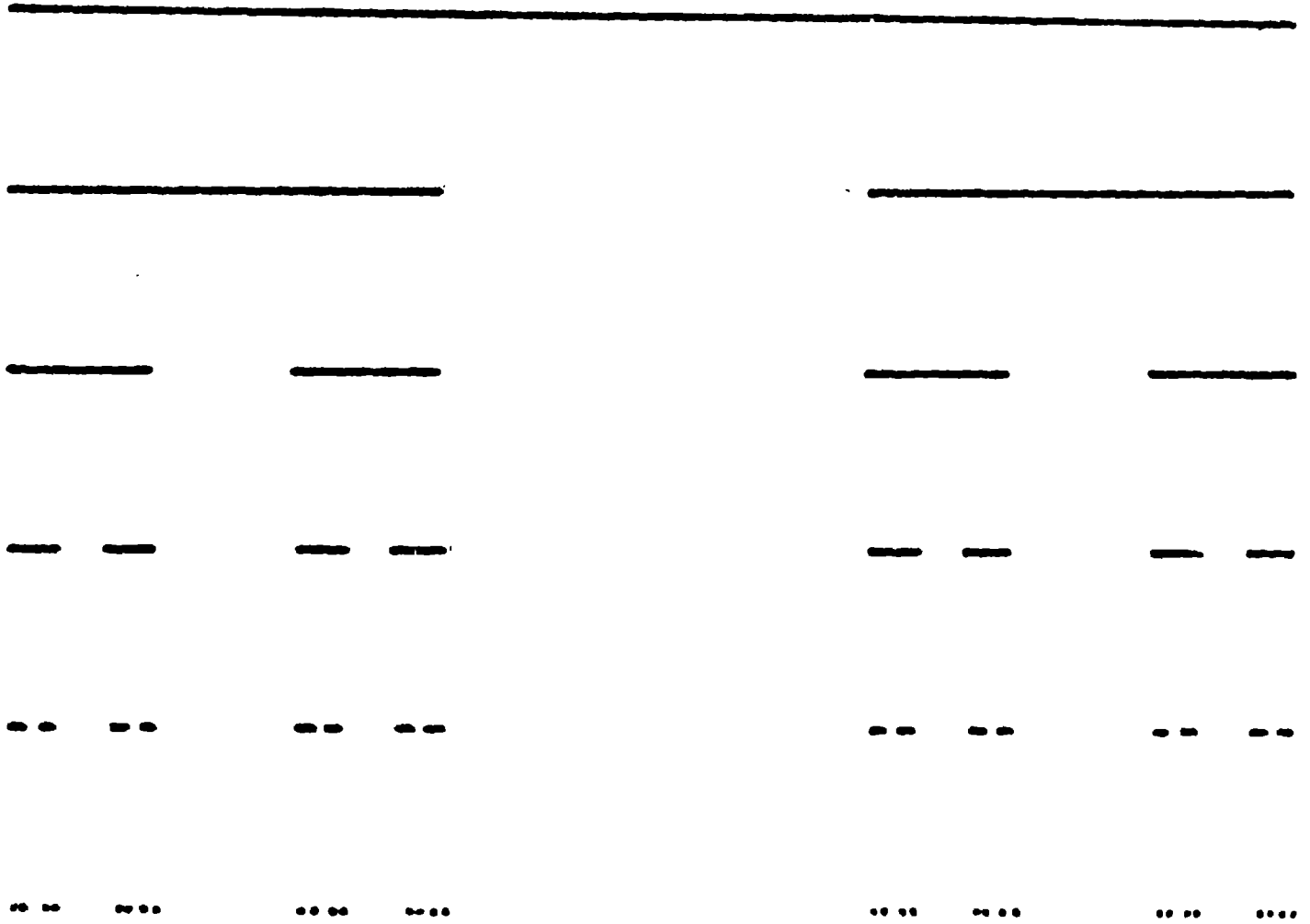
চিত্র 11·1 একটি সরলরেখাকে ভেঙে স্ব-সদৃশ 'পাটিগাণিতিক ধূলি' সৃষ্টি।

কিন্তু এই অদ্ভুত জিনিসটার অস্তিত্ব শুধু গণিতের কল্পনার রাজ্যে—এরকম ভাবলে খুব ভুল হবে। বাস্তব জগতেও একাধিকক্ষেত্রে এর দেখা মেলে। খুব অপ্রত্যাশিত জায়গায় এর দেখা পান ম্যান্ডেলব্রট। একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী টেলিফোন লাইনের বার্তায় যে ত্রুটি বা ভ্রান্তি ঢুকে পড়ে তার মধ্যে এর দেখা মিলল। যতরকম উৎস থেকে নিয়মিতভাবে ত্রুটির উৎপত্তি হতে পারে তার সব কটিকে বাদ দেওয়ার পরও ইঞ্জিনিয়াররা দেখলেন যে কিছু ত্রুটি থেকেই যাচ্ছে—আপাতভাবে যাদের এলোমেলো বলে মনে হচ্ছে। তাদের মধ্যে কোনরকম শৃঙ্খলা বা পর্যাবৃত্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ হঠাৎ এককেটা ধাক্কায় তারা আসে; মাঝের ফাঁকগুলো বিরতি—যখন কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। প্রথাগত চিন্তায় অভ্যস্ত ইঞ্জিনিয়াররা ভাবলেন যে এগুলো পুরোপুরি এলোমেলো নড়াচড়া—এর পেছনে যে সম্পূর্ণ অন্যধরনের একটা নকশা লুকোনো থাকতে পারে তা তাঁরা আদৌ ভাবেননি। ম্যান্ডেলব্রট ঐ আপাত শৃঙ্খলাহীন ত্রুটিগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে তারা সময়ের সাপেক্ষে স্ব-সদৃশ। অর্থাৎ 30 মিনিটব্যাপী কালপর্যায়ে ত্রুটিগুলোর যা ধাঁচ হবে, দশ মিনিট ব্যাপী সময়কালে তাদের ধাঁচটা তাই-ই হবে শুধু সময়ের ক্ষুদ্রতর একক নিতে হবে—তিন মিনিটের

কালপর্যায়েও সেই ধাঁচটাই ফিরে পাওয়া যাবে। সময়ের বড় স্কেলে ত্রুটিহীন কালপর্যায়ের আগে পরে যে ত্রুটিপূর্ণ পর্যায় পাওয়া যায় তাদের খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাদের মধ্যেও ছোট স্কেলে দুটি করে ত্রুটিপূর্ণ অঞ্চলের মাঝে একটি ত্রুটিমুক্ত অঞ্চল রয়ে গেছে। অর্থাৎ এ হ'ল সময়ের সাপেক্ষে পাটিগাণিতিক ধূলিকণা। ত্রুটিগুলোর এই চরিত্র বুঝতে পারার পর ইঞ্জিনিয়াররা এটা দূর করার একটা নতুন উপায় বার করলেন। বার্তাকে আরও জোরালো করার বদলে ওঁরা অন্য রাস্তা নিলেন—একই কথা দুবার করে বলার ব্যবস্থা করলেন—যেটা কথোপকথনের সময় দুই ব্যক্তি ভুল এড়ানোর জন্য প্রায়শই করে থাকেন।

মূল ক্যান্টর-সেট অন্য কিছু সেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অদ্ভুত দর্শন আকৃতির সৃষ্টি করতে পারে। এর এক সুপরিচিত উদাহরণ হ'ল "শয়তানের সিঁড়ি"। কোন ক্যান্টর সেটের প্রারম্ভ-বিন্দু থেকে একটি প্রদত্ত বিন্দুর দূরত্বকে x-অক্ষ বরাবর এবং ঐ প্রদত্ত বিন্দু অবধি যে সরলরেখার টুক্‌রোগুলো রয়েছে তাদের মোট দৈর্ঘ্যকে y-অক্ষ বরাবর প্লট করলে যে রেখাচিত্র পাওয়া যায় তাকেই শয়তানের সিঁড়ি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 11.2 চিত্রের (a) অংশের প্রথমবার আবৃত্তির ফল দেখা যাচ্ছে। x-এর মান 0 থেকে $^1/_3$-এ গেলে y-এর মান o থেকে $^1/_2$-এ যায়। x যখন $^1/_3$ থেকে $^2/_3$-এর মধ্যে তখন y অপরিবর্তিত থাকে সেই $^1/_2$-তে। শেষ অংশে যখন x-এর মান $^2/_3$ থেকে 1-এ যায় তখন y যায় $^1/_2$ থেকে 1-এ। এই পদ্ধতিতে অসংখ্যবার আবৃত্তির ফলে পাওয়া যায় শয়তানের সিঁড়ি।

ক্যান্টর সেটের আচরণের কতগুলো অদ্ভুত দিক রয়েছে। মনে রাখতে হবে এই সেট হ'ল একটা সরলরেখার ওপর অবস্থিত ছাড়া ছাড়া বিন্দুর সমষ্টি; রেখাটির প্রায় সর্বত্রই ফাঁক রয়েছে। তারমানে শয়তানের সিঁড়িতেও প্রায় সর্বত্রই রয়েছে অনুভূমিক ধাপ। খালি ক্যান্টর সেটের ধূলিকণার অবস্থান যেখানে সেখানে রয়েছে চড়াই, অত্যন্ত ছোট মাপের। তবু অসংখ্য, প্রায় অদৃশ্য ঐ ছোট ছোট ধাপ বেয়েই আমরা চলে যাচ্ছি 0 থেকে 1-এ। এইরকম বেয়ে ওঠার জন্যই যে সিঁড়িটা তৈরি তা অবশ্য নয়। নানান ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ রয়েছে। একাধিক কম্পনশীল 'অসিলেটর'-এর কম্পাঙ্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কাজে এর ব্যবহার আছে। যা কিছু পৌনঃপুনিক পর্যাবৃত্ত গতিতে চলে তাকেই পদার্থবিজ্ঞানে অসিলেটর বলা হয়। পেন্ডুলাম, খেলার মাঠের দোলনা, এ. সি. তড়িতের সাধারণ সার্কিট বা রেডিও-টিভির মধ্যেকার জটিল এ. সি. সার্কিট—সবই এই গোত্রভুক্ত। ক্ষেত্রবিশেষে দুটি অসিলেটরের কম্পাঙ্ক একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে বাঁধা পড়ে যায়। সেরকম ক্ষেত্রে সিঁড়ির চড়াইয়ের এবং অনুভূমিক অংশ যথাক্রমে, কম্পাঙ্কের পরিবর্তনশীল এবং স্থির অনুপাত নির্দেশ করে। এছাড়াও সম্ভাব্যতার তত্ত্বে (Theory of Probability) এর প্রয়োগ আছে।
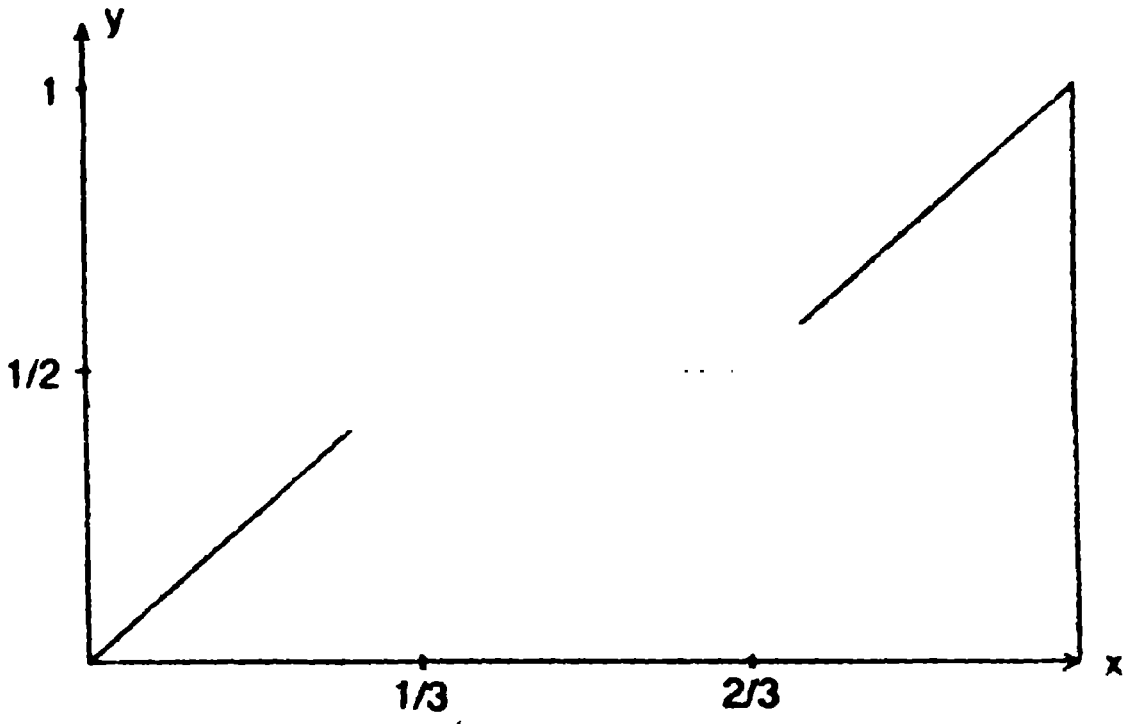
(a)
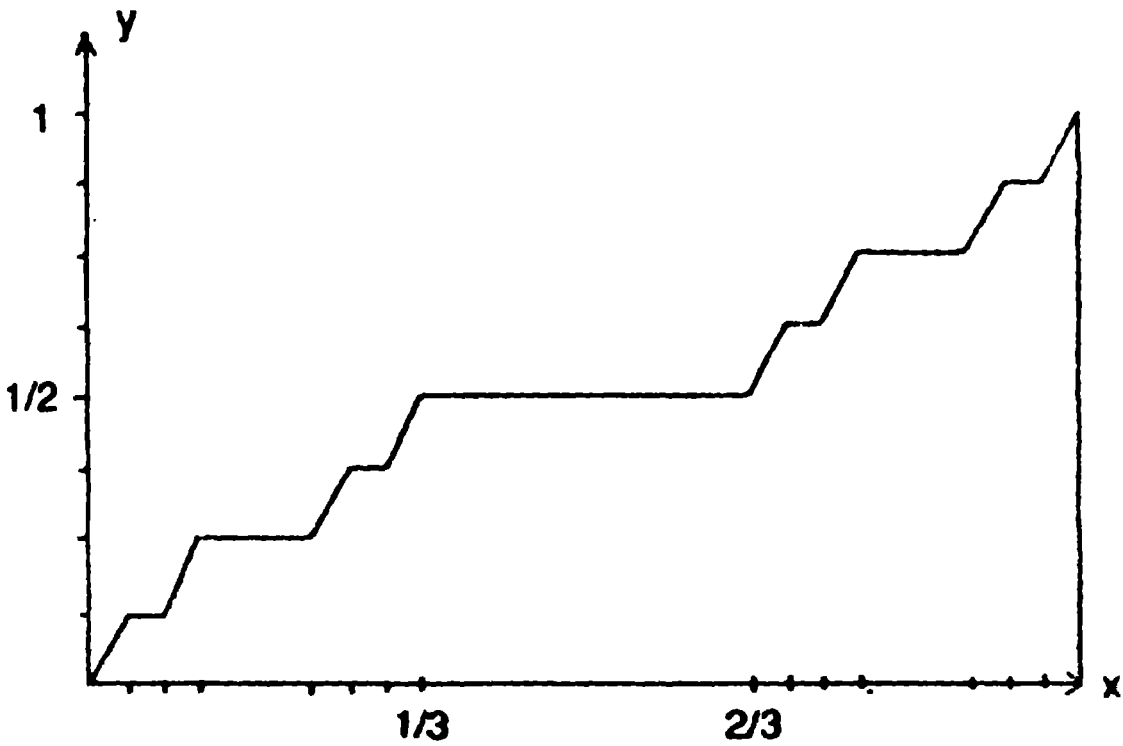
(b)

চিত্র 11·2 'শয়তানের সিঁড়ি' তৈরি : (a) প্রথম ধাপ, (b) তৃতীয় ধাপ।

বইয়ের প্রথম অংশে আমরা গতিবিজ্ঞানে বিশৃঙ্খলা বা কেয়সের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি—দ্বিতীয় অংশে ফ্র্যাকটাল জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা হ'ল। প্রশ্ন উঠতে পারে বিশৃঙ্খলা এবং ফ্র্যাকটালের মধ্যে সম্পর্ক কি? একই বইয়ে এদের নিয়ে আলোচনা থাকছে কেন? একটা গুণগত মিল সহজেই চোখে পড়ে—বস্তুর গতিতে বা জ্যামিতিক আকৃতিতে আপাত শৃঙ্খলাহীনতার তলায় যে এক ধরনের সহজ নিয়মানুগতা প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে তা কেয়স ও ফ্র্যাকটালের আলোচনায়

দেখা যায়। কিন্তু এ দুইয়ের মধ্যে এর চেয়েও গভীর এবং সূক্ষ্ম এক সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ক আবিষ্কার করতে গেলে আমাদের আলোচনায় একদম নতুন এক প্রসঙ্গ এসে পড়বে—বিজ্ঞানের অঙ্গনে এই নবীন আগন্তুকের নাম "অদ্ভুত আকর্ষক"।

নির্দেশিকার 18 এবং 8 নং পুস্তক দ্রষ্টব্য

বারো

অদ্ভুত আকর্ষক

প্রকৃতিতে অরৈখিকতা নানা রূপে সামনে আসে। কখনও সে দেবদূতের মত একটা বিস্ফোরক পরিস্থিতিকে সংযত করে তাকে সাম্যাবস্থায় নিয়ে আসে। কখন আবার বৃদ্ধি বা সংকোচনের হারকে সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দিয়ে সিস্টেমের বিপর্যয় ডেকে আনে। সেখানে তার ভূমিকা শয়তানের। কখন এর প্রভাবে সিস্টেম চক্রাকারে একই অবস্থার মধ্যে দিয়ে বার বার ঘুরতে থাকে। কখন বা সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলার।

জটিলতা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে বিভিন্ন হ'লেও অরৈখিক সিস্টেমগুলির মধ্যে একটা সাধারণ গুণ প্রায়শই লক্ষ করা যায়। যথেষ্ট সময় দিলে তাদের আচরণের এলোমেলো ভাব কেটে গিয়ে তা একটা সুস্থির, স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে। স্থায়ী অবস্থার (Steady State) সঙ্গে সাম্যাবস্থার (equilibrium) পার্থক্যটা খেয়াল রাখা দরকার। সাম্যাবস্থায় সমস্ত পরস্পরবিরোধী বল বা প্রভাব একে অন্যকে প্রশমিত করার ফলে সিস্টেম একটা অনড়, নিষ্ক্রিয় জায়গায় এসে পৌঁছয়। টেবিলের ওপরে পড়ে থাকা একটা বই এই জাতীয় সাম্যাবস্থার উদাহরণ যেখানে অভিকর্ষের টান এবং টেবিলের প্রতিক্রিয়া বল একে অন্যকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। অন্যদিকে বহিঃস্থ কোন পর্যাবৃত্ত বলদ্বারা পরিচালিত পেন্ডুলামের দোলন স্থায়ী অবস্থার উদাহরণ। এটা সাম্যাবস্থা নয়, পেন্ডুলামটি একটি নির্দিষ্ট বিস্তার এবং সুনির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক (যেটা বহিঃস্থ বলের পর্যায়ের সমান) নিয়ে আন্দোলিত হতে থাকে। সাম্যাবস্থায় সিস্টেম ফেজ স্পেসে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অধিকার করে থাকে। আর স্থায়ী অবস্থায় সেটি ফেজ্ স্পেসে একটি নির্দিষ্ট পথরেখা (trajectory) বরাবর ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে।

স্থায়ী অবস্থায় সিস্টেমের দুটি ধর্ম বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এর একটা হ'ল তার সুস্থিতি (Stability) বাইরের কোন কিছুর প্রভাবে সিস্টেম স্থায়ী অবস্থা থেকে সামান্য বিচ্যুত হ'লেও কিছু পরে যদি আবার বিচ্যুতি কাটিয়ে সেই স্থায়ী আচরণেই ফিরে আসতে সক্ষম হয় তাহলে তার অবস্থাকে সুস্থিত বলা হয়। দ্বিতীয় ধর্মটি

প্রথমটির সঙ্গে সম্পর্কিত—সেটা হ'ল এই যে স্থায়ী অবস্থায় পৌছনোর পর সিস্টেমের আর প্রাথমিক অবস্থার 'স্মৃতি' থাকে না। বিভিন্ন প্রাথমিক অবস্থা থেকে রওয়ানা হ'য়ে, ভিন্ন ভিন্ন পথে একই স্থায়ী অবস্থায় পৌছয় সিস্টেম। মধ্যবর্তী সময়ের যে অস্থিরতা তা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে যায়। ফেজ্ স্পেস ব্যাপারটা দেখলে মনে হবে স্থায়ী অবস্থার পথরেখা যেন তার আশপাশের সমস্ত পথরেখাগুলিকে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে। সেই জন্যই তাকে 'আকর্ষক' বলা হয়।

যদি একটার বেশি আকর্ষক থাকে তাহলে—ফেজ স্পেস একাধিক অঞ্চলে ভাগ হয়ে যায়। প্রত্যেক আকর্ষক তার জন্য—নির্দিষ্ট অঞ্চলের রেখাদের নিজের দিকে টেনে নেয়। এই আকর্ষক ফেজ স্পেসে সাম্যাবস্থার দ্যোতক একটি বিন্দু হ'তে পারে —বিভিন্ন প্রাথমিক অবস্থা থেকে এসে সিস্টেম ঐ সাম্যে পৌছয়। আবার ফেজ স্পেসের কোন নির্দিষ্ট পথরেখাও আকর্ষক হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রাথমিক অস্থিরতা কাটিয়ে সিস্টেম ঐ রেখা নির্দেশিত স্থায়ী অবস্থায় পৌছবে।
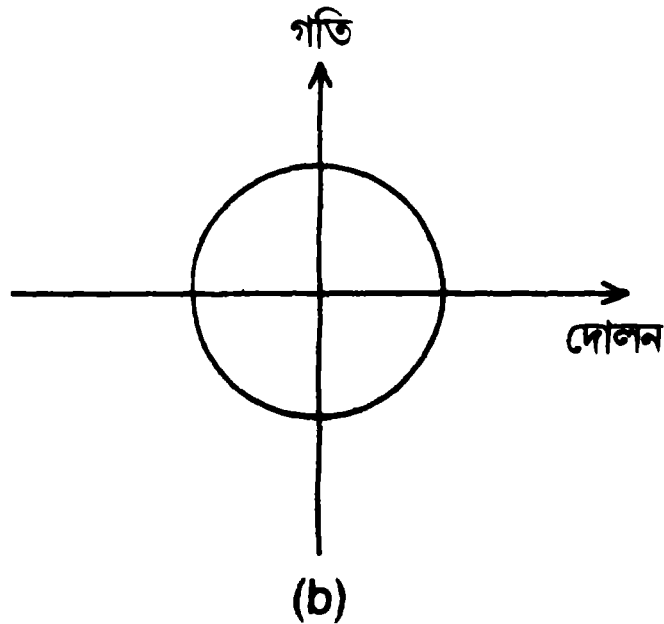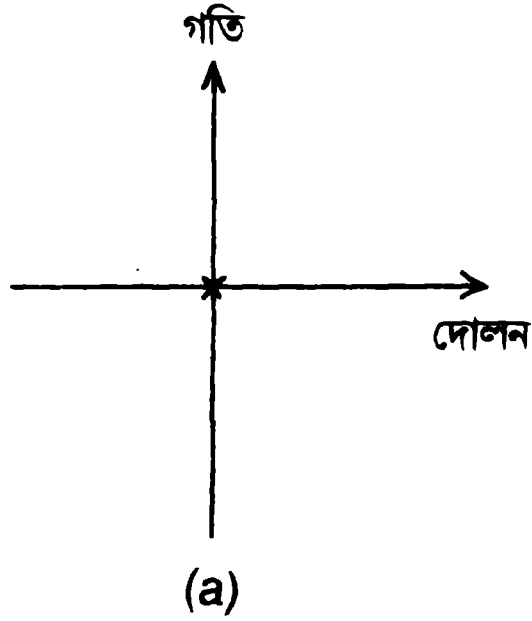
চিত্র 12·1 বাধাপ্রাপ্ত দোলকের আকর্ষক : (a) বহিঃস্থ বল দ্বারা চালিত নয় এমন দোলকের বিন্দু আকর্ষক; (b) বহিঃস্থ বল দ্বারা চালিত দোলকের পর্যাবৃত্ত আকর্ষক।

পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে এরকম আকর্ষকের সন্ধান আমরা এর মধ্যেই পেয়ে গেছি (অনুচ্ছেদ 3)। ঘর্ষণের বাধাপ্রাপ্ত এক দোলক, যে অবস্থাতেই তার দোলন শুরু করুক না কেন, শেষ অবধি উল্লম্ব অবস্থায় এসে স্থির হবে—এটা সবারই জানা। ফেজ্ স্পেসে এর পথরেখা স্পাইরালের আকারের যেটা পাক খেতে খেতে একটা বিন্দুতে এসে ঠেকে—এই বিন্দু হ'ল সেই মূলবিন্দু (origin) যেখানে সরণ এবং বেগ দুয়েরই মান শূন্য। ফেজ্ স্পেসের যে বিন্দুতেই দোলকের যাত্রা শুরু হোক না কেন তা শেষ হয় মূলবিন্দুতে এসে। দোলকটি অরৈখিক বা রৈখিক যাই হোক না কেন বাধাপ্রাপ্ত হ'লেই তার আকর্ষক হবে মূলবিন্দু। অন্যদিকে আমরা এও জানি যে বাইরের .বলদ্বারা পরিচালিত রৈখিক দোলক শেষ অবধি একটা স্থায়ী পর্যাবৃত্ত দোলন লাভ করে। ফেজ্ স্পেসে তার স্থায়ী পথরেখা বদ্ধ 'লুপ' এর আকারের হয় —যাতে তার প্রাথমিক বিচলনের কোন স্মৃতিই অঙ্কিত থাকে না। শুরুতে ঐ জাতীয় দোলকের পথরেখা যেখান থেকেই উদ্ভূত হোক না কেন তা শেষ হবে ঐ বদ্ধ 'লুপ'-এ এসে। ঐরকম বদ্ধ লুপের আকারের পর্যাবৃত্ত-গতিযুক্ত আকর্ষককে 'লিমিট সাইক্‌ল্' (Limit Cycle) বলা হয়।

শুধু যে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এরকম পর্যাবৃত্ত চক্রের দিকে আকর্ষণ দেখা যায় তা নয় বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও অরৈখিকতার এইজাতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আমাদের প্রত্যেকের জৈবিক আচরণের মধ্যেও এই জাতীয় চক্র লুকিয়ে আছে—মাঝে মধ্যে ব্যাহত হলেও আমাদের আচরণ আবার ঐ স্বাভাবিক চক্রেই ফিরে আসে। যেমন, সকলেরই নিদ্রা-জাগরণের এক 24 ঘণ্টা-ব্যাপী চক্র আছে। দুশ্চিন্তা বা অতিরিক্ত কাজের চাপে তাতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে—কিন্তু সেই বাধা অপসারিত হলেই আমাদের শারীরিক ক্রিয়া আবার সেই 'আকর্ষক' চক্রেই ফিরে আসে। এই জাতীয় চক্র জীবনকে ছন্দোবদ্ধ এবং অর্থময় করে তোলে।

শুধু শারীরিক ক্রিয়ায় নয়—সামাজিক আচরণেও এই ধরনের চক্রের উপস্থিতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ফ্যাশনের উল্লেখ করা যেতে পারে। দু-এক প্রজন্ম পর পর একই ফ্যাশন ফিরে ফিরে আসে। কেন? মনে হ'তে পারে সমাজ বার বার অতীতে ফিরে যেতে চাইছে। কিন্তু এ বিষয়ের কোন কোন গাণিতিক মডেলে দেখানো হয়েছে যে এক ফ্যাশন থেকে অন্য ফ্যাশনে জনসংখ্যার স্থানান্তর যে সমীকরণ নিয়ন্ত্রণ করে তার অরৈখিকতার জন্যই এরকম ঘটে থাকে।

ধরা যাক একটা সমাজে তিনরকম ফ্যাশন মহিলাদের মধ্যে চালু আছে—উঁচু, মাঝারি এবং নীচু। সত্যি সত্যি কিরকম সাজ বা কেশবিন্যাস এই প্রত্যেক রকমের সঙ্গে জোড়া তা আমাদের আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক—খালি ফ্যাশনের স্তরগুলো সম্বন্ধে নিম্নোক্ত নিয়মগুলো প্রয়োজনীয়। এর প্রথম নিয়মটাকে বলা যায় প্রগতির নিয়ম—ফ্যাশনে কোন মেয়ে হয় মায়ের চেয়ে একস্তর এগিয়ে যাবে অথবা অন্তত

মায়ের স্তরেই থেকে যাবে। অর্থাৎ মা যদি মাঝারি ফ্যাশন-স্তরের হন তাহলে তাঁর মেয়ে হয় উঁচু অথবা মাঝারি স্তরের হবেন, নীচু স্তরের কখনোই নয়। দ্বিতীয় নিয়ম হ'ল এই যে বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের সন্তানের জন্ম দেওয়ার হার সমান নয়। নিম্নতম স্তরে এই হার সবচেয়ে বেশি—উচ্চতম স্তরে সবচেয়ে কম।

এইরকম একটা সহজ মডেলের আচরণও খুব আগ্রহোদ্দীপক। যদি সম্পর্কগুলো রৈখিক হয় অর্থাৎ যদি প্রতি প্রজন্মে মেয়েদের একটা সুনির্দিষ্ট অংশ এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উন্নীত হয় তাহলে দেখা যায় যে যথেষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে সমাজটি একটি সাম্যাবস্থায় পৌছয় যখন প্রত্যেক স্তরে মহিলাদের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। এই সিস্টেমের ফেজ স্পেসে দ্বি-মাত্রিক কারণ দুটো মাত্র অনুপাত দিয়েই ফ্যাশনের তিনটে স্তরে কতজন করে মহিলা আছেন তা প্রকাশ করা সম্ভব—তৃতীয় অনুপাতটিকে অন্য দুই অনুপাতের মান থেকে বের করা যাবে কেননা তিনটে অনুপাতের যোগফল 1। ফেজ্ স্পেসে এই রৈখিক মডেলের আকর্ষক একটি বিন্দু। প্রাথমিক অবস্থা যাই হোক না কেন সমাজ ঐ বিন্দুতে এসে পৌছয় শেষ অবধি। বিন্দুটির অবস্থান কোথায় হবে নির্ভর করবে মহিলাদের কত অংশ অন্যস্তরে যাচ্ছে এবং জন্মহারের তুলনামূলক বিভেদ কত তার ওপর। কিন্তু এরকম রৈখিক মডেল বাস্তবানুগ নয়। ফ্যাশনের একটা লক্ষণই হ'ল এই যে যারা বেশি ফ্যাশন-দুরস্ত তাদেরকে অন্যেরা নকল করার চেষ্টা করে। তাই নিম্নতর স্তর থেকে যে অংশ উচ্চতর স্তরে যায় তা ধ্রুবক থাকতে পারে না—তার মান ওপরের স্তরের জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করবে। ফ্যাশন-দুরস্ত মহিলাদের সংখ্যা যত বেশি হবে নীচের দিকে তাদের মত হওয়ার প্রবণতা তত জোরালো হবে। এই প্রবণতার ফলেই মডেলটা অরৈখিক হয়ে যাবে। এই ধরনের একটা অরৈখিক মডেলে ধরা হয় যে যেকোন স্তর থেকে একমাত্র তার ঠিক ওপরের স্তরে উন্নয়ন সম্ভব। অর্থাৎ মাঝারি থেকে উঁচুতে বা নীচু থেকে মাঝারি স্তরে উন্নয়ন হতে পারে কিন্তু নীচু থেকে এক লাফে উঁচুতে যাওয়ার উপায় নেই। এছাড়া নিম্নতর স্তর থেকে কত অংশ উচ্চতর স্তরে যাবে তাও নির্ভর করবে উচ্চতর স্তরে জনসংখ্যার কত অংশ আছে তার ওপর। এইসব শর্ত আরোপ করার ফলে মডেলটি যে শুধু বাস্তবের কাছাকাছি আসে তাই নয় এর গাণিতিক বিশ্লেষণ সহজসাধ্য হয়। যে কেউ একটা ছোট কম্পিউটারের সাহায্যে এই গণনা করে দেখতে পারে।

গণনার ফলাফল খুব আশ্চর্যজনক। এমনিতে ভাবলে মনে হতেই পারে যে ক্রমাগত ওপরের দিকে যাওয়ার প্রবণতার ফলে শেষ অবধি এমন একটা সময় আসবে যখন সমস্ত মহিলারাই ফ্যাশনের উঁচু স্তরে পৌছে যাবে। কিন্তু তা হয় না। সমাজে জনসংখ্যার দুটো বিপরীতমুখী প্রবণতা রয়েছে। উচ্চ-ফ্যাশন অনুকরণের জন্য উর্ধ্বমুখী প্রবণতা আর নীচের দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ায়
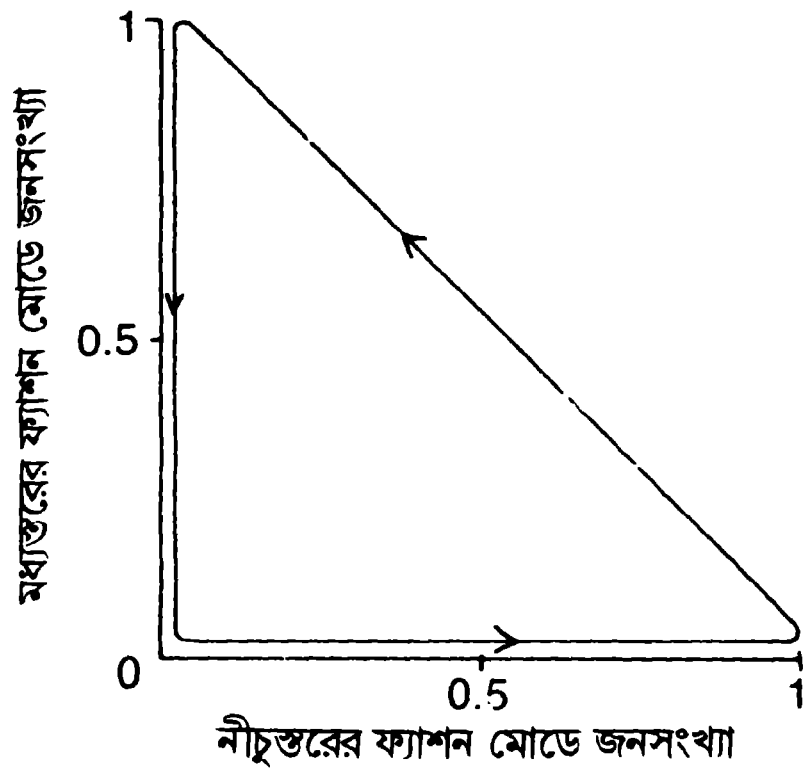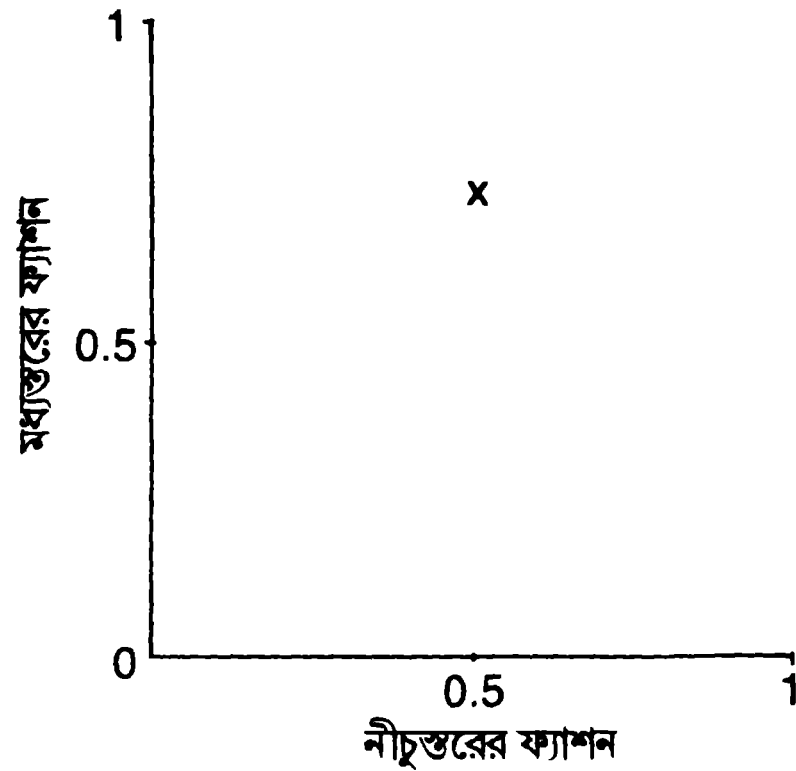
চিত্র 12·2 ফ্যাশন সংক্রান্ত মডেলে আকর্ষক : (a) রৈখিক মডেলে ফ্যাশনের তিন স্তরে মহিলাদের সংখ্যা সাম্য মানে পৌঁছয় (বিন্দু আকর্ষক)। (b) অরৈখিক মডেলে পরিবর্তন স্থায়ীভাবে চক্রাকারে ঘটতেই থাকে (পর্যাবৃত্ত আকর্ষক)।

নিম্নমুখী প্রবণতা। অরৈখিকতার ফলে এই দুই প্রবণতা কখনই পরস্পরকে প্রশমিত করে সাম্যাবস্থায় পৌঁছয় না। তার বদলে সমাজ নীচু-মাঝারি-উঁচু-নীচু এইরকম এক

অন্তহীন চক্রে বাঁধা পড়ে যায়। অন্যভাবে বললে—অরৈখিক ফ্যাশন মডেলের ফেজ্ স্পেসে একটি পর্যাবৃত্ত আকর্ষক রয়েছে। বিভিন্ন স্তরের প্রাথমিক জনসংখ্যা যাই হোক না কেন শেষ অবধি সমাজ এই চক্রেই উপনীত হবে।

এটা বলাই বাহুল্য যে "ফ্যাশন" এখানে একটা এমন শব্দ যার জায়গায় আমরা অন্য-কোন গুণবাচক শব্দও বসিয়ে দিতে পারি—সেই গুণ যদি উপরোক্ত শর্ত দুটি মেনে চলে তাহলেই হ'ল—সেক্ষেত্রে সিস্টেমের আচরণ অভিন্ন হবে। যেমন ফ্যাশনের জায়গায় আমরা সাক্ষরতা নিতে পারি—এটা ধরে নিয়ে যে সাক্ষরতা বা শিক্ষার মাত্রা বাড়ানোর প্রবণতা তার বর্তমান স্তরের ওপর নির্ভর করে। ওপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে উদাহরণটা পদার্থবিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব বা সমাজবিজ্ঞান যেখান থেকেই নেওয়া হোক না কেন অরৈখিক মডেলে 'আকর্ষক'-এর উপস্থিতি থাকে—বিবর্তনের ইতিহাস ভুলে গিয়ে সিস্টেম শেষ অবধি তাতেই উপনীত হয়।

অরৈখিক বিজ্ঞানে বিন্দু আকর্ষক বা পর্যাবৃত্ত আকর্ষকের কথা কেয়স আবিষ্কারের আগেই জানা ছিল। এদের নিয়ে পোঁয়াকারের (Poincare) মত বিজ্ঞানীরা মৌলিক কাজকর্ম করেছিলেন—সুসংবদ্ধ উপপাদ্যও প্রমাণিত হয়েছিল অনেকগুলি। যখন কেয়স বা বিশৃঙ্খলার কথা জানা গেল তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠল যে বিশৃঙ্খলা সিস্টেমের ফেজ স্পেসে কি আকর্ষক দেখতে পাওয়া যাবে? ঠিক এই ভাষায় না হলেও প্রশ্নটা সামনে এলো দু'জন বিজ্ঞানীর (Davis Ruelle এবং Floris Taken) বিক্ষুব্ধ তরলের গতি সংক্রান্ত কাজকে কেন্দ্র করে 1971 সনে। উত্তর পাওয়া গেল হ্যাঁ, বিশৃঙ্খল গতির ক্ষেত্রে আকর্ষক আছে কিন্তু তার চরিত্র পরিচিত অন্য কোন আকর্ষকের মত নয়। ফেজ স্পেসে তাদের রূপ জটিল, অদ্ভুত এবং দুর্নিরীক্ষ্য। এদের নাম দেওয়া হ'ল "অদ্ভুত আকর্ষক"।

বিশৃঙ্খল গতির মূল ধর্মগুলো ফেজ স্পেসের ঐ অদ্ভুত আকৃতির মধ্যেও প্রতিফলিত হওয়া চাই। এই ধর্মগুলোর মধ্যে প্রথম হ'ল এই যে প্রাথমিক অবস্থার সামান্যতম হেরফের ঘটলেই অন্তিম ফল অনেকটা বদলে যায়, ফলে ফেজ্ স্পেসে খুব কাছাকাছি থাকা দুটো বিন্দুর বিবর্তন রেখা ক্রমশ পরস্পরের থেকে দূরে সরে যায়। দ্বিতীয়ত—বিশৃঙ্খল গতি কখনই পর্যাবৃত্ত হতে পারে না, ফলে পর্যাবৃত্ত আকর্ষকের উপস্থিতি এক্ষেত্রে মোটেই সম্ভব নয়। কিন্তু বিশৃঙ্খল গতি প্রায়—পর্যাবৃত্ত হতে পারে। পৃথিবীর ঋতুচক্র ঠিক ঠিক পর্যাবৃত্ত নয় নিশ্চয়ই—কিন্তু প্রায় একইরকম পর্যায়ের পুনরাবৃত্তি বছরে বছরে ঘটে—নইলে ঋতু বা জলবায়ু কথাগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ত। তৃতীয়ত বিশৃঙ্খল গতি সীমাবদ্ধ। অস্থির জনসংখ্যা একটা সীমার মধ্যে থাকে। বহিঃস্থ বল দ্বারা পরিচালিত দোলকের বিশৃঙ্খল গতি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুমান করা সম্ভব নয় কিন্তু তার গতিবেগ এবং বিস্তার একটা সীমার

মধ্যেই থাকে। 'প্রজাপতি পাখা নাড়লে আবহাওয়া বদলে যায়' হয়ত—কিন্তু তা সত্ত্বেও আবহাওয়ার চাপ, তাপমাত্রা, আর্দ্রতার মত ভৌত রাশিগুলির মান সসীমই থাকে। এর অর্থ হ'ল এই যে ফেজ স্পেসে বিশৃঙ্খল গতির আকর্ষক একটা সীমাবদ্ধ অঞ্চল অধিকার করে থাকবে। আর সর্বশেষ ধর্মসমগ্র ফেজ স্পেসে কোথাও দুটো পথরেখা পরস্পরকে ছেদ করতে পারবে না—এই শর্তও পালিত হওয়া চাই নইলে একই প্রাথমিক অবস্থা থেকে দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন পথরেখা সৃষ্টির সম্ভাবনার উদ্ভব হবে। নিশ্চয়তাবাদী প্রাকৃতিক নিয়মে এরকম সম্ভাবনার স্থান নেই।

এতগুলো শর্ত একসঙ্গে পূরণ করা সহজ কথা নয়! ফেজ স্পেসে উদ্ভূত আকৃতিকে সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ থেকে অপর্যাবৃত্ত বা প্রায়-পর্যাবৃত্ত হ'তে হবে, সঙ্গে সঙ্গে পথরেখাগুলি একে অন্যকে ছেদ করতে পারবে না, আবার কাছাকাছি থাকা দুটো বিন্দুর পথ ক্রমশ পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাবে। দেখা গেছে যে এইসব শর্ত পূরণ করে এমন চিত্রও সম্ভব। স্টিফেন স্মেল যে ধরনের টপোলজিকাল রূপান্তরের কথা বলেছিলেন—টানা, সংকুচিত করা এবং ভাঁজ করা — সেই ধরনের রূপান্তর ফেস স্পেসে ঘটিয়েই ঐ চিত্র সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে প্রথমে পাশাপাশি থাকা বিন্দুগুলো পরস্পরের থেকে দূরে সরে যায় কিন্তু পুরো জিনিসটা সীমিত স্থানে আবদ্ধ থাকে। যে আকৃতির উদ্ভব ঘটে তা একটার ওপর আরেকটা সাজানো তলের স্তর-বিন্যাস—ভাঁজের পরে ভাঁজ—যা ত্রিমাত্রিক বস্তুর মত আয়তন অধিকার না করেও জায়গাটাকে ভালোভাবে ভরে দেয়। প্রথমতম অদ্ভুত আকর্ষকটি আবিষ্কার করেন লোরেঞ্জ—প্রবাহীর পরিচলনের মডেল নিয়ে কাজ করতে গিয়ে। লোরেঞ্জ আকর্ষকে পরস্পর সংলগ্ন দুটো শাখা আছে। তাদের প্রত্যেকটায় স্তরে স্তরে সাজানো লুপ রয়েছে যারা কখনো একে অপরকে ছেদ করে না। এক শাখা থেকে অন্য শাখায় যাওয়া মানে তরলের (বা গ্যাসের) আবর্তনের দিক উল্টে যাওয়া। প্রাথমিক অবস্থার ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও বৃহত্তর অর্থে এই আকর্ষক সুস্থিত। যে অবস্থা থেকেই শুরুটা হোক না কেন শেষ অবধি সিস্টেমের পথরেখা ফেজ স্পেসে অদ্ভুত আকর্ষকের আকারই পরিগ্রহণ করবে। আকর্ষকের ঠিক কোন জায়গায় এটা ঘটবে বিশৃঙ্খলার জন্য সেটা যথাযথ বলা যাবে না।

অসংখ্য স্তরে বিন্যস্ত পরস্পর সংলগ্ন অসীম সংখ্যক লুপ, সীমিত আয়তনে আবদ্ধ—বর্ণনাটা শুনলেই ফ্র্যাকটালের কথা মনে পড়ে। এ প্রসঙ্গে কখ্-রেখাকে স্মরণ করা যেতে পারে—অসংখ্যবার ওপর-নীচ করা খোঁচা আর কোণায় ভরা সেই বক্ররেখা যার দৈর্ঘ্য অসীম হলেও তলের একটা সীমাবদ্ধ অংশ জুড়েই তার অবস্থান। ঐ রেখার ফ্র্যাকটাল মাত্রা ছিল 1·26। দেখা গেছে যে লোরেঞ্জ আকর্ষকের মাত্রার মান 2 এবং 3-এর মধ্যবর্তী। আরও অনেক ফ্র্যাকটাল আকর্ষকের কথা
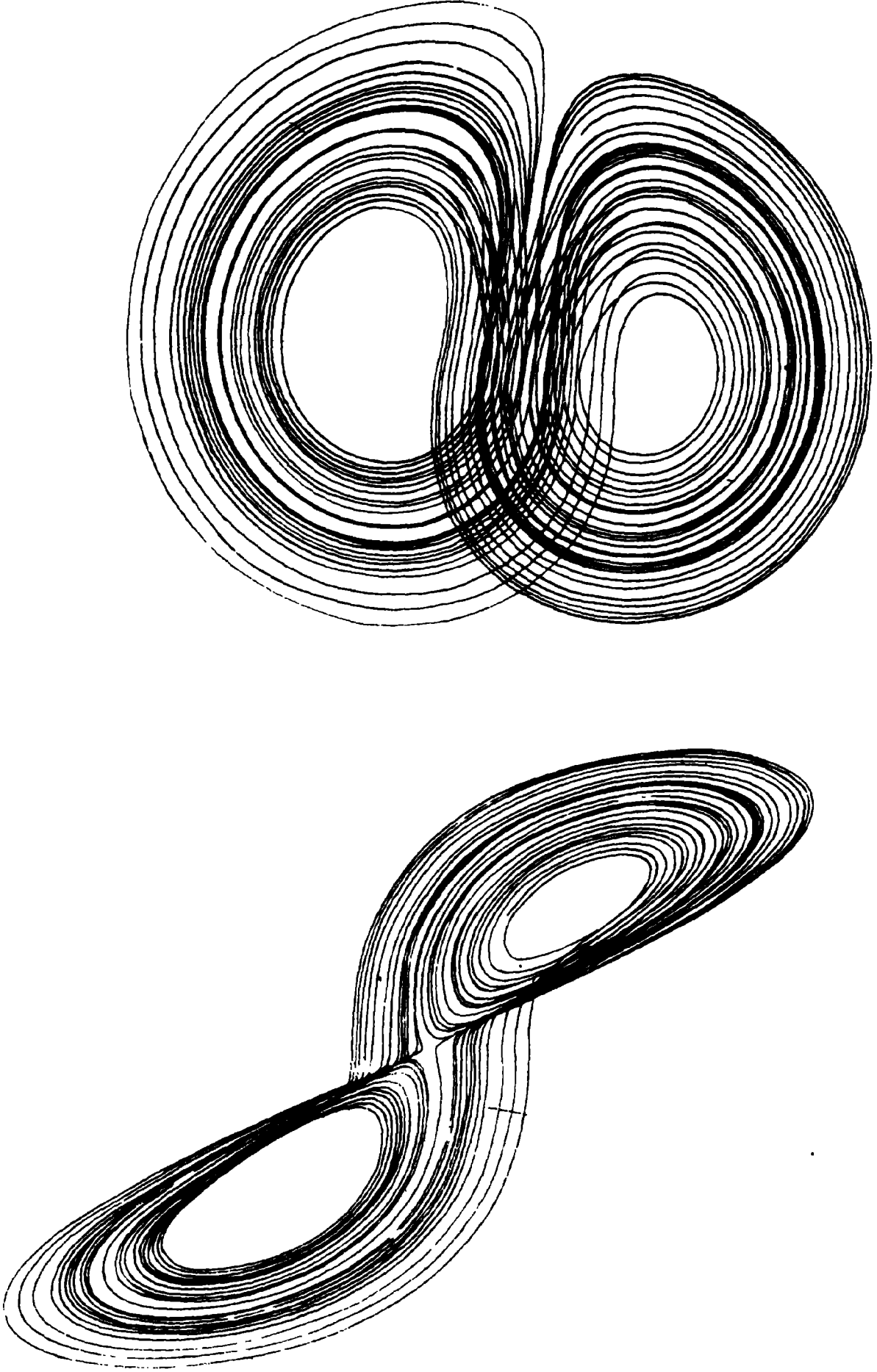
চিত্র 12·3 প্রবাহীর পরিচলন সংক্রান্ত লোরেঞ্জের মডেলে 'অদ্ভুত আকর্ষক'। চিত্রটি গুণবাচক— দুটি স্বতন্ত্র তলে প্রক্ষিপ্ত।

জানা গেছে। পূর্বে উল্লিখিত অরৈখিক দোলকের আকষকও ফেজ স্পেসে একটি ফ্র্যাকটাল তল।

দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত আকর্ষকের ধারণার মধ্যে দিয়ে বিশৃঙ্খলার গতিবিদ্যা এবং ফ্র্যাকটাল জ্যামিতির মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হচ্ছে। সাধারণ ত্রিমাত্রিক স্পেস বা দেশে বিশৃঙ্খল গতি ফ্র্যাকটাল নয়—সিস্টেমের ফেজ স্পেসে এর আকৃতি ফ্র্যাকটাল। বিশৃঙ্খলার ধারণার দুটো আপাতবিরোধী দিক একই সঙ্গে অদ্ভুত আকর্ষকের মধ্যে ধরা পড়েছে। স্থানীয় অর্থে (locally) বিশৃঙ্খল গতি অস্থায়ী কেননা প্রাথমিক অবস্থার সামান্য হেরফেরেও ওর বিশাল পরিবর্তন ঘটে যায়। অন্যদিকে সামগ্রিক অর্থে এই গতি সুস্থিত কেননা শেষ অবধি সব গতিই অদ্ভুত আকর্ষকের ওপর কোন না কোন বিন্দুতে গিয়ে মিলবে। তাই অদ্ভুত আকর্ষকের ধারণা বিজ্ঞানে স্থায়িত্বের (Stability) ধারণাকে আরও বিস্তৃত করেছে।

সবকিছুর পর একটা শেষ প্রশ্ন থেকে যায়। এই ধরনের আকর্ষকের উপস্থিতির বস্তুগত ব্যাখ্যা কি? জটিল, অরৈখিক সিস্টেমের আচরণে এইরকম একটা সরলীকৃত রূপ কেন দেখা যায়, কেন তাদের সবারই আচরণ শেষ অবধি একটা স্থায়ী ধাঁচে পড়ে যায়। এই প্রশ্নের কোন সাধারণ উত্তর জানা নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস আমরা লক্ষ করব। যে পেন্ডুলাম বাধাপ্রাপ্ত নয় তার কোন আকর্ষকও নেই। ঐরকম একটা রৈখিক দোলকের ফেজ স্পেসের পথরেখাগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের আকারের হয়ে থাকে। বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ভর করে দোলকের মোট শক্তির ওপর। যখন দোলনে বাধা সৃষ্টি করা হয় একমাত্র তখনই পথরেখাগুলি একটি বিন্দুর দিকে আকর্ষিত হয়। অর্থাৎ ঐ বাধা বিভিন্ন দোলকের আচরণে একটা সাধারণ ধাঁচ সৃষ্টি করে। বহিঃস্থ বল দ্বারা পরিচালিত দোলকের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। ঘর্ষণ বা সান্দ্রতা থেকে যে বাধার সৃষ্টি হয় সচরাচর তাকে অবাঞ্ছিত বলেই ধরা হয়—যেটা বাদ গেলে বা অন্তত কমাতে পারলেই ভালো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আবহাওয়া, বল-চালিত দোলক বা শারীরিক চক্রের মত অরৈখিক সিস্টেমে তার একটা গঠনমূলক ভূমিকাও রয়েছে। শক্তির অবক্ষয় ঘটালেও ঐ ধরনের বাধা আকস্মিক বিচ্যুতির ফলে অস্থিতিশীল হয়ে যাওয়ার হাত থেকে সিস্টেমকে রক্ষা করে—তাকে একটা স্থায়ী আচরণে সুস্থিত থাকতে বাধ্য করে। এই শক্তি-অবক্ষয়ী বাধার ফলেই অদ্ভুত আকর্ষক সুস্থিত। আশ্চর্য শোনালেও, প্রকৃতিতে অবক্ষয় শৃঙ্খলার জন্মদাতা।

ফ্যাশনের আলোচনা নির্দেশিকার 26 নং প্রবন্ধে আছে। অদ্ভুত আকর্ষকের আলোচনা রয়েছে 5, 8, 18 এবং 21 নং গ্রন্থে।

প্রকৃতিতে
বিশৃঙ্খলা এবং ফ্র্যাকটাল

তেরো

জলের কল, ফাটলের দাগ, দাবাগ্নির রেখা এবং হৃদয়ের কথা

যে কোন অনিয়মিত গতিকেই 'বিশৃঙ্খল' বলা যায় না, ঠিক যেমন যে কোন আঁকাবাঁকা রেখা বা উঁচুনীচু তলই ফ্র্যাকটাল নয়। যেখানে অরৈখিক সমীকরণটা জানা সেখানে রাশিগুলির গাণিতিক মানের কোন অঞ্চলে গিয়ে বিশৃঙ্খলা শুরু হবে তা বের করা সোজা। কিন্তু এর উল্টো কাজটা সহজ নয়। প্রদত্ত কোন অনিয়মিত গতি হয়তো বিশৃঙ্খলা এবং একেবারে এলোমেলো গতির মিশ্রণ ঐ নিয়মহীন এলোমেলো বিক্ষোভ থেকে প্রকৃত বিশৃঙ্খলাকে আলাদা করতে পারা এবং তার মধ্যে অদ্ভুত আকর্ষককে চিনে নিতে পারা 'যার তার কম্মো' নয়—এর জন্য দরকার প্রকৃত বিশেষজ্ঞের।

ফ্র্যাকটালের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। যদি বিভিন্ন স্কেলে বার বার প্রযোজ্য একটি রূপান্তর দেওয়া থাকে তাহলে তার থেকে উদ্ভূত ফ্র্যাকটালের আকৃতি নির্ণয় করাটা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু যদি একটি ভাঙচুরে ভরা আঁকাবাঁকা রেখা বা স্তরে স্তরে ভাঁজ করা তল দিয়ে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ফ্র্যাকটাল আকৃতি চিনে বার করে সেটার মাত্রা নির্ণয় করতে বলা হয় তখন কাজটা সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই হিসেব-নিকেশের অসুবিধার জন্যে অনেক সময় ঐ সুপ্ত বিশৃঙ্খলা বা ফ্র্যাকটালের খোঁজ না পাওয়া যেতে পারে। তাই বিজ্ঞানীরা বাস্তব পর্যবেক্ষণ এবং কাল্পনিক মডেল নির্মাণ—এই দুই পদ্ধতি একযোগে প্রয়োগ করে প্রকৃতিতে লুকিয়ে থাকা বিশৃঙ্খলা এবং ফ্র্যাকটালের চিহ্ন আবিষ্কারে প্রয়াসী হন। এই প্রয়াস অন্তহীন কেননা প্রকৃতিতে বিশৃঙ্খলা বা ফ্র্যাকটালের উদাহরণের কোন শেষ নেই।

কিন্তু এদের এই প্রাচুর্যের কারণ কি? একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে প্রকৃতির মধ্যেই অরৈখিকতার বীজ সুপ্ত হয়ে আছে। কোন প্রাকৃতিক বস্তু যখন গড়ে ওঠে তখন তার সেই গঠন নিয়ন্ত্রণকারী বৈজ্ঞানিক নিয়মের মধ্যে যদি দৈর্ঘ্যের কোন অন্তর্নিহিত স্কেল না থাকে তাহলে উদ্ভূত আকৃতি বিভিন্ন স্কেলে স্ব-সদৃশ হবে।

জায়গা ভরাট করার কাজে সাধারণ রেখা বা তলের তুলনায় ফ্র্যাকটালের পারদর্শিতা বেশি। এই পারদর্শিতা জীববিজ্ঞানে খুব কাজে লেগে যায়। সাধারণ জ্যামিতিক চিত্রের তুলনায় ফ্র্যাকটালের গঠন অনেক জটিল। কিন্তু কি করে সেই ফ্র্যাকটাল তৈরি হয় তা বিবেচনা করলে আমরা দেখব যে তৈরির নিয়ম আশ্চর্যরকম সহজ। একটি (বা খুব বেশি হ'লে অল্প কয়েকটি) রূপান্তর বার বার ঘটিয়ে ফ্র্যাকটাল তৈরি করা হয়। জৈব বস্তুর ক্ষেত্রে ঐ আবৃত্ত রূপান্তরের সূত্র তাদের জনন (genetic code) সঙ্কেতে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে—এটা হওয়া খুবই সম্ভব। সেই জন্যই হয়ত জীবজগতে ফ্র্যাকটালের এত ছড়াছড়ি।

জলের কলে বিশৃঙ্খলা

বাথরুমের কল পুরো বন্ধ হচ্ছে না—তা দিয়ে টিপটিপ করে জল পড়েই চলেছে। এরকম ঘটনায় বিজ্ঞানের খোঁজ না করে লোকে বিরক্ত হবে বেশি। কিন্তু ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-ছাত্র রবার্ট শ' (Robert Shaw) বিরক্ত হ'লেন না। কেয়স—তত্ত্বের প্রথম যুগে যাঁরা তা নিয়ে খুব উৎসাহী হয়ে ওঠেন শ' তাঁদের একজন। তাঁর কাছে প্রথাগত উচ্চমার্গী পদার্থবিজ্ঞানের চেয়ে পুরো-বন্ধ-না-হওয়া কল থেকে হল পড়া বেশি চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল। তাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজে যে জিনিসটা মাপা যায় সেটাই মাপার ব্যবস্থা করলেন তিনি—পর পর দুটো জলবিন্দু পড়ার মধ্যে কতটা সময় অতিবাহিত হচ্ছে তা নির্ণয় করলেন। দেখলেন যে যখন ফোঁটাগুলো। আস্তে আস্তে পড়ে তখন তাদের নিঃসরণের হার সুষম হয় অর্থাৎ পরপর দুটো ফোঁটার মধ্যে সময়ের ফাঁক সমান থাকে। কিন্তু এরপর যদি বলটা আর একটু খুলে দেওয়া যায় তাহলে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখা যায়। ধরা যাক একটা ফোঁটা পড়ল; তারপর প্রথম ফোঁটাটা পড়ল 1/5 সেকেন্ড পরে। দ্বিতীয় ফোঁটাটা ঠিক ঐ সময়ের অবসরে পড়ল না, ধরা যাক সেটা পড়ল 1/8 সেকেন্ড পরে। তৃতীয় ফোঁটাটা কিন্তু পড়ল এর 1/5 সেকেন্ড পরেই। আর চতুর্থটা পড়ল তার ঠিক 1/8 সেকেন্ড পরে। এই ভাবে চলতে থাকল। অর্থাৎ ফোঁটার পর্যায় দ্বিগুণ হ'ল। কলটা আরও খুলে দিলে একসময় 'পর্যায়-চার' ধরনের আচরণ দেখা যাবে; ইত্যাদি। এই ধরনের আচরণ যথাযথ ভাবে দেখা যায় একমাত্র কম্পিউটার মডেলে—বাস্তব ক্ষেত্রে বাথরুমের কলে এর সঙ্গে অনেক বাড়তি, এলোমেলো বিচলন মিশে যায়। খুব সাবধানে, সত্যিকারের কল নিয়ে পরীক্ষা চালালে (শ' তাই করেছিলেন) আদর্শ আচরণের খুব কাছাকাছি যাওয়া যায়—প্রত্যাশিত নকশাটা চিনে নিতে তখন আর কোনো অসুবিধা হয় না। এইভাবে কলের মুখ ক্রমশ বেশি করে খুলে দিতে থাকলে পর্যায় দ্বিগুণ হ'তে হ'তে শেষে

একসময় ফোঁটা ঝরা সম্পূর্ণ অনিয়মিত হয়ে যায়।

এই অনিয়মিত হয়ে যাওয়া যে সত্যিই বিশৃঙ্খলা, শুধুমাত্র এলোমেলো বিচলন নয় তা দেখানোর জন্য উপযুক্ত ফেজ স্পেসে সঠিক 'অদ্ভুত আকর্ষক' নির্ণয় করা দরকার। এইটাই হ'ল সবচেয়ে কঠিন কাজ। এরজন্য শ একটি ত্রি-মাত্রিক লেখ এঁকেছিলেন। পর পর জলবিন্দুগুলোর মধ্যে সময়ের ফাঁককে যদি যথাক্রমে T_1, T_2, T_3, ইত্যাদি দিয়ে নির্দেশ করা হয় তাহলে শ'এর গ্রাফে প্রথম বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হবে (T_1, T_2, T_3), দ্বিতীয়টির (T_2, T_3, T_4), তার পরেরটির (T_3, T_4, T_5,) ইত্যাদি। এখন, প্রথম দিকে যখন সব ফোঁটা সমান সমান সময়ের অবসরে পড়ছে তখন ফেজ স্পেসে একটাই বিন্দু থাকবে—একক পর্যায়কালের নির্দেশক হিসেবে। তারপর পর্যায়
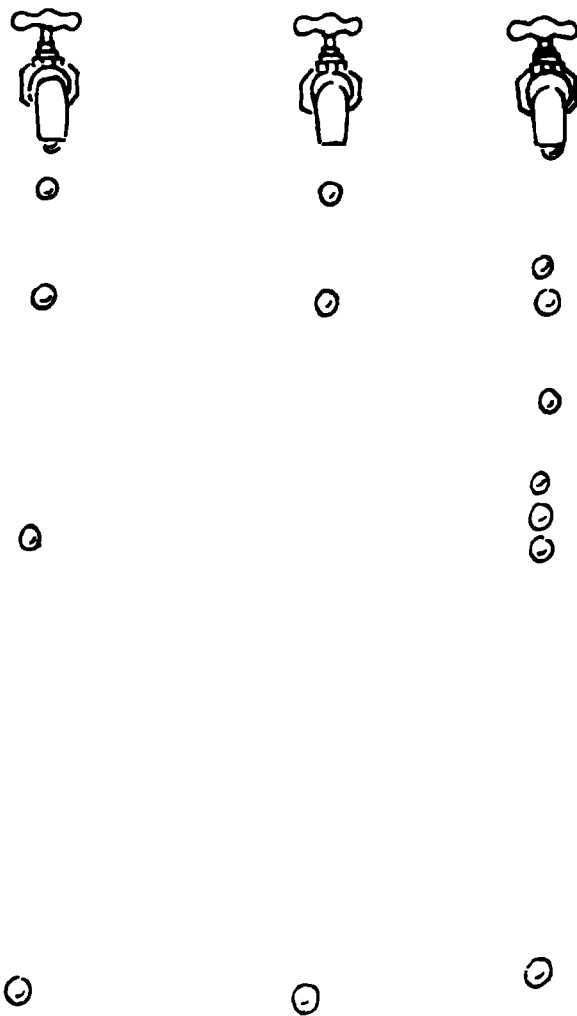
চিত্র 13·1 মুখ-আলগা জলের কলে বিশৃঙ্খলা।

দ্বিগুণ হ'লে দুটো বিন্দু পাওয়া যাবে, সে দুটো আবার দ্বি-বিভাজনের (bifurcation) ফলে চারটি বিন্দুর সৃষ্টি করবে—"পর্যায়-চার" অঞ্চলে। এইভাবে বিশৃঙ্খলার অঞ্চলে প্রবেশ করলে বিন্দু সমষ্টি একটা অদ্ভুত-দর্শন কিন্তু সুসংবদ্ধ আকৃতির সৃষ্টি করবে। এই হ'ল ঢিলে কলের "অদ্ভুত আকর্ষক"। কেবল এলোমেলো বিচলনের জন্য ফেজ স্পেসে ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকা কতগুলো বিন্দু

পাওয়া যেত। অদ্ভুত আকর্ষক গঠিত হওয়া মানেই ঘটনাটা বিশৃঙ্খলা, যেকোন ধরনের অনিয়ম নয়। এক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব কলের জলবিন্দুর নিঃসরণের নিয়মে অন্তর্নিহিত অরৈখিকতার উপস্থিতি নির্দেশ করছে। অভিকর্ষের টানে কলের মুখে গঠিত লম্বাটে জলবিন্দুর যে অংশটা পড়ে না সেটা গুটিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় তার পরের জলবিন্দুটির পড়ার পথে বাধা দেয়। অভিকর্ষের রৈখিক নিয়ম অনুযায়ী জলের ফোঁটাগুলো পড়ে না—একটা ফোঁটার পতনের ধরন তার পরের ফোঁটাটাকে প্রভাবিত করে। এর ফলেই কলের জলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

মানব শরীরে বিশৃঙ্খলা এবং ফ্র্যাকটাল

মানুষের শ্বাসনালী ও ফুসফুস সংলগ্ন সূক্ষ্ম নালিকার যে ঝিল্লি আছে (Bronchial network) তার কৃৎকৌশল চমকপ্রদ। শ্বাসনালীর (trachea) সঙ্গে দুই ফুসফুসের সংযোগ ঘটায় 'ব্রঙ্কাস' নামক দুটি নালী। প্রত্যেক ব্রঙ্কাস আবার অনেকগুলো ছোট শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এই সরু নালীগুলিকে ব্রঙ্কিওল্‌স বলা হয়। সরু থেকে আরও সরু নালীতে এইভাবে বিভক্ত হয়ে যাওয়া চলতেই থাকে, শেষ অবধি এই বায়ুনালীগুলির প্রান্ত এসে শেষ হয় কতগুলো ক্ষুদ্রাকৃতি ব্যাগের আকারের 'আনডিওলি'তে। এইখানেই রক্তের লোহিত কণিকারা এসে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। নালী এবং শাখা-নালীর এই জটিল সজ্জা বেশ কয়েকটা স্কেলে স্ব-সদৃশ বলে দেখা গেছে। এর ফ্র্যাকটাল মাত্রা 3 এর কাছাকাছি। নিজের প্রয়োজনেই প্রকৃতি শারীরিক ফ্র্যাকটাল তৈরি করেছে বলে মনে হয়। শরীরের মধ্যে ফুসফুসের জন্য বরাদ্দ জায়গা অল্প। ঐ জায়গা জুড়ে যদি মসৃণ আকারের ফুসফুস গঠিত হ'ত তাহলে সমস্ত শরীরের বিপুল পরিমাণ অক্সিজেনের চাহিদা মেটাতে সে সক্ষম হ'ত না। ঐ অল্প আয়তনে ফুসফুসকে এমনভাবে গঠিত হতে হবে যাতে তার বহিস্তলের ক্ষেত্রফল অনেকটা হয় এবং অনেকটা অক্সিজেন আদান-প্রদান করতে পারে। এটা করতে হ'লে ফ্র্যাকটালের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া প্রকৃতির আর কি উপায় আছে?

রক্ত সংবহন তন্ত্রের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার ঘটে। তার পরিসরটা আরও অনেক বড়। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন তার ডানদিক থেকে পালমোনারী শিরা দিয়ে ফুসফুসে রক্ত পাঠায়। সেখান থেকে টাটকা অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকে আসে সেখান থেকে চাপ খেয়ে অ্যাওরটা ধমনী এবং তৎসংলগ্ন অসংখ্য শাখা-উপশাখার মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যন্ততম প্রান্তে গিয়ে এই রক্ত কোষে কোষে অক্সিজেন পৌঁছিয়ে দেয়, অক্সিজেনশূন্য রক্ত আবার বহুসংখ্যক ছোট ছোট উপশিরার মধ্যে দিয়ে এসে বিভিন্ন শিরায় পড়ে; শিরাগুলি গিয়ে মিলিত
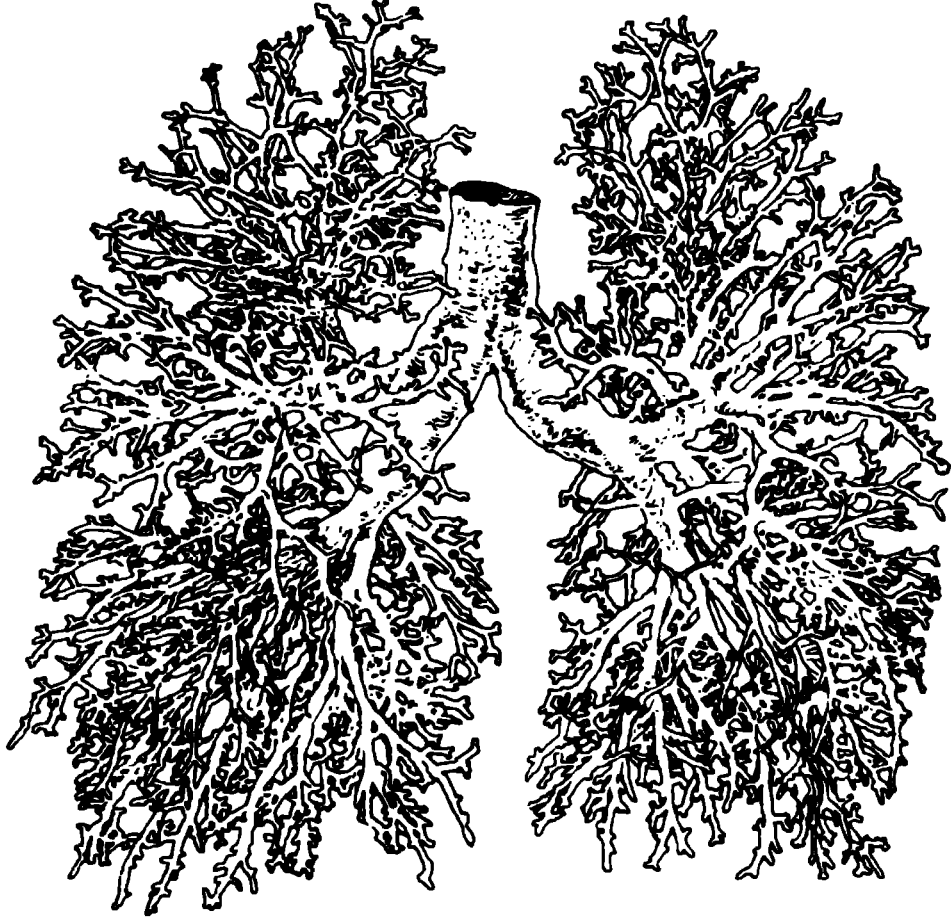
চিত্র 13·2 মানুষের শ্বাসনালী সংলগ্ন ব্রঙ্কাইয়ের শাখা-প্রশাখা একটি ফ্র্যাকটাল আকৃতি গঠন করে।
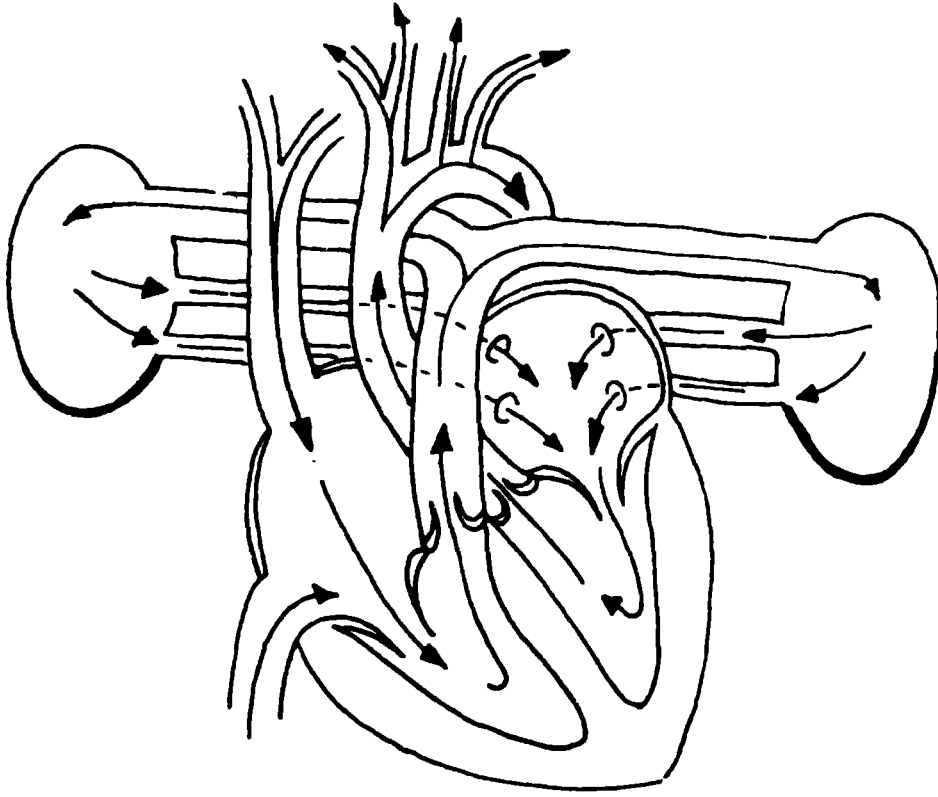
চিত্র 13·3 মানুষের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন অরৈখিক নিয়ম অনুসরণ করে। এর অনিয়মিত, পর্যাবৃত্ত এবং বিশৃঙ্খল আচরণ দেখা যায়।

হয় মহাশিরায় এবং সব শেষে শরীরের সবচেয়ে বড় দুটো শিরা দিয়ে এসে তা হৃৎপিণ্ডের ডান দিকে ঢোকে। এক্ষেত্রেও ন্যূনতম স্থান অধিকার করে শরীরের

প্রত্যেক কোণায় পৌঁছনোর দায় শিরা এবং ধমনীর বিন্যাসকে ফ্র্যাকটাল রূপ দান করে। এছাড়াও, হৃৎপিণ্ডকে স্পন্দিত করার জন্য বৈদ্যুতিক সঙ্কেত যে বিশেষ স্নায়ু সংবাহিত হয়ে আসে তার আকৃতিও ফ্র্যাকটাল বলে প্রতিভাত হয়।

এই 'ফিড-ব্যাক' ব্যবস্থা সংবলিত সূক্ষ্ম এবং জটিল সিস্টেমের চরিত্র অরৈখিক। একজন সুস্থদেহী মানুষের হৃদস্পন্দন পর্যাবৃত্ত। তা অপর্যাবৃত্ত হয়ে গেলে সেটাকে অসুস্থতার লক্ষণ বলে ধরা হয়। তখন পেসমেকার বসিয়ে তার সাহায্যে আবার স্বাভাবিক পর্যাবৃত্ত স্পন্দন উৎপন্ন করা হয়। অরৈখিক আচরণ একটি 'লিমিট সাইকুল্' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এক ধরনের হার্টের অসুখে (ventricular fibrilition) হার্টের স্পন্দন অনিয়মিত হয়ে পড়ে, অত্যন্ত দ্রুততালে পাম্প হতে থাকে রক্ত কিন্তু তাতেও সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালন হয় না। মনে হয় এই ব্যাধি সামগ্রিক সিস্টেমটারই অসুস্থতার লক্ষণ, কোন বিশেষ একটা অংশের নয়। হৃদ্‌পিণ্ডের কর্মপদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে কম্পিউটার মডেল তৈরি হয়েছে—তা থেকে অনেক কিছু বোঝাও গেছে। কিন্তু এ জাতীয় কাজ এখনও অবধি গবেষণার স্তরে রয়ে গেছে। এসব কিছুর মধ্যে থেকে একটা নতুন কথা জানা গেছে যেটা আমাদের চিরাচরিত ভাবার ধরনের সঙ্গে একদম মেলে না। সেটা হ'ল এই যে হৃদস্পন্দন বা শরীরের অন্য অনেক স্নায়ু নিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি যথাযথ, বিশুদ্ধ পর্যাবৃত্ত স্পন্দনে পরিণত হলে সেটা বহু ক্ষেত্রেই বার্ধক্য বা অসুস্থতার লক্ষণ। আদর্শ পর্যাবৃত্ত গতি এবং পুরোপুরি অবিন্যস্ত নিয়মহীনতা—এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে বিশৃঙ্খলা বা কেয়স, যার মধ্যে স্বাধীন বৈচিত্র্যের সঙ্গে কিছুটা সুস্থিতিও পাওয়া সম্ভব। ফলে এই বিশৃঙ্খলা হয়তো ভালো স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ!

ভূ-বিজ্ঞানে স্ব-সাদৃশ্য

বড় জিনিস ভেঙে ছোট টুক্‌রোয় পরিণত হচ্ছে—এ রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি ভূ-বিজ্ঞানীকে প্রায়ই হতে হয়। জল বা বায়ুর ক্রমাগত ঘর্ষণে, আগ্নেয়গিরির উদগীরণের বা মনুষ্যসৃষ্ট বিস্ফোরণের ফলে বড় পাথর ছোট টুক্‌রোয় ভেঙে যায়। ভূত্বকের টেক্‌টনিক বিচলনে এটা ঘটে; ত্বকে ফাটল তৈরি হয় এবং সেই ফাটল অরৈখিক পদ্ধতিতে ছড়িয়ে পড়ে; পাথর ভাঙে। যে সব মূল ভৌত প্রক্রিয়ার ফলে এসব ঘটে তার মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন দৈর্ঘ্যের স্কেল নেই। সেটা আরও বোঝা যায় এর থেকে যে এক্ষেত্রে (সংখ্যায়ন নির্ভর) ঘাত-সূত্র ক্রিয়াশীল। যে সব বস্তুর রৈখিক মাপ "r" এর চেয়ে বড় তাদের সংখ্যা যদি N হয় তাহলে দেখা যায় যে $N \propto r^D$, যেখানে D হচ্ছে ফ্র্যাকটাল মাত্রা। ভাঙচুরের পদ্ধতি, দেখা যাচ্ছে, ফ্র্যাকটাল—নিয়ম নিয়ন্ত্রিত। ভাঙা কয়লা, গ্র্যানাইট বা ব্যাসল্টের ক্ষেত্রে D এর মান

2·5 এর কাছাকাছি হয়। তুলনায় চূর্ণ কোয়ার্টজের ফ্র্যাকটাল মাত্রা প্রায় 1·9। ঠিক কি নিয়মে বস্তুপিণ্ড ভাঙছে তার খুঁটিনাটি নির্ণয় করা সম্ভব নয়—কিন্তু ভগ্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ করে এটা যাচাই করা গেছে যে টুকরোগুলোর মাপের নিয়মটা স্কেল—নিরপেক্ষ।

ভূতাত্ত্বিকদের কাছে স্কেল-নিরপেক্ষতা নতুন কিছু নয়। ভূমিকম্পের কোন অন্তর্নিহিত স্কেল নেই। বড়, মাঝারি ছোট এবং প্রায় নগণ্য মাপের ভূমিকম্প হয়ে থাকে এবং স্কেলের অন্য ছাড়া তাদের মূল চরিত্রে আর কোনোই তফাত থাকে না। রিখ্‌টার স্কেলে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার (ধরা যাক m) চেয়ে বড় মাত্রায় ভূমিকম্প পৃথিবীতে (একক সময়ে) কটা হচ্ছে তার সঙ্গে ঐ m-এর সম্পর্ক একটি ঘাত-নির্ভর সূত্র নিয়ন্ত্রণ করে—এটাই স্ব-সাদৃশ্যের উৎস। ভূ-পৃষ্ঠ ফ্র্যাকটাল আকৃতিতে ভরা। তটরেখার মাত্রা 1 এবং 2 এর মাঝে, উচুঁনীচু পর্বত এবং গিরিখাতের মাত্রা 2 এবং এর 3·মাঝামাঝি। মেঘেরা দৈর্ঘ্যের বেশ কয়েকটা স্কেল জুড়ে স্ব-সদৃশ। সাধারণ আকারের কোন বস্তুর ক্ষেত্রফল এবং পরিসীমার লগারিদ্‌ম্‌ নিয়ে লেখ আঁকলে প্রাপ্ত সরলরেখার নতিমাত্রা হবে 2। মেঘের ক্ষেত্রে এই মান অনেক কম, 1.5 এর কাছাকাছি। এর থেকে বোঝা যায় যে মেঘের সীমারেখার আকৃতি প্রায় 1.3 মাত্রা বিশিষ্ট ফ্র্যাকটাল।

একইভাবে বহু ভূতাত্ত্বিক ঘটনার আড়ালে বিশৃঙ্খলা লুকিয়ে থাকে। এদের মধ্যে অগ্রগণ্য পৃথিবীর আবহাওয়া, কিন্তু অন্য ভৌত-পদ্ধতিও আছে। যেমন—তাপের পরিচলন। (লোরেঞ্জের আবহাওয়ার মডেলেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।) ভূগর্ভে ত্বকের ঠিক নীচের অংশে (Mantle) ইউরেনিয়াম থোরিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় মৌলদ্বারা বিকীর্ণ তাপ পরিচলন পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়। এই পরিচলন পদ্ধতি বিশৃঙ্খল হওয়া খুবই সম্ভব। পৃথিবীর কেন্দ্রভাগের (core) বাইরের দিকে গলিত, পরিবাহী, তরল ধাতু-স্রোত ভূ-চুম্বকত্বের উৎস বলে মনে করা হয়। প্রত্ন-শিলায় লিপিবদ্ধ পৃথিবীর চুম্বকত্বের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে অতীতে বহুবার ভূচুম্বকের মেরুদুটি স্থান বদলা বদলি করেছে অর্থাৎ ভূ-চুম্বক-ক্ষেত্রের দিক উল্টে গেছে। উত্তর-মেরু দক্ষিণে এবং দক্ষিণ-মেরু উত্তরে পরিণত হয়েছে। এটা ঘটেছে নিজে নিজে এবং অনিয়মিত সময়ের ব্যবধানে। শেষবার এটা হয়েছে আজ থেকে সম্ভবত দশ লক্ষ বছর আগে। পৃথিবীর কেন্দ্রকে একটা ডায়নামো রূপে কল্পনা করে নির্মিত মডেলে ঐ পরিবর্তনের অনুকরণ করা সম্ভব হয়েছে—এই আচরণে বিশৃঙ্খলা ধরা পড়েছে।

বস্তুর উপাদান এবং তার ভৌতধর্ম নিয়ে গবেষণা করেন যে বিজ্ঞানীরা তাঁদের কাছে 'ফাটল' খুবই আগ্রহের বস্তু। ধাতব দণ্ড ভেঙে গেলে ভাঙা তল মসৃণ হয় না। ঐ তলে বহু উচুঁ নীচু খোঁচা থাকে—সেগুলো স্ব-সাদৃশ্য দেখায় বেশ কয়েকটা

চিত্র 13·4 ছোট, মাঝারি এবং বড় মাপের ভূমিকম্পের মূলগত চরিত্র একই। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দেয়, তাই এই তথ্যটা প্রায়শই নজর এড়িয়ে যায়।

স্কেল জুড়ে। এই জন্যই ভাঙা টুক্‌রো ঠিক ঠিক জোড়া লাগে না যতই চেষ্টা করা যাক না কেন। ঐ-জাতীয় ফ্র্যাকটাল তলের মাত্রা থেকে সেটা কতটা এবড়োখেবড়ো তার একটা পরিমাণগত আন্দাজ পাওয়া যায়। ম্যান্ডেলব্রট আরও দুই সহকর্মীর সঙ্গে (Passoja এবং Paullay) দেখান যে অল্প কার্বন-মিশ্রিত স্টীলের ভাঙা টুক্‌রোর ফ্র্যাকটাল মাত্রা 2·3 এর কাছাকাছি। অসমতল পাহাড়ের মাত্রাও এর খুব কাছাকাছি। ফলে ধাতুর ভাঙা টুক্‌রোর গায়ের উচুঁনীচু ঢল-আকৃতির দিক দিয়ে ছোট স্কেলের পর্বতশ্রেণীর মত। টুক্‌রোয় ভেঙে যাওয়ার উল্টো যে পদ্ধতি—অর্থাৎ ছোট টুক্‌রো জুড়ে, জমাট বেঁধে বড় পিণ্ড তৈরি—তাও স্কেল নিরপেক্ষ। শুরুতে ছোট ছোট কণারা সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে—তারপর তাদের ব্যাপন (diffusion) শুরু হ'লে এক এক অংশে তাদের সংখ্যা বেড়ে যায়, ঐ সব অংশে কণারা দানা বেঁধে ছোট ছোট 'দলা' তৈরি করতে থাকে—পরে ঐ রকম অনেকগুলো দলা একত্র হয়ে বড় পিণ্ড তৈরি করে। জমাট বাঁধা ঐ খণ্ডগুলো থেকে কিভাবে আলো (বা অন্য বিকিরণ) বিচ্ছুরিত হয় তা পর্যবেক্ষণ করে তাদের ফ্র্যাকটাল মাত্রা নিরূপণ করা যায়। কলয়েডের বৃদ্ধি, তড়িৎবিশ্লেষণের সময়ে ধাতুর

প্রলেপ পড়ার হার ইত্যাদি নিয়ে গবেষণার কাজে ঐ দানা বাঁধার পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য কাজে লাগে। সমাজ জীবনে একটা অতীব আশ্চর্য ঘটনা বুঝতেও এটা সাহায্য করতে পারে, সেটা হ'ল "গুজবের বৃদ্ধি"।

সমাজ-বিজ্ঞানে ফ্র্যাকটাল

সমাজবিজ্ঞান বা কলাবিদ্যার ক্ষেত্রেও ফ্র্যাকটাল এবং স্ব-সাদৃশ্য চোখে পড়ে। বস্তুত অর্থশাস্ত্র (Economics) নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে গিয়েই ম্যান্ডেলব্রট প্রথম স্কেল-নিরপেক্ষ বিন্যাসের খোঁজ করতে শুরু করেন। জনসমষ্টিতে আয়ের বণ্টন স্ব-সদৃশ মণ্ডল তৈরি করে। আয়ের মান এবং যাঁরা ঐ আয় করেন তাদের সংখ্যা একটি ঘাত-নির্ভর সূত্র দ্বারা যুক্ত। কিন্তু এত সবের পরেও শেয়ার বাজারের দামের ওঠা পড়ার মত বিষয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকতে পারে এটা জেনে ম্যান্ডেলব্রটও বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

শেয়ারের বাজারে যাঁরা কেনা-বেচা করেন তাঁরা বহুদিন যাবৎ একটা কথা বিশ্বাস করে আসছেন যে দামের ক্ষণিক (যেমন, ঘণ্টায় ঘণ্টায়) ওঠা-পড়া পুরোপুরি অনিয়মিত—বিপুল সংখ্যক কারণ তাকে নিয়ন্ত্রণ করে (ভৌত-বিজ্ঞানের ভাষায় তার স্বাধীনতার মাত্রা অনেক); ঐ বিচলনকে অগ্রাহ্য করাই ভালো। দীর্ঘতর সময়ের ব্যবধানে—কয়েক সপ্তাহে বা মাসে দামের যে গড় হ্রাস বা বৃদ্ধি তা থেকেই একমাত্র অর্থনীতির অবস্থা, একটা বিশেষ কম্পানীর হাল কিংবা লগ্নিকারকদের মানসিকতা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব। স্বল্প সময়ে দামের যে হেরফের তা পুরোপুরি অনিয়মিত (random) বলে গড়মানের দু-ধারে তার বিস্তৃতির রূপ গাউসিয়ান হবে (Gaussian distribution)। কিন্তু দীর্ঘ সময়ে ঐ দামের পরিবর্ত অন্য, জটিল নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—যাকে আবিষ্কার করা অর্থশাস্ত্রের অন্যতম কাজ। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পরিবর্তনের মধ্যে এই তফাৎ প্রচলিত বিচার পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে।

কিন্তু যে কারণসমূহ শেয়ারের দামকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা এই তফাত খুব একটা গ্রাহ্য করে বলে মনে হয় না। স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যই বরঞ্চ চোখে পড়ে। দামের পরিবর্তনের ধরনটা সময়ের সাপেক্ষে স্ব-সদৃশ। যেমন, মিনিটে মিনিটে শেয়ারের দামের পরিবর্তন যদি আধঘণ্টা ধরে পর্যবেক্ষণ করে তার লেখ আঁকা যায় তাহলে সেটাকে 13·5 নং চিত্রের মত দেখতে হবে। এবার যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় কি পরিবর্তন হচ্ছে তা একদিন ধরে বা দৈনিক পরিবর্তন এক সপ্তাহ ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়, অথবা সাপ্তাহিক পরিবর্তন এক মাস ধরে কিংবা মাসিক ওঠা-পড়া এক বছর ধরে লক্ষ করে তার লেখ আঁকা

যায় তাহলে প্রতিক্ষেত্রেই লেখ-এর মূল চেহারাটা 13·5 নং চিত্রের মতই হবে। বহিঃস্থ কারণে হঠাৎ হঠাৎ কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে—সে জায়গায় লেখগুলো মিলবে না। কিন্তু অর্থনীতির যে মূল নিয়ম এই পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারমধ্যে সময়ের কোন অন্তর্নিহিত স্কেল নেই। নিউ ইয়র্কের শেয়ার বাজারে তুলো-সংক্রান্ত দাম কয়েক দশকে কিভাবে বদলেছে তার ওপর সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করে ম্যান্ডেলব্রট এই সত্য আবিষ্কার করেন। বহু ভাষার মধ্যে আশ্চর্য একটা সাধারণ নিয়ম ক্রিয়াশীল বলে দেখা যায়। কোন বিশেষ ভাষায় লেখা,
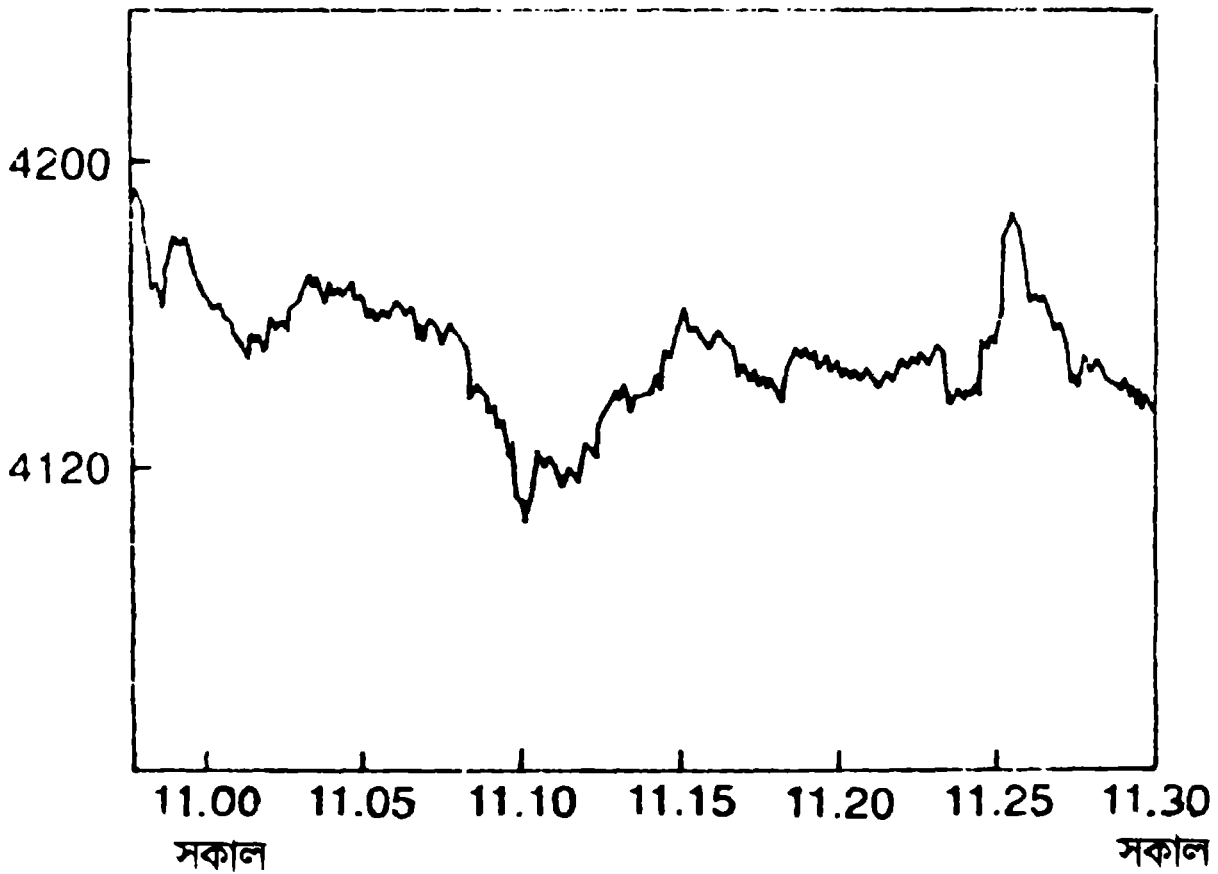
চিত্র 13·5 শেয়ার বাজারে মিনিট থেকে মিনিটে দামের ওঠাপড়া (গুণবাচক চিত্র)।

মোটামুটি দীর্ঘ একটা বয়ান নিয়ে যদি তাতে ব্যবহৃত সমস্ত শব্দের এমন একটা তালিকা তৈরি করা যায় যার একদম ওপরে থাকে সবচেয়ে বেশিবার ব্যবহৃত শব্দটি এবং সবচেয়ে নীচে স্থান পায় সেই শব্দ যেটি ব্যবহৃত হয়েছে সবথেকে কম বার এবং মাঝে অন্য সব শব্দ তাদের ব্যবহারের মাত্রার পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে এবং তালিকার শীর্ষ থেকে 'এক', 'দুই', 'তিন' করে শব্দগুলির ক্রমাঙ্ক নির্দেশ করা হয় তাহলে সেই ক্রমাঙ্কের সঙ্গে শব্দের ব্যবহারের মাত্রার (অর্থাৎ সেটা কতবার ব্যবহৃত হয়েছে) একটা সম্পর্ক বেরোয়। যেমন, আমরা যদি হিন্দী ভাষা নিয়ে কাজ করি তাহলে তালিকার শীর্ষে খুব সম্ভব "কে" শব্দটিকে পাওয়া যাবে —তারপর আসবে "কা", "কো" এবং "ভি"। ইংরাজিতে উঁচু থেকে ক্রমানুসারে পাওয়া যাবে "দি", "অফ্", "অ্যান্ড" এবং "টু" শব্দগুলিকে। বিভিন্ন ভাষা এবং একই ভাষার

চিত্র 13·6 জিপফ'এর সূত্র : স্বাভাবিক ভাষায় শব্দের ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতা এবং তার ক্রমাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক

বিভিন্ন রচনা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সর্বক্ষেত্রেই একটি সহজ সম্পর্ক বেরিয়ে আসে। কোন শব্দের ব্যবহারের মাত্রা "r" এবং তালিকায় তার ক্রমাঙ্ক "n" হ'লে ঐ দুই রাশি একে অপরের ব্যস্তানুপাতিক হয়। log r এবং log n এর মধ্যে লেখ আঁকলে তা ঋণাত্মক নতিমাত্রা বিশিষ্ট একটি সরল রেখা হয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে জি. কে. জিপ্‌ফ্ (G. K. Gipf) এই নিয়মটি আবিষ্কার করেন—তাঁর নাম অনুসারে একে জিপ্‌ফের সূত্র বলা হয়।

আমরা যদি কোন একটা ভাষায় শুধু বর্ণমালাটা শিখে নিই—ভাষাটা না শিখে —এবং ব্যাকরণ, শব্দার্থ—এসব না জেনে শুধু বর্ণগুলোকে ইচ্ছেমত জুড়ে শব্দ-সদৃশ কতগুলো জিনিস তৈরি করে মাঝে মাঝে (নির্দিষ্ট সম্ভাব্যতা বা প্রোব্যাবিলিটি অনুযায়ী) ফাঁক রেখে সেগুলো সাজাই তাহলে একটা 'অর্থহীন' হযবরল বয়ান তৈরি হবে। দেখা গেছে ঐ জাতীয় "অর্থহীন" ভাষার চরিত্র ফ্র্যাকটাল হয়ে থাকে। এই ভাষাতেও কোন "শব্দের" ক্রমাঙ্ক এবং তার ব্যবহারের মাত্রা জিপ্‌ফের সূত্রের অনুরূপ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়—খালি একটা তফাত থাকে। এক্ষেত্রে ($^1/_r$) এর মাত্রা 1 হয় না, তার চেয়ে বড় একটা ভগ্নাংশ হ'য়ে থাকে। ভগ্নাংশের মান নির্ভর করে বর্ণমালায় কটা অক্ষর আছে, শব্দের মধ্যে ফাঁক রাখা সম্ভাব্যতা কি—ইত্যাদির ওপর। 40 টি অক্ষর বিশিষ্ট বর্ণমালায় যদি শব্দের মধ্যে ফাঁক থাকার

সম্ভাব্যতা $^1/_6$ ধরা হয় তাহলে ঐ ঘাতের মান দাঁড়ায় 1·05। (নির্দেশিকার 18 নম্বর পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।)

পারকোলেশন বা অনুস্রাবণ

ঘন বনের মধ্যে দাবাগ্নি ছড়িয়ে পড়া অনুস্রাবণের (Percolation) উদাহরণ। কোনভাবে (ঘষা লেগে হয়ত) কয়েকটা গাছে আগুন ধরে গেলে তাদের কাছেপিঠের গাছগুলোতে সেটা ছড়িয়ে পড়ে, সেখান থেকে ছড়ায় তাদের পার্শ্ববর্তী গাছগুলোতে। এইভাবে, জঙ্গল খুব ঘন হলে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বিরাট দাবানলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি গাছগুলোর মাঝে বেশ ফাঁক থাকে, তাহলে অল্প কিছু গাছ পুড়ে যাওয়ার পর আগুনটা নিজে নিজেই নিভে যায়। মহামারী ছড়ানোর সময়ও অনরূপ ব্যাপার ঘটে। জনবসতি খুব ঘন হ'লে সেটা পুরো বসতিটাকেই গ্রাস করে। কিন্তু তা যেখানে নয় সেখানে অল্প কয়েকজনকে আক্রমণ করার পর রোগ আর ছড়ায় না।

এইজাতীয় অনুস্রাবণের ঘটনার কম্পিউটার মডেল তৈরি করে চালালে অনেক ব্যাপার জানা যায়। দাবার ছকের মত বর্গাকৃতি একটা ক্ষেত্রকে আমরা জঙ্গল বলে ভাবতে পারি। একেকটা খোপে গাছ আছে না নেই তা নির্দিষ্ট হ'চ্ছে সম্ভাব্যতা "p" দ্বারা। সবথেকে তলার সারির গাছে প্রথমে আগুন লাগে—তার পর সেটা কিভাবে ছড়ায় সেটাই কম্পিউটারে দেখা হয়। p-র মান ক্ষুদ্র হলে বিপরীত প্রান্তে পৌঁছনোর আগেই আগুন নিভে যায়। অন্যদিকে, যখন সমস্ত খোপেই গাছ থাকে $(p = 1)$ তখন সব গাছ পুড়ে যায়। দেখা যায় p-র মান একটা নির্দিষ্ট মাত্রার (p_c) চেয়ে বড় হ'লে তবেই আগুন বিপরীত প্রান্ত অবধি ছড়ায়। $p < p_c$ হ'লে তার আগেই নিভে যায়। আগুন কিভাবে ছড়াচ্ছে সে ব্যাপারে মডেলে কি ধরে নেওয়া হয়েছে তার ওপর p_c-র মান নির্ভর করে। যেমন, যদি ধরা যায় যে একটা জ্বলন্ত গাছ তার নিকটতম প্রতিবেশী গাছেদেরই কেবল প্রজ্জ্বলিত করতে পারে এবং সেটা করতে তার সময় লাগে এক একক; গাছটার পুরো পুড়ে যেতে সময় লাগে দুই একক; তাহলে p_c-র মান দাঁড়ায় 0·593। আগুনের তেজ যদি আরও বেশি হয় এবং একটি জ্বলন্ত গাছ থেকে শুধু তার নিকটতম গাছগুলি নয় তার ঠিক পরের সারির গাছগুলোতেও আগুন লাগে তাহলে p_c-র মান স্বভাবতই কমে যায়। p_c-র কাছাকাছি অঞ্চলে অনুস্রাবণে যুক্ত বহু রাশিই ঘাত-নির্ভর সূত্র অনুসরণ করে চলে। সেক্ষেত্রে ঘাতের মান সমস্যাটার সাধারণ চরিত্র অর্থাৎ তার স্বাধীনতার মাত্রা (degrees of freedom) এবং যে স্থানে এটা ঘটছে তার মাত্রা (dimension) ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে—তার বিশেষ রূপের ওপর নয়। বর্গাকার ক্ষেত্রের জন্য স্থানিক মাত্রা 2; দাবানলের ক্ষেত্রে দগ্ধ বা অদগ্ধ এই দুই রকমের মাত্র গাছ
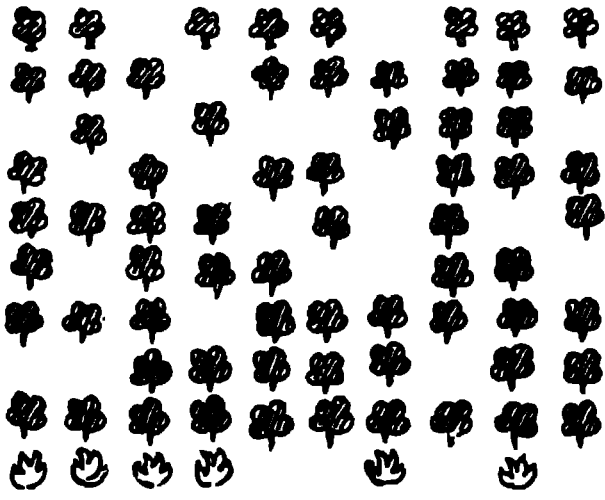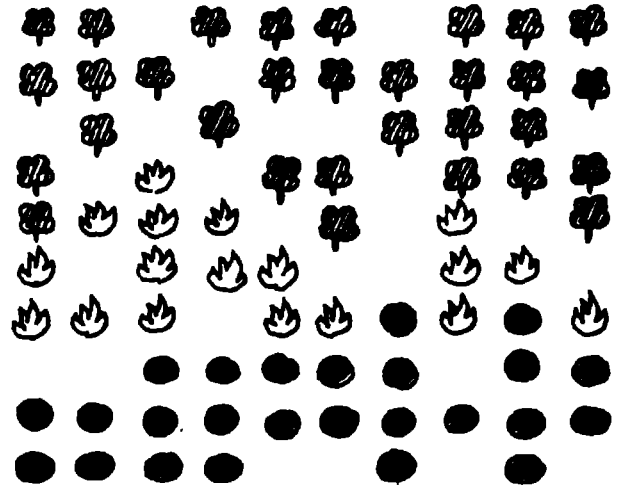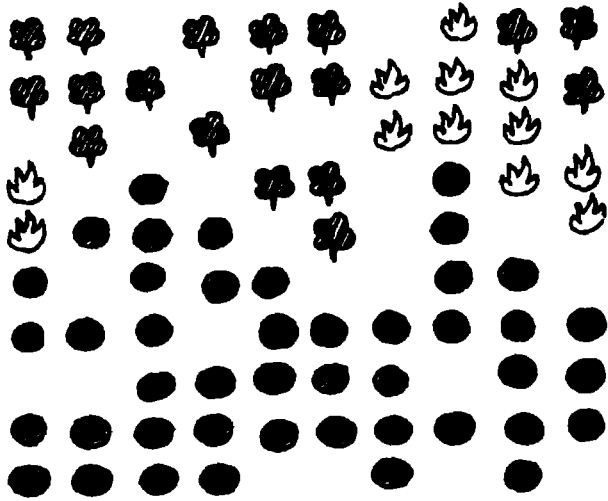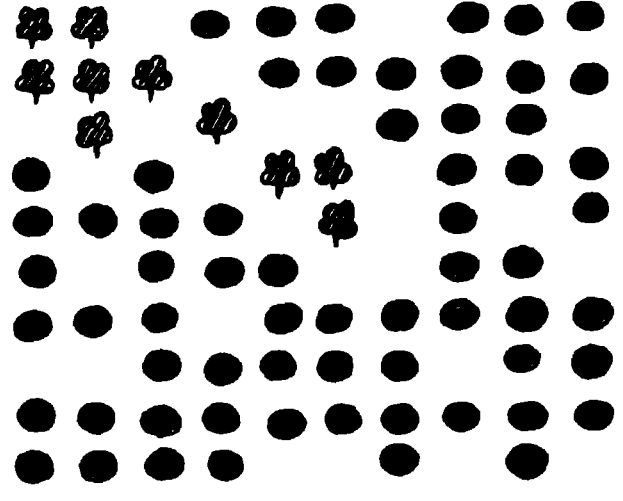
চিত্র 13·7 জঙ্গলে আগুনের অনুস্রাবন : (a) আগুনের শুরু নির্দেশ করে আর (d) তার শেষ; (b) এবং (c) মধ্যবর্তী স্তর।

থাকতে পারে—তাই স্বাধীনতার মাত্রাও 2। ফেজ্ (phase) রূপান্তরের সময় যে সব নিয়ম ক্রিয়াশীল হয় তাতে ঐ রকম সার্বজনীন ঘাত বিশিষ্ট স্কেলিং-এর সূত্র দেখা যায়। সময়ের সঙ্গে আগুনের সীমানা কিভাবে এগোয় সেটার রেখাচিত্র আঁকলে একটা ঘাত-নির্ভর সূত্র পাওয়া যায়। লগ-লগ লেখ আঁকলে একটা সরলরেখা পাওয়া যায় যার নতিমাত্রা 0·9। ব্যাপনের (diffusion) ক্ষেত্রে যা পাওয়া যায় এই মান তার চেয়ে অনেক বেশি।

চিত্র 13·8 দাবানলের সময় আগুনের অগ্রগামী সীমারেখার সময়ের সাপেক্ষে সরণ।

একইভাবে সময়ের সাপেক্ষে দগ্ধ গাছের সংখ্যার লগ্-লগ্ লেখ আঁকলে 0·8 নতিমাত্রার একটি সরলরেখা পাওয়া যায়। আগুন নিভে যেতে কত সময় লাগে সেটা বিবেচনা করলেও একটা মজার তথ্য নজরে আসে। p-র মান যখন p_c-র চেয়ে অনেকটা বেশি বা অনেকটা কম হয় তখন নির্বাপণের সময় অল্প হয়। (অর্থাৎ বেশ তাড়াতাড়ির মধ্যে হয় আগুনটা পুরো অঞ্চলটাকেই গ্রাস করে বা অল্প কয়েকটা গাছ দগ্ধ করে নিভে যায়।) কিন্তু p_c-র কাছাকাছি এলে নির্বাপণের সময় অনেকটা বেড়ে যায়। তাপগতিবিদ্যায় ফেজ্ রূপান্তরের সময়ও অনেকটা এই রকমই ঘটতে দেখা যায়।
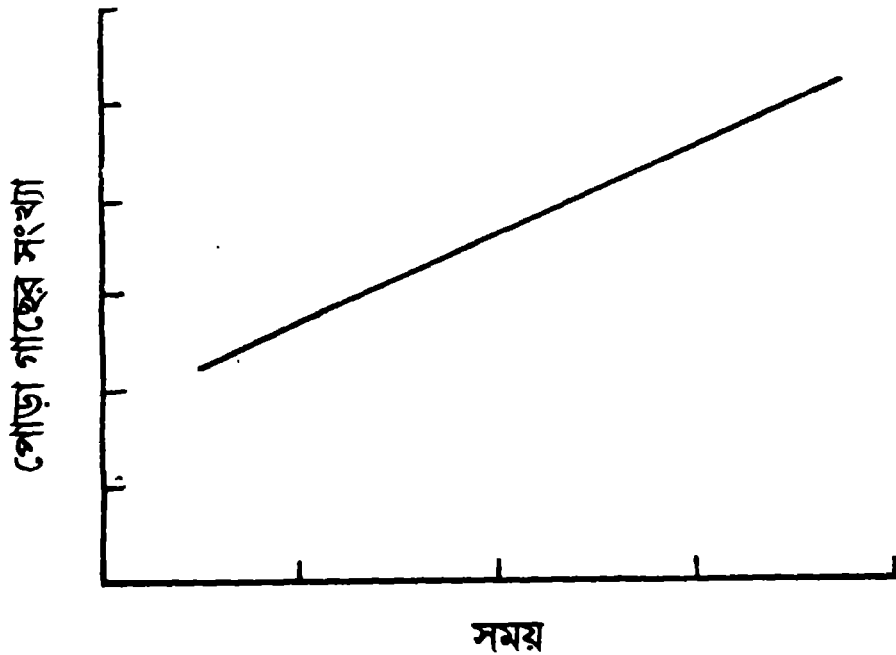
চিত্র 13·9 সময়ের সঙ্গে পোড়া গাছের সংখ্যার পরিবর্তন।
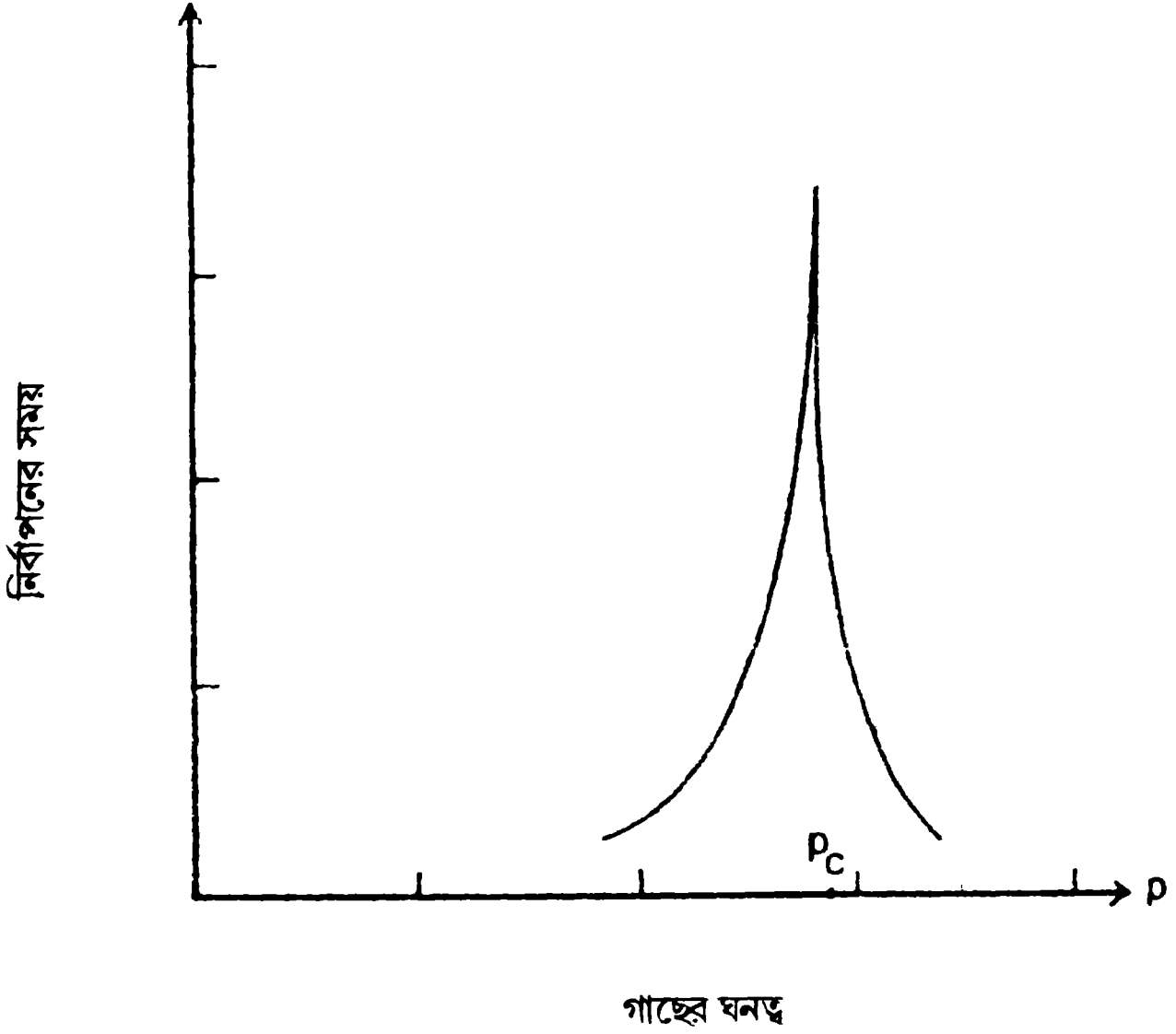
চিত্র 13·10 আগুন নির্বাপিত হওয়ার সময়ের সঙ্গে গাছের স্থান অধিকারের সম্ভাবনার রেখাচিত্র।

দগ্ধ গাছের সংখ্যা, N, কিভাবে বদলায় তা পর্যবেক্ষণ করলে অনুস্রাবণের ফ্র্যাকটাল চরিত্র স্পষ্ট হয়। p-র মান যখন p_c-র থেকে অনেক দূরে, তখন N বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমানুপাতি হয়। অর্থাৎ $N \propto L^2$ হয়, তা সে পুরো জঙ্গলই পুড়ে যাক বা কয়েকটা গাছ পুড়িয়ে আগুন নিভে যাক। কিন্তু $p = p_c$ হ'লে সম্পর্কটা বদলে যায়—তখন $N \propto L^D$ হয়, যেখানে D পূর্ণসংখ্যা নয়, তার মান 1.9-এর কাছাকাছি। আগুন এগিয়ে যাবার সময় পেছনে যে অদগ্ধ গাছগুলো ছেড়ে যায় দগ্ধগাছের পটভূমিতে সেগুলোকে "গর্তের" মত দেখায়। এই গর্তগুলোর বিন্যাস যা-খুশী-তাই নয়। এদের বিন্যাস বেশ কয়েকটা স্কেল জুড়ে স্ব-সদৃশ। এই স্ব-সাদৃশ্য থেকেই D-এর ভগ্নাংশ মানের উৎপত্তি। আগুনের সম্মুখগামী সীমারেখাও একটি ফ্র্যাকটাল। তার মাত্রা 1 এবং 2-এর মধ্যবর্তী। (নির্দেশিকার 18 নং গ্রন্থে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা পাওয়া যাবে।)

আকর্ষকের অববাহিকা

দ্বাদশ অধ্যায়ে আকর্ষকের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদি কোন সিস্টেমের একটার বেশি আকর্ষক থাকে তাহলে প্রত্যেক আকর্ষক তার পার্শ্ববর্তী একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিন্দুগুলিকে নিজের দিকে টেনে নেয়। ঐ অঞ্চলকে আমরা আকর্ষকের 'অববাহিকা' বলতে পারি। এই অববাহিকার সীমারেখাগুলি সবসময়ে সাধারণ রেখা না হয়ে ফ্র্যাকটাল হতে পারে। সচরাচর ভৌত সিস্টেমের ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়। কিন্তু নিউটনের পুনরাবৃত্তির (iteration) পদ্ধতি অনুসরণ করে কেউ যদি ত্রিঘাত বা উচ্চতর ঘাতের সমীকরণ সমাধান করার চেষ্টা করে তাহলেও এটা খুব সুন্দর দেখতে পাওয়া যায়। পদ্ধতিটা খুব সহজ। প্রথমে একটা সমাধান আন্দাজ করে নিতে হয়; তারপর সেই সমাধানটাকে একটা বিশেষ রূপান্তরের মাধ্যমে পরিবর্তিত করলে (রূপান্তরের পদ্ধতিটা বলে দেওয়া আছে) আগের চেয়ে ভালো একটা সমাধান পাওয়া যায়। এবার এই সমাধানটাকে 'ইনপুট' হিসেবে ব্যবহার করলে আরও একটু ভালো একটা সমাধান মিলবে। এইভাবে বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটালে শেষ অবধি সঠিক সমাধানটা পাওয়া যাবে।

$Z^2 = 1$ এই সমীকরণটাকে এই পদ্ধতিতে সমাধান করার চেষ্টা করা যাক। আমরা জানি সঠিক সমাধানটা হ'ল $Z = \pm 1$; নিউটনের পদ্ধতিতে এক্ষেত্রে যে পুনরাবৃত্তির সূত্র দেওয়া আছে তা হ'ল :

$$Z_{n+1} = \frac{(Z_n^2 + 1)}{2Z_n}$$

আমরা শুরু করি একটা কাল্পনিক সমাধান নিয়ে : $Z_0 = 0{\cdot}6$। এটা সূত্রে বসালে পাই $Z_1 = 1{\cdot}13$; এর পর ক্রমিক পুনরাবৃত্তির ফলে পাই : $Z_2 = 1{\cdot}007$, $Z_3 = 1{\cdot}0002$ ইত্যাদি। স্পষ্টতই আমরা $Z = 1$ এই সমাধানটার দিকে এগোচ্ছি। আবার যদি $Z_0 = -\ 0{\cdot}5$ নিয়ে শুরু করতাম তাহলে পুনরাবৃত্তির ফলে সমাধানটা 2 = -1-এর দিকে এগতো।

কিন্তু বীজগাণিতিক সমীকরণের সমাধান সবসময়ে বাস্তব সংখ্যা হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে তা জটিল (complex) সংখ্যাও হয়ে থাকে। জটিল সংখ্যাকে $x + iy$ রূপে লেখা হয় যেখানে x এবং y বাস্তব সংখ্যা আর $i = \sqrt{-1}$, যার মান (ঋণাত্মক রাশির বর্গমূল বলে) বাস্তব সংখ্যা নয়। x এবং y কে যথাক্রমে জটিল সংখ্যার বাস্তব এবং কাল্পনিক অংশ বলা হয়। এদের একটি তলে দুই-অক্ষ বরাবর প্লট করা যায়। তা করলে ঐ 'জটিল' তলের প্রত্যেক বিন্দু তার (x, y) স্থানাঙ্ক দিয়ে একটি করে জটিল সংখ্যা নির্দেশ করবে যার মান $(x + iy)$। এখন $Z^2 = 1$ সমীকরণের জন্য, ধনাত্মক বাস্তব অংশ বিশিষ্ট $(x > 0)$ জটিলতলের সমস্ত বিন্দু $Z = +1$ সমাধানের দিকে আকর্ষিত হবে আর ঋণাত্মক বাস্তব অংশ বিশিষ্ট সমস্ত বিন্দু যাবে
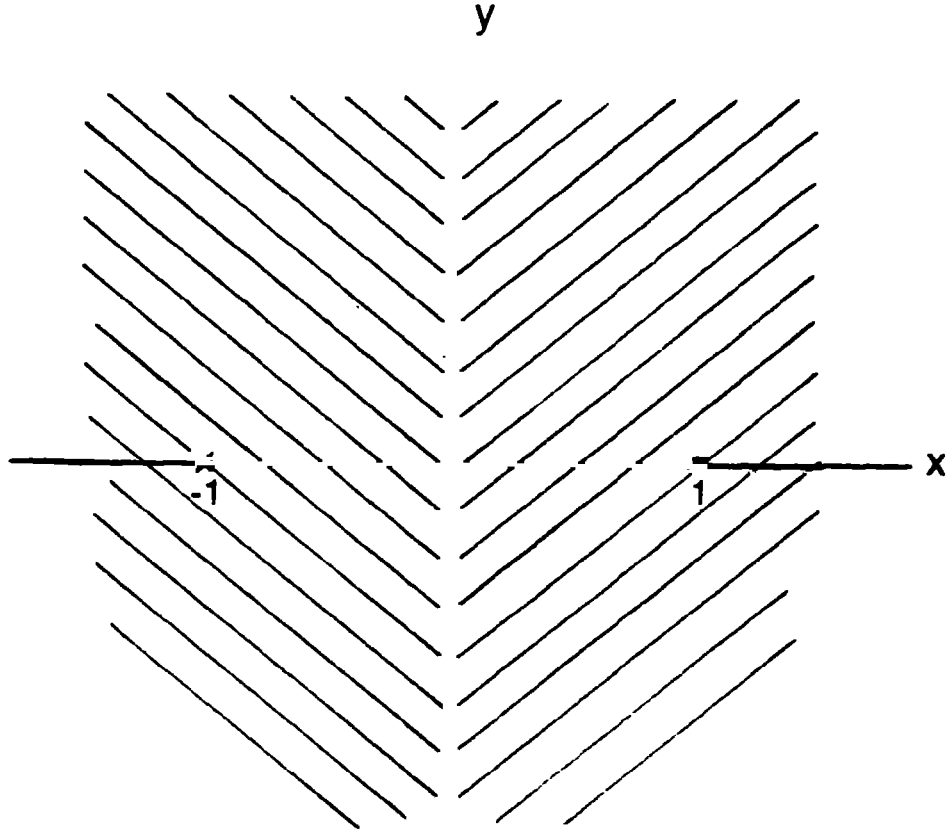
চিত্র 13·11 নিউটনের পদ্ধতিতে $Z^2 = 1$ সমীকরণ সমাধানে $Z = \pm 1$ আকর্ষকের অববাহিকা।

$Z = -1$ সমাধানের দিকে। ফলে এই সমীকরণের জন্য সমগ্র জটিল তলটি পরিষ্কারভাবে দুটি অববাহিকায় ভেঙে গেল, $Z = +1$ এবং $Z = -1$ এই দুই আকর্ষকের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। এই দুই অববাহিকার বিভাজন রেখা হ'ল $x = 0$ রেখা অর্থাৎ y অক্ষ।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে $Z^3 = 1$ সমীকরণের সমাধান বের করতে গেলে তখন আর ব্যাপারটা এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না। এক্ষেত্রেও আমরা সমাধানটা জানি, তিনটি সমাধান হ'ল 1 এবং $(-1 \pm i\sqrt{3}) / 2$; এই তিনটি বিন্দুই এক্ষেত্রে আকর্ষক। কিন্তু অববাহিকা তিনটে কিরকম? আগের উদাহরণের সূত্র ধরে আমরা ভাবতে পারি এবারও হয়ত জটিল-তল সমান তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। কিন্তু আদৌ তা হয় না। কোন একটি সমাধানের নিকটবর্তী অঞ্চলে নিউটনীয় পুনরাবৃত্তি বিন্দুগুলিকে আকর্ষকের দিকে নিয়ে যায় ঠিকই কিন্তু অববাহিকার বিভাজন রেখার ওপরে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে থাকে। দেখা যায় যে অববাহিকাগুলি পাশাপাশি পরিষ্কারভাবে সাজানো নেই। যদি একটা বিন্দু প্রথম আকর্ষকের দিকে যায় এবং তার পার্শ্ববর্তী আরেকটা বিন্দু যায় দ্বিতীয় আকর্ষকের দিকে তাহলে সব সময়েই তাদের মধ্যবর্তী আরেকটি বিন্দু পাওয়া যায় পুনরাবৃত্তির ফলে যেটি সমাপতিত হয় তৃতীয় আকর্ষকে। যত ক্ষুদ্র অংশে গিয়েই পুনরাবৃত্তি করা যাক, ব্যাপারটা এরকমই ঘটে। এরকম অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতেই

চিত্র 13·12 নিউটনের পদ্ধতিতে $Z^3 = 1$ সমীকরণ সমাধানে প্রাপ্ত ফ্র্যাকটাল সীমারেখা।
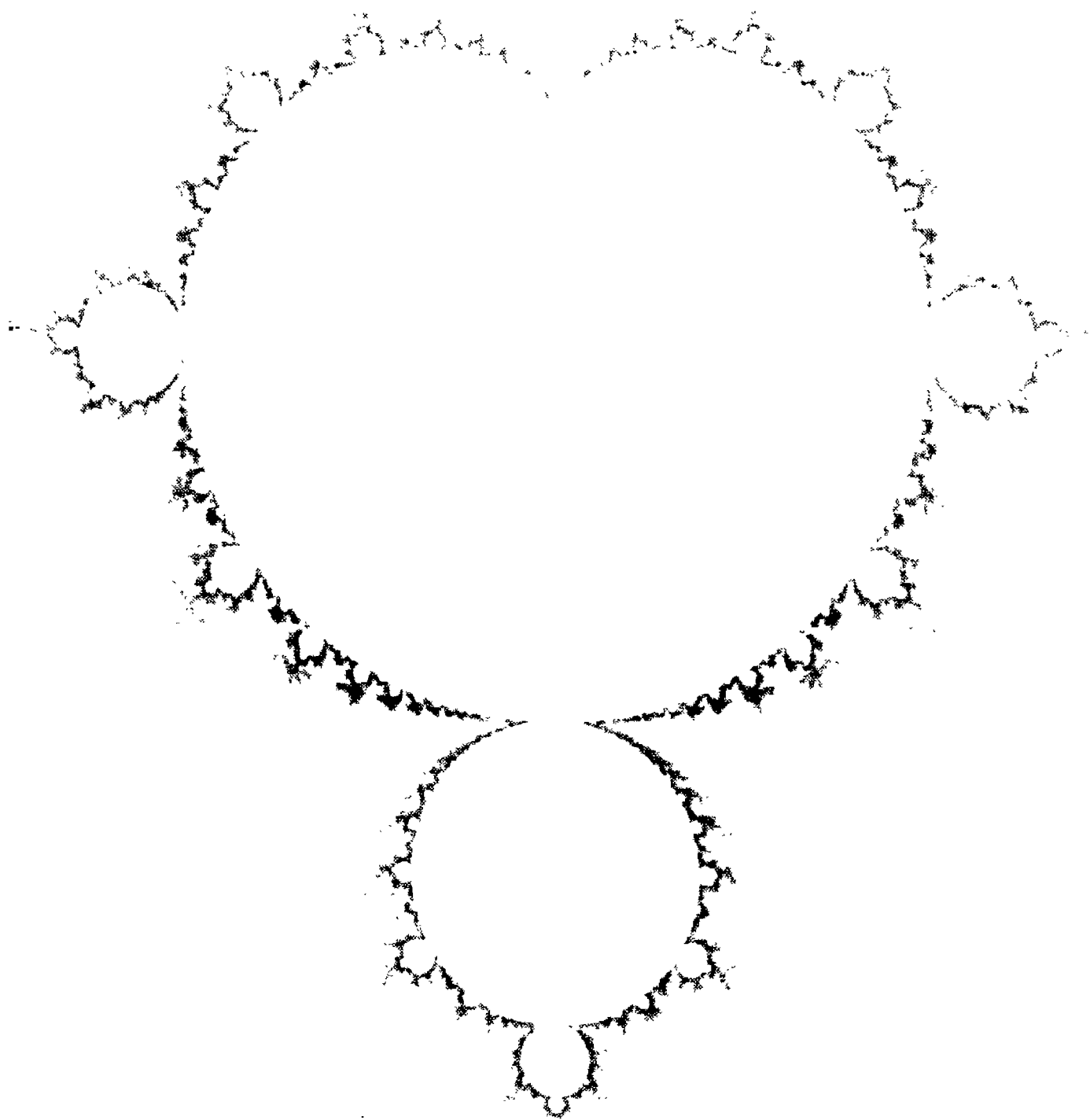
চিত্র 13·13 ম্যানডেলব্রট সেট।

পারে না যদি দুটো অববাহিকার বিভাজন একটা সাধারণ নিরবচ্ছিন্ন রেখা বরাবর হয়। ঐ বিভাজক হ'ল কতগুলো বিচ্ছিন্ন বিন্দুর সমষ্টি, যারা চরিত্রে ফ্র্যাকটাল এবং যে সেট তারা তৈরি করে তাকে 'জুলিয়া সেট' বলা হয়।

ফ্র্যাকটাল বিষয়ে সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত বস্তু হ'ল ম্যান্ডেলব্রট সেট। ফ্র্যাকটালের পৃথিবী জোড়া পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তার জন্য ম্যান্ডেলব্রট সেটের নান্দনিক সৌন্দর্য অনেকাংশেই দায়ী। এই সেটটিও একটি অতি সরল সূত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে সৃষ্টি করা হয় : $Z = Z^2 + C$ যেখানে, C একটি জটিল সংখ্যা; সেটি ঐ সেটের অংশ কি না সেটা পরীক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা ডান দিকে $Z = 0$ নিয়ে শুরু করি এবং প্রথম পদক্ষেপে পাই $Z = C$। এরপরের আবৃত্তি দেয় $Z = C^2 + C$, ইত্যাদি। যদি বারংবার আবৃত্তির ফলে বিন্দুটি ক্রমশ মূলবিন্দু ($Z = 0$) থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেটি ম্যান্ডেলব্রট সেটের অঙ্গীভূত নয়। অপর পক্ষে পুনরাবৃত্তির ফলে যদি বিন্দুটি $Z = 0$-এর পার্শ্ববর্তী একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় তাহলে বোঝা যাবে C সেটের অংশ। সেটের চিত্রে একটা কেন্দ্রীয় 'দ্বীপ'-এর চারপাশে অনেকগুলি 'চাকতি' দেখা যায়। সেটের অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলোর একটা রঙ এবং বাইরের বিন্দুগুলির অন্য রঙ দেওয়া হ'লে আশ্চর্য সুন্দর নকশা তৈরি হ'তে দেখা যায়। তার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম, চিকণ কারুকার্য চোখে পড়ে। এই সেট যথার্থ স্ব-সদৃশ নয়—বিবর্ধিত করলে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশকে মোটামুটিভাবে সমগ্রের অনুরূপই দেখায় কিন্তু প্রতি স্তরেই কিছু কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে। এই সেটে অন্তর্নিহিত বিন্যাসের জটিলতা এবং বৈচিত্র্য সত্যিই বিস্ময়কর।

গণিতের ফ্র্যাকটাল আকৃতির সঙ্গে যখন সুনির্বাচিত, শৈল্পিক রঙ যুক্ত হয় তখন তৈরি হয় ফ্র্যাকটাল চিত্রাবলী যার নান্দনিক আবেদন অপ্রতিরোধ্য। বই, ক্যালেন্ডার এবং আরও বেশি করে সিনেমার মাধ্যমে এই চিত্রাবলী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে, জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। মানব-কৃষ্টির এ এক অতি বিরল উদাহরণ যেখানে বিশুদ্ধ গণিত এবং শিল্পবোধের এক সার্থক মেলবন্ধন ঘটেছে।

প্রধানতঃ নির্দেশিকার 9 এবং 18 নং পুস্তক দ্রষ্টব্য; সঙ্গে 8 এবং 21 নং দেখা যেতে পারে।

স্ব-সংগঠন

চোদ্দ

তাপগতিবিদ্যায় সময়ের অভিমুখ

নিউটনীয় গতিবিদ্যায় 'সময়' কোন বিশেষ দিকে প্রবাহিত হয় না। অর্থাৎ নিউটনীয় সূত্রাবলী নিজের থেকে অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তারা যে ঘটনাবলী বিবৃত করে সেগুলো সময়ের উল্টো দিকেও ঘটতে পারত— বিপরীতগামিতা (reversibility) তাদের ধর্ম। একটি সরল দোলকের আন্দোলন এই ধরনের গতির উদাহরণ। ঐ দোলনের ফিল্ম তুলে যদি সেটাকে উল্টোদিকে চালানো যায় তাহলে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়বে না। দোলকটির প্রতিমুহূর্তের গতিবেগের দিক উল্টে যাবে। প্রকৃতগতিতে যেটা ছিল 'ভবিষ্যত' সেটা এখন হয়ে যাবে 'অতীত', আর 'অতীত' পরিণত হবে 'ভবিষ্যতে'। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফিল্মে দোলকটিকে যেভাবে দুলতে দেখা যাবে বাস্তবক্ষেত্রে সেভাবে দুলতে তার কোন বাধা নেই। এরকম হ'তেই পারত। আরও অনেক উদাহরণ বের করা যায় যেখানে এইরকম সময়ের অভিমুখ উল্টে দিলেও 'অসম্ভব' কিছু ঘটে না। যেমন, একটি বালকের ছোড়া বল কিছু দূরে দাঁড়ানো আরেকটি বালকের হাতে গিয়ে পড়ল। এখন, এর উল্টোটাও ঘটতে পারে—বলটা দ্বিতীয় বালকের হাত থেকে রওয়ানা হয়ে ঐ একই পথ ধরে প্রথম বালকের হাতে এসে পড়তে পারে। সময়ের অভিমুখ উল্টে দিলেও অপরিবর্তিত থাকার এই ধর্ম শুধু নিউটনীয় বলবিদ্যার সূত্রগুলিরই আছে তা নয়—বলবিদ্যার ক্ষেত্রের বাইরেও বহু জায়গায় এই নীতি প্রযোজ্য। তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র সংক্রান্ত ম্যাক্সওয়েলের সূত্রে এই নিয়ম খাটে। অণু-পরমাণুর জগতে যদিও নিউটনীয় বলবিদ্যা কাজ করে না—সেখানে একদম নতুন 'কোয়ান্টাম' বলবিদ্যা কার্যকর—কিন্তু সময়ের বিপরীতধর্মিতা সেখানেও ক্রিয়াশীল। ফলে, দেখা যাচ্ছে, পদার্থবিদ্যার মূল সূত্রগুলি অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে না। (মৌলিক কণার রূপান্তরের কতগুলো ক্ষেত্রে অবশ্য এই অপরিবর্তনীয়তা বজায় থাকে না; কিন্তু বড় মাপের বস্তুর জগতে তার কোন প্রভাব নেই।)

কথাটা যাঁরা নতুন শুনছেন তাঁরা সম্ভবত চমকে যাবেন। সময় সম্বন্ধে আমাদের মৌলিক বোধের সঙ্গে এই ধারণা খাপ খায় না। অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে বয়ে চলেছে সময়ের একমুখী প্রবাহ—আমাদের চৈতন্যের গভীরে এই ধারণাটাই প্রোথিত। অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের তফাত আমাদের চেতনায় এত স্পষ্ট, অথচ পদার্থবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি এই তফাতটাকে স্বীকারই করে না—এটা বিশ্বাস করাও শক্ত। কিন্তু জড়-জগতের ঘটনার অভিঘাতেই যদি আমাদের চেতনা রূপ পেয়ে থাকে তাহলে সেই জগতে অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে সক্ষম এরকম ঘটনাও নিশ্চই দেখা যাবে—এমন সব ঘটনা যেগুলোর পক্ষে সময়ের সাপেক্ষে বিপরীতগামী হওয়া সম্ভব নয়।
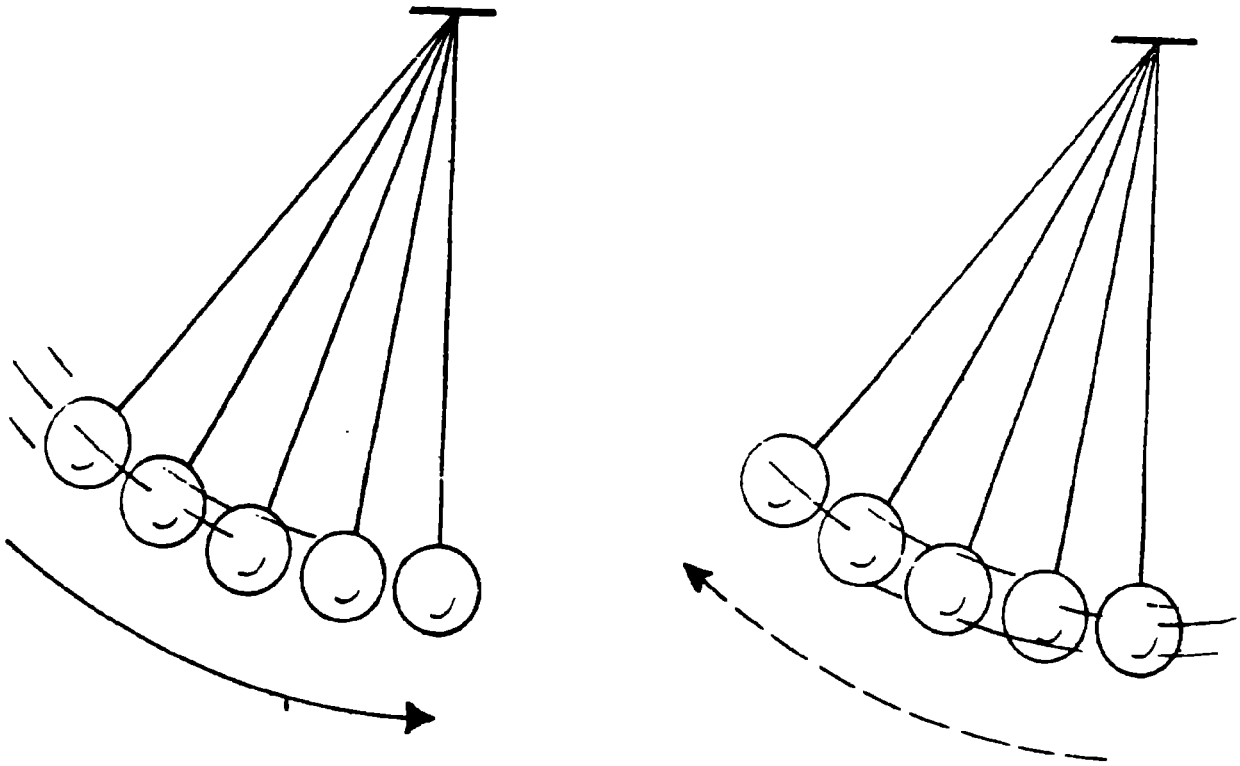
চিত্র 14·1 বাধাহীন দোলকের গতি উল্টে দেওয়া সম্ভব। ঐ গতির চলচ্চিত্র তুলে সেটাকে উল্টো করে চালালে যা দেখা যাবে সেটা অদ্ভুত কিছু নয়—সেটাও দোলকের সম্ভাব্য গতির একটা।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে আমাদের আশেপাশে এরকম একমুখী (irreversible) ঘটনা অহরহই ঘটে চলেছে। টেবিলের ধার থেকে একটা ডিশ মাটিতে পড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে গেল। কিছুটা শব্দ উৎপন্ন হ'ল—সেটা শেষ অবধি দেওয়াল ইত্যাদিতে শোষিত হয়ে গেল। ভাঙা টুক্‌রো এবং মাটিতে কিছুটা তাপশক্তিরও সৃষ্টি হ'ল। এই ঘটনাটার ফিল্ম তুলে যদি সেটাকে উল্টো দিকে চালানো হয় তাহলে একেবারে অসম্ভব একটা জিনিস ঘটতে দেখা যাবে। ডিশের ভাঙা টুকরোগুলো নিজে নিজে একত্র হয়ে, জোড়া লেগে, আস্ত ডিশটা লাফ মেরে

টেবিলের ওপর উঠে পড়ল। পশ্চাৎমুখী সময়ে ঘটনাটার যা চেহারা দাঁড়ায় তাতে শক্তির নিত্যতা সূত্র হয়ত পালিত হয় (মাটি যে তাপ নিয়েছিল সেটা আবার ফেরত দিতে পারে)—কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটতে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। ডিশ পড়ে ভেঙে যাওয়ার ঘটনাটা একমুখী—ঘটনার অতীত এবং ভবিষ্যত সুনির্দিষ্ট—ও দুটোকে পাল্টাপাল্টি করা যায় না। ঘটনাটি সম্মুখগামী সময়ের দিকনির্দেশ বহন করছে।
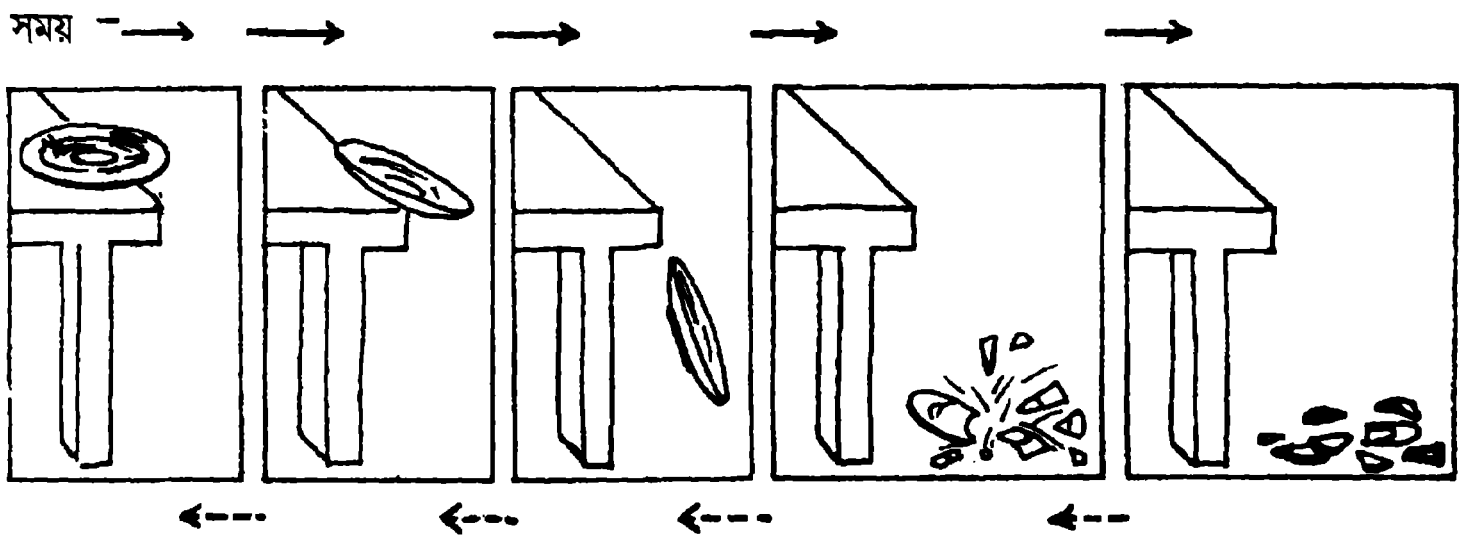
চিত্র 14·2. টেবিলের ধার থেকে পড়ে একটা ডিশের ভেঙে যাওয়া এবং কিছু তাপ সৃষ্টি করা—একটি একমুখী প্রক্রিয়া। ভাঙা ভাঙা তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো এর উল্টো প্রক্রিয়া নিজে থেকে ঘটা অসম্ভব

প্রকৃতিতে যত ঘটনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে তার অধিকাংশই এইরকম একমুখী। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে অসাবধানতা বশত কিছুটা গ্যাস 'লিক' করে বেরিয়ে গেলে সেটার গন্ধ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় অর্থাৎ গ্যাসটা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর উল্টো ঘটা—অর্থাৎ ঘরে ছড়িয়ে পড়া গ্যাসের অণুগুলোর পক্ষে নিজে নিজে সিলিন্ডারের ছিদ্রের মুখে জড়ো হয়ে আপনা থেকেই তার মধ্যে ঢুকে পড়া একেবারেই অসম্ভব। ব্যাপন (diffusion) বা শক্তির অবক্ষয় (dissipation) যেসব প্রক্রিয়ার অঙ্গ তারা একমুখী হয়ে থাকে। সরল দোলকে গতিও বায়ুর সান্দ্রতা, আলম্ব বিন্দুর ঘর্ষণ বা অন্য কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত এবং অবক্ষয়ী হ'লেই তা একমুখী হয়ে পড়ে—তার বিপরীতগামিতা নষ্ট হয়ে যায়। বাধাপ্রাপ্ত দোলক নিজের শক্তি খুইয়ে শেষ অবধি স্থির হয়ে যায়—তার গতিশক্তি তাপের আকারে পরিপার্শ্বে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু একটি স্থির দোলককে পরিপার্শ্ব থেকে তাপের

যোগান দেওয়ায় সেটি দুলতে শুরু করল—এমন কখনোই দেখা যায় না। প্রকৃতিতে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই শক্তির অবক্ষয় ঘটে থাকে তাই অধিকাংশ ঘটনাই একমুখী। খুব নির্বাচিত কিছু ক্ষেত্রে বিপরীতগামিতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। সেগুলো ব্যতিক্রম।

কালপ্রবাহের দিক নিয়ে, দেখা যাচ্ছে, একটা তাত্ত্বিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রে সময়ের অভিমুখ নিয়ে কিছু বলা নেই অথচ যে বস্তুজগতে সেই নিয়ম প্রযোজ্য সেখানে সময়ের প্রবাহ নিশ্চিত রূপেই একমুখী। এই দ্বন্দ্বের নিরসন কোথায়? এ নিয়ে বহু বিজ্ঞানী চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং এখনো করে চলেছেন। এ বিষয়ে শেষ কথা বলার সময় আজও আসেনি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় লুড্‌ভিস বোলট্‌সমানের অন্তর্দৃষ্টি এ ব্যাপারে আলোকপাত করে এবং তার ফলে 'সংখ্যায়ন-ভিত্তিক বলবিদ্যা' (Statistical Mechanics) নামক একটি নতুন বিষয়ের জন্ম হয়।

একটা সহজ উদাহরণের সাহায্যে বোলট্‌সমানের বক্তব্য বোঝা যেতে পারে। কোন লাইব্রেরীতে, মনে করা যাক, বই একটা নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে সাজানো আছে। পাঠকেরা অগোছালো, বই উল্টোপাল্টা করে রাখেন। ফলে দিনের শেষে লাইব্রেরীর বইগুলো একদম এলোমেলো করে তাকে রাখা থাকে। যা সুবিন্যস্ত ছিল তা পুরোপুরি অবিন্যস্ত হয়ে যায়। এলোমেলো হয়ে যাওয়ার এই পদ্ধতিটা একমুখী। যদি লাইব্রেরী পাঠকদের হাতেই ছাড়া থাকে, লাইব্রেরীয়ান বই গোছানোর জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা না নেন, তাহলে বইগুলো একদম প্রথমে যে নির্দিষ্ট ক্রমে সাজানো ছিল ঠিক সেই অবস্থায় আপনা থেকে ফিরে যাবে না কখনোই।

এখন, অবিন্যস্ত অবস্থার একটা বিশেষ রূপ বিবেচনা করা যাক। ধরা যাক 147 নম্বর বই রয়েছে প্রথমের জন্য নির্দিষ্ট খোপে, 43 নম্বর বই আছে দ্বিতীয় খোপে, 59 নম্বর তৃতীয় স্থানে ইত্যাদি। পুস্তক বিন্যাসের প্রাথমিক অবস্থা থেকে এই বিশেষ অবস্থায় আসার সম্ভাবনা (probability) কি? উত্তরটা হ'ল এই যে প্রথম অবস্থা থেকে এই অবস্থায় আসার সম্ভাবনা যা, এই অবস্থা থেকে প্রাথমিক বিন্যাসে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাও ঠিক তাই। দুটোরই সাংখ্য মান খুব ছোট এবং তারা সমান। যে নিয়মে বই এলোমেলো হয়ে যায় তার কোন একটা বিশেষ সজ্জা বা বিন্যাসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই। বই যদি পুরোপুরি এলোমেলোভাবে (random) মিশে যায় তাহলে যতরকম সজ্জা ভাবা যায় তার প্রত্যেকটিই সম-সম্ভব। অর্থাৎ সেই প্রথমের সুবিন্যস্ত সজ্জাটি পাওয়ার সম্ভাবনা যা, কোন বিশেষ একটি অবিন্যস্ত সজ্জাকে পাওয়ার সম্ভাবনাও ঠিক তাই। কিন্তু তাহলে আমরা জিনিসকে সর্বদা সুবিন্যস্ত থেকে অবিন্যস্ত অবস্থায় চলে যেতে দেখি কেন? কেন দেখিনা যে কতগুলো এলোমেলো বই যথেচ্ছ নাড়াচাড়ার ফলে নিজে থেকেই সুবিন্যস্ত হয়ে উঠলো? এই পদ্ধতিটা একমুখী কেন? এর কারণ হ'ল এই যে সম্ভাব্য বহু সংখ্যক

সজ্জার মধ্যে মাত্র একটিকে আমরা "সুবিন্যস্ত" আখ্যা দিয়েছি—বাকি সবগুলোকে বলছি অবিন্যস্ত।

এইভাবে দেখলে একমুখিনতা বা বিপরীতগামিতার অভাব আসলে দেখার ভুল! (আইনস্টাইনও একবার এরকম মন্তব্য করেছিলেন।) বই ঘেঁটে যাওয়ার নিয়মটার মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন একমুখিনতা নেই। আমরা ঘটনাটা মূল স্তরে কিভাবে ঘটছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার না করে বাইরে থেকে সবটা মিলিয়ে কি দাঁড়ালো সেটা দেখছি বলে ঐ রকম মনে হচ্ছে। বড় মাপে যেটাকে একমুখী মনে হচ্ছে আসলে সেটা ছোট মাপে বহু সংখ্যক 'অবিন্যস্ত' সজ্জার বাহুল্য—যে সংখ্যাধিক্যের জন্য তাদের মধ্যে কাউকে পাওয়ার সম্ভাবনা 'একটি মাত্র' সুবিন্যস্ত সজ্জাকে পাওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে বড় মাপে, (macroscopically) সবটা মিলিয়ে মনে হচ্ছে যে সিস্টেম যেন সর্বদাই "সাজানো গোছানো" থেকে "এলোমেলো"-র দিকে চলে যেতে চাইছে—তার বিবর্তন একমুখী। অথচ মূলস্তরে (microscopically) পদার্থবিদ্যার নিয়ামক সূত্রগুলিতে কোন একমুখী প্রবণতা নেই।

ডিশ ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাওয়ার ঘটনাকেও আমরা এই দৃষ্টিতে দেখতে পারি। ভাঙা ডিশের টুকরোগুলোর সম্ভাব্য সব রকমের বিন্যাসের কথা এক্ষেত্রে ভাবতে হবে—লাইব্রেরীর বইয়ের জায়গায়। ঐ টুক্‌রোগুলো একটা মাত্র বিশেষ সজ্জা ক্রমে যুক্ত হয়ে 'আস্ত' ডিশটা তৈরি করে—এটা তৈরির আর কোন দ্বিতীয় উপায় নেই। কিন্তু 'ভাঙা ডিশ' বলতে কোন একটা বিশেষ সজ্জা বোঝায় না—টুক্‌রোগুলোর সম্ভাব্য সব রকম বিন্যাসের প্রত্যেকটিই 'ভাঙা ডিশ'। আর ডিশ ভাঙার উপায় অসংখ্য! (প্রত্যেক বাচ্চা এবং তাদের মায়েরাও এই কথাটা খুব ভালোভাবে জানেন।) তাই, ভাঙা টুক্‌রোগুলোকে অসংখ্যরকমে সাজিয়ে 'ভাঙা ডিশ' তৈরি করা সম্ভব; আস্ত ডিশের একটিমাত্র সজ্জা থেকে ঐ বহুসংখ্যক সজ্জার কোন একটিতে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। তুলনায় "আস্ত" ডিশের একক সজ্জায় ফিরে আসার সম্ভাবনা নগণ্য।

এই ধারণাটাকে এবার আরও সুসংবদ্ধ বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যক্ত করা যেতে পারে। টুক্‌রোগুলোর কথা না ভেবে আমরা ডিশের উপাদানের অণুর কথা ভাবতে পারি। সমস্ত অণুর অবস্থান এবং গতিবেগ নির্দিষ্ট করে দিলে বস্তুটির সূক্ষ্ম বা মাইক্রো (micro) স্তরের গঠন বর্ণিত হয়। কিন্তু আমরা যেটা চোখে দেখতে পাই সেটা বস্তুটির স্থূল অর্থাৎ ম্যাক্রো (macro) স্তরের রূপ। 'আস্ত' বা 'ভাঙা'—এগুলো স্থূল-রূপেরই বর্ণনা। বস্তুর মাইক্রো-স্তরের বিন্যাস আলাদা আলাদা হয়েও তার স্থূল-রূপটা একই হ'তে পারে অর্থাৎ প্রত্যেক স্থূল-রূপের পেছনে অসংখ্য সম্ভাব্য মাইক্রো-বিন্যাস বিদ্যমান। প্রত্যেক রকমের মাইক্রো-বিন্যাস সম-সম্ভব;

চিত্র 14·3 পাঠকরা লাইব্রেরীর বই এলোমেলো, অবিন্যস্ত করে দিয়েছেন। এলোমেলো হয়ে যাওয়ার নিয়মের কোন বিশেষ অবস্থার প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই। বিন্যস্ত থেকে অবিন্যস্ত অবস্থায় যাবার সম্ভাবনা বেশি কারণ মাত্র একটা সজ্জাকে বিন্যস্ত বলা হয়, অবিন্যস্ত বিন্যাস বহুসংখ্যক।

তাদের কোন একটা স্তর থেকে অন্যটায় যাওয়া এবং ফিরে আসা দুটোই সমান তালে ঘটতে পারে। কিন্তু সুবিন্যস্ত 'আস্ত' ডিশের জন্য যতগুলো সম্ভাব্য মাইক্রো-বিন্যাস পাওয়া যাবে অবিন্যস্ত সব রকমের ভাঙা ডিশের জন্য পাওয়া যাবে তার থেকে অনেক অনেক বেশি সংখ্যক মাইক্রো-বিন্যাস। ফলে সুবিন্যস্ত অবস্থা থেকে অবিন্যস্ত অবস্থায় চলে আসার সম্ভাব্যতা বেশি, সেটা অনেক সহজ; উল্টোটা ঘটা তুলনায় অনেক বেশি কঠিন। তাই, অণুগুলির গতির নিয়মে একমুখী কিছু নেই। ম্যাক্রো-স্তরে সেটার উৎপত্তি হয় এই জন্য যে সীমিত সংখ্যক অবস্থাকে সুবিন্যস্ত বলা হয়—অবিন্যস্ত অবস্থার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না।

বোলট্‌সমান চিত্রে আসার আগে, উনবিংশ শতাব্দীতেই পদার্থবিজ্ঞানে একটি অদ্ভুত কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী ধারণার জন্ম হয়েছিল, যার নাম—এনট্রপি। তাপশক্তি পরিচালিত ইঞ্জিনের কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েই এই ধারণাটির জন্ম হয়। কিন্তু সাধারণভাবে যে কোন সিস্টেমের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য বলে দেখা গেল। তাপ সংক্রান্ত আলোচনায় শক্তি, চাপ, তাপমাত্রা বা আয়তনের মত আর পাঁচটা সাধারণ ও পরিচিত রাশির সঙ্গে এনট্রপির ধারণার প্রভেদ রয়েছে। কিন্তু বোঝা গেল যে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিবিড়। যান্ত্রিক কাজ এবং তাপ—শক্তির এই দুই রূপের মূলগত প্রভেদের দিকে ঐ দ্বিতীয় সূত্র অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং বলে যে ইঞ্জিনের চক্রাকার গতির সাহায্যে কখনোই কিছু পরিমাণ তাপকে পুরোপুরি কার্যে পরিণত করা যাবে না। এনট্রপির ভিত্তিতে দ্বিতীয় সূত্রের বিবৃতি এইরকম : কোন বিচ্ছিন্ন সিস্টেমের এনট্রপি ক্রমাগত বাড়তে থাকে যতক্ষণ না তার মান বৃহত্তম হয়। সমস্ত স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক ঘটনায় এনট্রপি বাড়ে। একটা গ্যাস যখন কোন ঘরের কোণা থেকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখন তার এনট্রপি বৃদ্ধি পায়; সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়লে এনট্রপি বৃহত্তম মানে পৌঁছয়।

খুব কার্যকর ধারণা হওয়া সত্ত্বেও এনট্রপি বলতে ঠিক কি বোঝায় সেটা প্রায় কেউই স্পষ্ট করে বুঝতেন না—ফলে একটা বন্ধ বাক্সের মত (black box) সেটার ভেতরে কি আছে না জেনেও ধারণাটাকে কাজে লাগানো হ'তো। সিস্টেম কতটা এলোমেলো (disordered) তার একটা আন্দাজ এনট্রপি থেকে পাওয়া সম্ভব—এরকম ধারণার চল ছিল। এ ব্যাপারে সত্যিকারের বড় পদক্ষেপ নিলেন বোলট্‌সমান : তিনি ঐ এলোমেলো অব্যবস্থার মাত্রা পরিমাপের একটা উপায় নির্দেশ করলেন, বললেন—প্রদত্ত ম্যাক্রো-রূপের পেছনে সম্ভাব্য মাইক্রো-বিন্যাসের সংখ্যাই (Ω বা ওমেগা) এর পরিমাপ। অব্যবস্থার নির্দেশক এনট্রপি (S); দুটো সিস্টেম যুক্ত হলে তাদের স্বতন্ত্র এনট্রপির যোগফল নতুন সিস্টেমের এনট্রপির সমান হয়। এই ধর্ম বজায় রাখার জন্য এনট্রপিকে 'ওমেগা'র লগারিদম্ হিসেবে প্রকাশ করা হ'ল : $S = k \log \Omega$; মৌলিকত্বের বিচারে এটি বিজ্ঞানে আজ অবধি আবিষ্কৃত সর্বোত্তম সূত্রগুলির একটি।
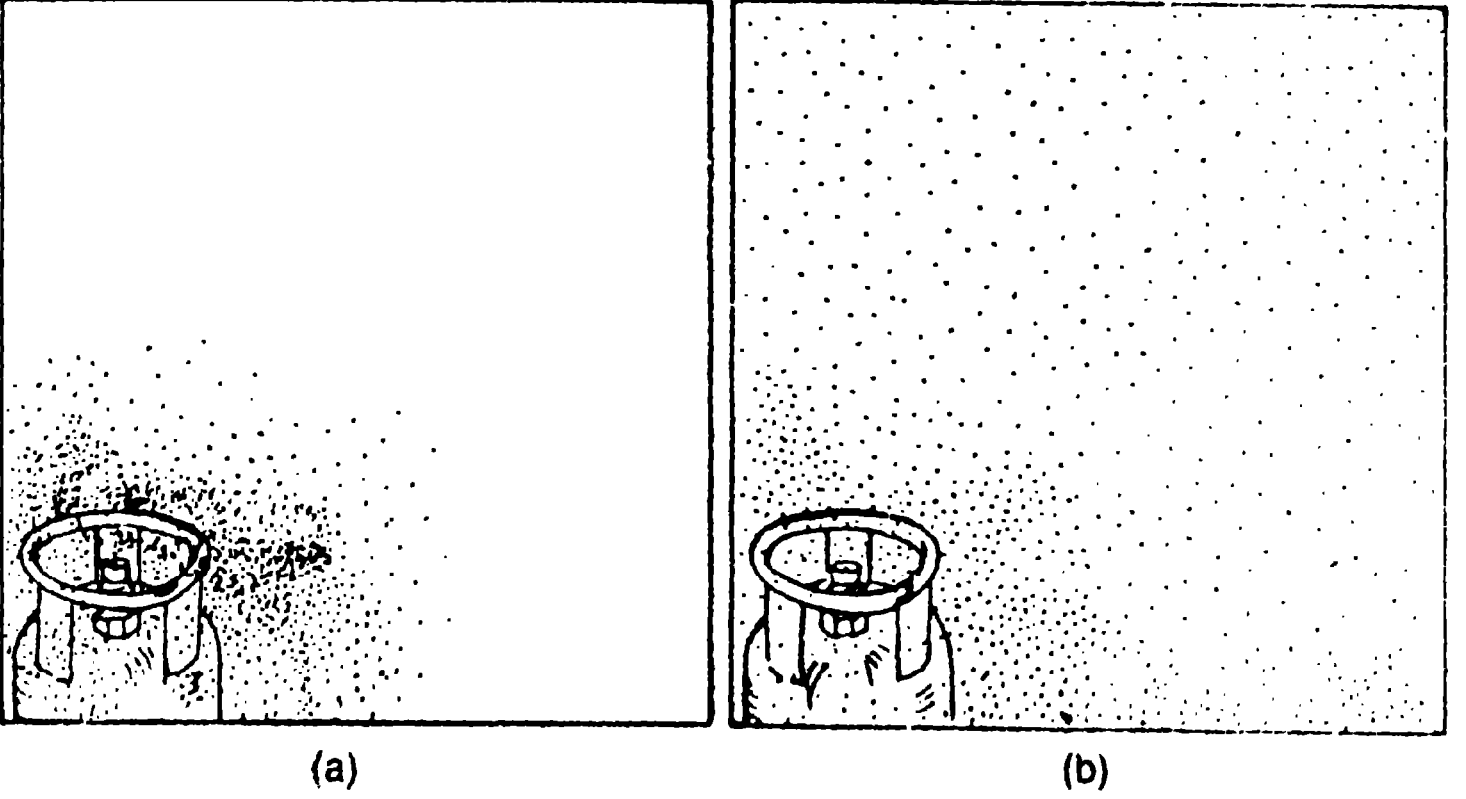
চিত্র 14·4 রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার থেকে লিক্ করে বেরিয়ে ঘর ভরে ফেলে। (b) তে গ্যাসের এনট্রপি (a)-র চেয়ে বেশি। একমুখী পরিবর্তনে এনট্রপি বাড়ে।

এনট্রপির বৃদ্ধি কোন দিকে হবে তাই ঠিক করে দিচ্ছে প্রকৃতিতে একমুখী পরিবর্তনের দিক এবং তাপগতিবিদ্যায় সময়ের অভিমুখ। এই অভিমুখ কম থেকে বেশি এনট্রপির দিকে, অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে। (বিচ্ছিন্ন সিস্টেমের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির নিয়ম প্রযোজ্য।) সমগ্র বিশ্বকে একটি বিচ্ছিন্ন সিস্টেম রূপে কল্পনা করা যায়। অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতে যাওয়ার বিবর্তনে বিশ্বের এনট্রপি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আরও বেশি অবিন্যস্ত হয়ে উঠছে বিশ্ব। শক্তির সবচেয়ে বেশি অবিন্যস্ত রূপের প্রকাশ তাপশক্তিতে। বিশ্বে অন্য নানা প্রকারের যে শক্তি অপেক্ষাকৃত কম অবিন্যস্ত রূপে সঞ্চিত রয়েছে তা কালক্রমে তাপশক্তিতে পরিণত হবে। অনিবার্যগতিতে বিশ্ব এই পরিণতির দিকেই এগিয়ে চলেছে : অন্তিম পর্যায়ে রয়েছে সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত এক ব্রহ্মাণ্ড যেখানে সব শক্তি তাপে পরিণত হয়ে গেছে! কোন সংগঠন, কোন বিন্যাস আর অবশিষ্ট নেই। বিশ্বের এই তাপময় মৃত্যু (heat-death) অবধারিত—এটাই তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের অমোঘ ভবিষ্যতবাণী।

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে মজবুত নীতিগুলির একটি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিকাশ, আপেক্ষিকতার তত্ত্বের বৈপ্লবিক অভিঘাত—কোন কিছুই একে স্পর্শ করতে পারেনি। এক সময়ে মনে হয়েছিল আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রয়োগের ফলে কৃষ্ণ-গহ্বর (black holes) নামক যে বস্তুর সন্ধান মিলল তাদের অভ্যন্তরে বোধহয় এই নিয়ম খাটবে না। কিন্তু ঘটলো
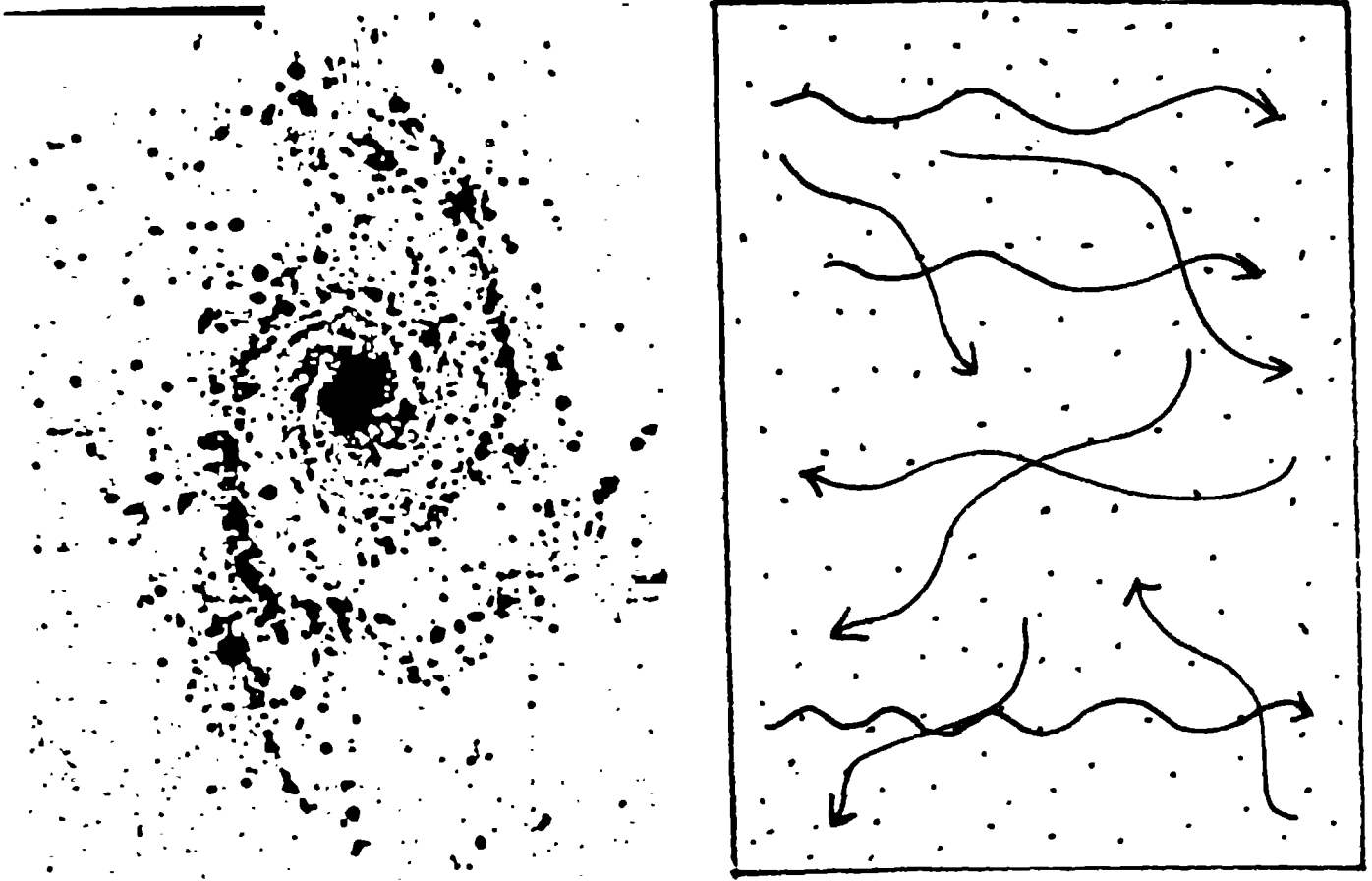
চিত্র 14.5 তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি হ'ল 'তাপ মৃত্যু'— যখন বিশ্ব জড় ও শক্তির এক সমসত্ত্ব নিরাকার মিশ্রণে পর্যবসিত হবে।

ঠিক এর উল্টোটাই। কৃষ্ণ-গহ্বরের গতিবিদ্যা যখন খুঁটিয়ে বিচার করা হ'ল এবং তাতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগে যখন দেখা গেল যে তার থেকে বিকিরণ নির্গত হবে (1974 সনে স্টিফেন হকিং-এর আবিষ্কার) তখন বোঝা গেল যে এক্ষেত্রেও দ্বিতীয় সূত্র মেনেই সব কিছু ঘটছে। এই শতাব্দীর গোড়ায় আর্থার এডিংটন বলেছিলেন যে—এই সূত্রের বিরুদ্ধাচরণ করবে যে তত্ত্ব তার কপালে অপমানজনক পরাজয় ছাড়া কিছুই লেখা নেই। প্রায় সমস্ত পদার্থবিজ্ঞানীই এর সঙ্গে সহমত হবেন—দ্বিতীয় সূত্রের ওপর তাঁদের আস্থা এতই গভীর।

অত্যন্ত সফল এবং প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে অস্বীকার করার সাহস যখন কেউ দেখাতে পারেন তখনই বিজ্ঞানে সত্যিকারের বড় মাপের আবিষ্কারের সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়। কয়েক দশক আগে ইলিয়া প্রিগোজিন (তখন তিনি একজন তরুণ বেলজিয়ান বিজ্ঞানী) এই স্পর্ধা প্রকাশ করেন এবং দ্বিতীয় সূত্র নির্ধারিত সময়ের অভিমুখের এবং তৎসংক্রান্ত তাপ-মৃত্যুর অনিবার্যতাকে অস্বীকার করেন। তিনি বিবর্তন ও সময়ের সম্মুখগতি সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করছেন এবং দেখিয়েছেন যে বহু প্রাকৃতিক ঘটনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। এর ফলে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর এমন কিছু রূপ উন্মোচিত হয়েছে যা আগে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে গিয়েছিল।[1]

[1] নির্দেশিকার 14 নং পুস্তকে এ বিষয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা পাওয়া যাবে।

পনের

সৃষ্টি-অভিমুখী সময়

তাপগতিবিদ্যার সময় সর্বদা বিন্যস্তকে অবিন্যস্ত করে দিতে চায়। কিন্তু প্রকৃতিতে এর উল্টোটাও ঘটে—বহুক্ষেত্রে আপনা থেকে শৃঙ্খলার উদ্ভব হয় এবং বিবর্তনের ফলে সংগঠন ও নিয়মবদ্ধতার জটিলতর রূপ সৃষ্ট হয়। শুরুতে যা সমসত্ত্ব, মসৃণ ছিল কালক্রমে তার মধ্যে জটিল, অসম বিন্যাসের রূপ ফুটে ওঠে। জীবজগতেই এ জাতীয় ঘটনা বেশি ঘটে। স্থূল আকৃতির একটি ভ্রূণ মাত্র নয়মাস সময়ের মধ্যে বিচিত্র ধরনের এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট, সুসংগঠিত একটি মানব শিশুতে পরিণত হয়। প্রায় সব শিশুরই আচরণ সরল এবং এক ধরনের। কিন্তু সেই শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন সে স্বতন্ত্র; সময়ের সাথে তার আচরণ জটিল এবং বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। কোন নবাগত ছাত্র একটি বিষয় সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে আসে তা খুবই অগোছালো; কালক্রমে সেই যখন বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে তখন তার ধারণা বহুমাত্রিক, সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত আকার ধারণ করে। প্রাচীন মানুষের সাদাসিধে বসতি সময়ের সাথে বদলাতে বদলাতে একদিন জটিল যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ আধুনিক শহরে পরিণত হয়। উদাহরণের কোন অভাব নেই।

সময়ের সাথে শৃঙ্খলা ও জটিলতা বৃদ্ধির এই উদাহরণ যে শুধুমাত্র সজীব পদার্থের মধ্যেই পাওয়া যায় তা নয়। সমসত্ত্ব বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তরলে এবং তারপরে কঠিন কেলাসে পরিণত হয়। পাত্রস্থ তরলের নীচের এবং ওপরের তাপমাত্রা যদি বিভিন্ন হয় অর্থাৎ তাকে যদি ঐ ভাবেই উষ্ণ করা হয়—তার মধ্যে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়। তাপমাত্রার প্রভেদের ধরনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ঐ পরিচলন স্রোত নানা বিচিত্র এবং জটিল রূপ ধারণ করতে পারে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সময়ের সাপেক্ষে এবং ত্রিমাত্রিক দেশে আশ্চর্য সব নকশা তৈরি হয়। সৃষ্টির আদিতে মহাবিশ্ব ছিল নিরাকার ক্রমে নক্ষত্রপুঞ্জেরা (Galaxy) আকার পেল—তারও পরে পুঞ্জের মধ্যে একেটি নক্ষত্র ও তাদের ঘিরে গ্রহদের আকার পরিস্ফুট হ'ল।

এই উদাহরণগুলো তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অমান্য করছে বলে মনে হতে পারে। কেননা ঐ সূত্রের প্রভাবে এর উল্টোটাই ঘটা উচিত ছিল যেন—সুবিন্যস্ত আকার থেকে বিন্যাসহীন নিরাকারের দিকে সবকিছুর চলে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে কোন দ্বন্দ্ব নেই। একমাত্র বিচ্ছিন্ন সিস্টেমের ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় সূত্রের ঐ ভবিষ্যতবাণী প্রযোজ্য। ওপরের আলোচনায় একমাত্র শেষের উদাহরণটি ছাড়া আর কোনটিই বিচ্ছিন্ন সংস্থা নয়। জীবন্ত শিশু হয়ে ওঠার পথে মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ সর্বক্ষণই তার পরিপার্শ্ব অর্থাৎ গর্ভের·পরিমণ্ডলের সঙ্গে বস্তু এবং শক্তি দেওয়া নেওয়া করে—সে কোন বিচ্ছিন্ন সংস্থা নয়। বেড়ে ওঠার সময় গাছ মাটি থেকে খাদ্যরস এবং পরিপার্শ্ব থেকে আলোক ও তাপ শক্তি আহরণ করে। যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জটিল নকশা তৈরি হয় তারাও ক্রমাগত বিক্রিয়ারত এবং উপজাত পদার্থ পরিপার্শ্বের সাথে লেনদেন করে। যে বসতি বড় শহর হয়ে গড়ে ওঠার পথে সেখানেও বাইরে থেকে লোকজন, খাবার-দাবার এবং মানুষ এসে প্রবেশ করছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সময়ের সাথে জটিলতর বিন্যাস দেখা দেয় যেসব সিস্টেমে তারা বিচ্ছিন্ন নয়—মুক্ত সিস্টেম (open system)—যারা ক্রমাগত পরিপার্শ্বের সাধে জড় বস্তু এবং শক্তি আদান-প্রদান করে চলেছে। উপযুক্ত পরিস্থিতিতে ঐ জাতীয় মুক্ত সিস্টেমের অতীত থেকে ভবিষ্যতে যাওয়া মানে কম জটিল থেকে বেশি জটিল বিন্যাসের দিকে যাওয়া। ক্রমশ বর্ধিত মাত্রায় সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠা এবং বৈচিত্র্য ও জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়াকেই যদি সৃষ্টির লক্ষণ বলে স্বীকার করা যায় তাহলে প্রকৃতির মুক্ত সিস্টেমগুলির মধ্যে সময়ের অভিমুখকে সৃষ্টিশীল বলে মানতে হবে।

প্রথাগত বিজ্ঞানে অবশ্য এই সৃষ্টি-অভিমুখী সময়ের কোন আলাদা স্বীকৃতি নেই। জটিলতার ধারণা এখনও গুণগত স্তরে থেকে গেছে—তার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় নি। আর এরকম অনির্দিষ্ট ধারণার ভিত্তিতে যদি সময়ের অভিমুখের কোন নতুন সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে বিজ্ঞানীরা সেটাকে সন্দেহের চোখে দেখবেন। অনেকে মনে করেন ঐ জাতীয় নতুন সংজ্ঞার সত্যিই কোন প্রয়োজন নেই—পরিচিত তাপগতিবিদ্যার পরিসরের মধ্যেই প্রাকৃতিক সিস্টেমের জটিলতা বৃদ্ধির ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া সম্ভব কোন বিচ্ছিন্ন সিস্টেমের বা সামগ্রিকভাবে ব্রহ্মাণ্ডের এনট্রপি সময়ের সঙ্গে বাড়তেই থাকবে—দ্বিতীয় সূত্র এটাই বলে। সে কখনোই বলে না যে বিশ্বের কোন এক অংশে এনট্রপি কমতে পারে না। কোন সিস্টেমের এনট্রপি কিছুটা কমে যেতে বাধা নেই যদি তার বাইরের পরিবেশে এনট্রপি তার চেয়েও বেশি করে বেড়ে যায়—অর্থাৎ সিস্টেম এবং তার পরিবেশ এই দুইয়ের মিলিত এনট্রপি বৃদ্ধি পায়। তরল থেকে কঠিনে বা অচুম্বক পদার্থ থেকে চুম্বক পদার্থে রূপান্তরের সময় ঠিক এটাই ঘটে এবং
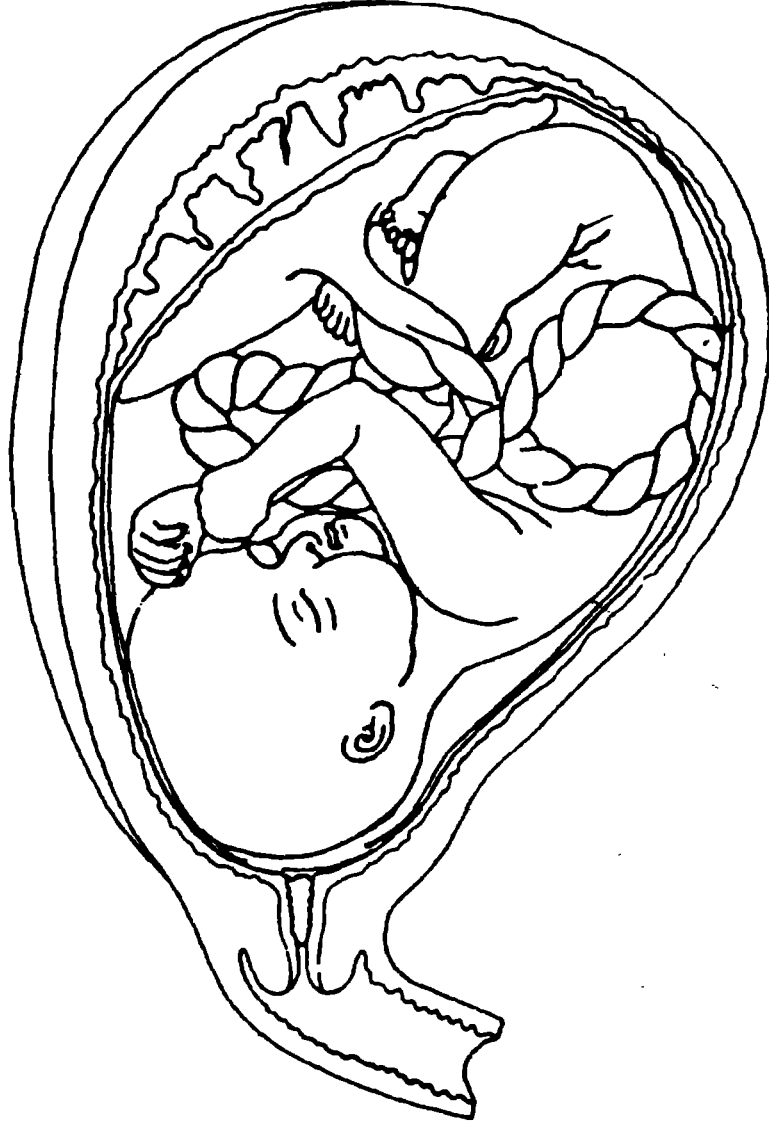
চিত্র 15·1 মাতৃগর্ভে ভ্রূণ একটি মুক্ত, সাম্যচ্যুত সিস্টেম হিসেবে পরিপার্শ্বের সঙ্গে পদার্থ ও শক্তি লেনদেন করে সুবিন্যস্ত ও জটিলতর হয়ে ওঠে। এর মধ্যে সময়ের সৃষ্টিমুখী রূপ প্রকাশিত হয়।

চিরাচরিত তাপগতিবিদ্যার সাহায্যে এইসব অবস্থার রূপান্তরের ব্যাখ্যা সুন্দরভাবেই করা যায়। বিশ্বে কোন এক অংশে সুবিন্যস্ত আকারের সৃষ্টিতে এনট্রপি কমে গেলে তার জন্য নতুন নিয়ম প্রবর্তনের প্রয়োজন নেই।

এই মত অনুসারে সৃষ্টির গোড়ায় বিশ্ব ছিল নিরাকার—সমসত্ত্ব, সমদৈশিক বস্তু ও শক্তির এক সম্প্রসারণশীল মেঘ যার কোন এক অংশকে অন্য অংশের চেয়ে আলাদা করে চিনে নেবার উপায় নেই। অনিয়মিত বিচ্যুতির ফলে কিছু কিছু স্থানের ঘনত্ব 'হঠাৎ করে' বেড়ে যায়। মহাকর্ষ উপস্থিত সর্বত্র এই হঠাৎ বেড়ে যাওয়া ঘনত্ব তার প্রভাবে আরও বাড়তে থাকে যখন আশেপাশের বস্তু কণারাও ঐ দিকে আকর্ষিত হয়। এইভাবে শেষ অবধি বিপুল জড়পিণ্ডের একত্রীভবনের মধ্যে দিয়ে নক্ষত্রপুঞ্জের (Galaxy) সৃষ্টি হয়। আবার তার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ঐ ধরনের একত্রীভবনের মধ্যে দিয়ে নক্ষত্র এবং গ্রহ জন্ম নেয় ফলে দেখা যাচ্ছে—এই মত অনুযায়ী ঘনত্বের আকস্মিক বিচ্যুতি এবং মহাকর্ষীয় আকর্ষণ এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবেই মহাবিশ্বে তার আকার পেয়েছে। এর বাইরে আর কোন বিশেষ নিয়ম কার্যকর ছিলনা। একইভাবে—সমস্ত মুক্ত সিস্টেমের জটিলতা বেড়ে যাওয়ার

কারণও তাদের প্রাথমিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পদার্থবিদ্যার পরিচিত নিয়মের প্রভাবেই সিস্টেম আরও বেশি জটিলতর বিন্যাসের দিকে এগোতে পারে, তার জন্য নতুন কোন মৌলিক নিয়ম প্রবর্তনের প্রয়োজন নেই। সৃষ্টি-অভিমুখী সময়ের ধারণারও দরকার নেই। আকস্মিকতাই বিশ্বে সৃষ্টিশীলতার জন্ম দেয়।

ইলিয়া প্রিগোজিন এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছে যে নিউটনীয় বিজ্ঞানের যান্ত্রিক দর্শন এবং তাপগতিবিদ্যার সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃতিতে সত্যিকারের সৃষ্টিশীল ঘটনাবলীর তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে—তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগও দেয়নি। নিউটনীয় বলবিদ্যায় বর্তমানকে পুরোপুরি জানলে তা থেকে অতীত এবং ভবিষ্যত দুই-ই জানা হয়ে যায়—তাই সেখানে সময়ের কোন ফলপ্রসূ ভূমিকাই নেই; সেটি ঘটনার পারম্পর্য বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত একটি বন্ধ্যা রাশি মাত্র। তাপগতিবিদ্যায় সময়ের ভূমিকা এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই—কিন্তু সেখানেও নিষ্ক্রিয়ভাবে বিশ্বকে চূড়ান্ত অবিন্যস্ত একটা অবস্থায় ঠেলে দেওয়াই যেন তার কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এর চেয়ে ইতিবাচক সৃষ্টিশীল ভূমিকাতেও কিন্তু প্রকৃতিতে সময়কে দেখা যায়—বিভিন্ন মুক্ত সিস্টেমের বিবর্তনে। সময়ের সেই ভূমিকা বিজ্ঞানে উপেক্ষিত থেকে গেছে। তাই প্রিগোজিনের খেদোক্তি—সময় হ'ল প্রকৃতির বিস্মৃত মাত্রা (dimension)।

প্রিগোজিনের মতে এই সৃষ্টি-অভিমুখী সময় প্রকৃতিতে এত জায়গায়, এত বার আত্মপ্রকাশ করে যে তাকে প্রকৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকার না করে উপায় নেই। মুক্ত সংস্থাগুলি যে শুধু জটিল হয় তাই নয়, ক্রমাগত জটিলতর হয়ে ওঠার প্রবণতা তাদের মজ্জাগত। মুক্ত সিস্টেমে জটিলতার বৃদ্ধি দ্বিতীয় সূত্রকে অমান্য করে না—শুধু এটুকু জেনেই পদার্থবিজ্ঞানীরা খুশী। কিন্তু কেন ঐ জটিলতার উদ্ভব ঘটে এবং কেনই বা তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে চায় তার কোন ব্যাখ্যা তাঁরা দেন না। প্রাকৃতিক মুক্ত সিস্টেমগুলি আশ্চর্যরকম মজবুত—জটিল সিস্টেমগুলি যথেষ্ট স্থিতিশীল কেন? প্রাথমিক অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনের তত্ত্ব থেকে তার কোন নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা মেলে না। সৃষ্টিমুখী সময়ের প্রশ্নের সামনে পড়ে পদার্থবিজ্ঞানীরা কোন ভুল উত্তর দেন না—প্রশ্নটি এড়িয়ে যান।

কিন্তু তাহলেও, প্রিগোজিন একজন পেশাদার বিজ্ঞানী—রহস্যবাদী ভাবুক (mystic) নন। কোন পরম-পুরুষ সৃষ্টির তাড়নায় প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করছেন—এ জাতীয় তত্ত্বে তাঁর রুচি নেই। তাপগতিবিদ্যার সময়ের মত একটি বিজ্ঞানসম্মত, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ধারণা হিসেবেই তিনি সৃষ্টি-অভিমুখী সময়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। প্রকৃতিতে, বিশেষত জীবজগতে এই সময়ের প্রকাশ নানা মুক্ত সিস্টেমে অনবরতই দেখা যায়। কিন্তু জীববিজ্ঞান আর পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে ফারাক দুস্তর—জীববিজ্ঞানে যা কিছু সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ পদার্থবিজ্ঞানে

তার প্রায় কোন স্থানই নেই। এই ফাঁকটাকে ভরাট করার চেষ্টা শুরু করেছিলেন প্রিগোজিন—পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের এক ধরনের সংশ্লেষের লক্ষ্যে। সময়ের এই সৃষ্টিশীল অভিমুখকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজন হলে পদার্থবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলিকেও বদলে নিতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়—এমন কি প্রিগোজিনের মাপের একজন বিজ্ঞানীর পক্ষেও কাজটা খুবই বড়। আরব্ধ লক্ষ্যে পৌঁছতে এখনও অনেক বাকি। কিন্তু ঐ সংশ্লেষণের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে গিয়ে তিনি তাপগতিবিদ্যার সাধারণ তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করে তাকে জীবজগতের মুক্ত সিস্টেমে ব্যবহারযোগ্য করে তুললেন। এই কাজ করতে গিয়ে একদম নতুন একটি ধারণার জন্ম দিলেন তিনি, যার নামকরণ করলেন : অবক্ষয়ী বিন্যাস (dissipative structure)। প্রথমে রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, পরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ধরনের বিন্যাসের সন্ধান পাওয়া গেল। এই আবিষ্কারের জন্য 1977 সনে প্রিগোজিনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

ষোল

অবক্ষয়ী বিন্যাস

কোন সিস্টেমের সঙ্গে তার পরিপার্শ্বের শক্তির আদান-প্রদান দুই প্রকারে হতে পারে—তাপ বিনিময় করে কিংবা কার্য লেন-দেন করে। এক কাপ গরম কফি তার আভ্যন্তরীণ শক্তি খোয়ায় আশপাশের বায়ুতে তাপ বর্জন করে। তাপনিরুদ্ধ গ্যাস-ভর্তি সিলিন্ডারের পিস্টনের ওপর বাইরে থেকে কার্য করা হলে গ্যাসের আভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। সিস্টেম বাইরের সঙ্গে জড়বস্তুও দেয়া নেয়া করতে পারে। সচ্ছিদ্র পর্দার একপাশে ঘন হয়ে জমে থাকা গ্যাস 'ব্যাপনের' (diffusion) ফলে অন্য পাশে চলে যায়। পরিপার্শ্বের সঙ্গে শক্তি এবং জড়বস্তু আদান-প্রদানের নিয়মগুলি তাপগতিবিদ্যার আলোচ্য।

সচরাচর, যে সমস্ত সিস্টেম সাম্যে রয়েছে তারাই তাপগতিবিদ্যার বিবেচ্য বিষয়। চাপ, আয়তন, তাপমাত্রা ইত্যাদির মত কয়েকটি সাধারণ রাশির সাহায্যে ঐ জাতীয় সিস্টেমের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। সময়ের সাপেক্ষে এই রাশিগুলির মান বদলায় না। যখন সিস্টেমের পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করা হয় তখন ধরা হয় যে ঐ রাশিগুলি এত ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে যে প্রত্যেক স্তরে তাদের মান সাম্যাবস্থায় পৌঁছে স্থির থাকছে। সিস্টেম একটি সাম্যাবস্থা থেকে নিকটবর্তী সাম্যাবস্থায় যায় অতি ধীরে—তার অবস্থা স্থির না হলেও প্রায় স্থির (Quasi-Static)।

তাপগতিবিদ্যায় প্রকৃত সাম্যাবস্থা একটি বিমূর্ত কল্পনা; বলবিদ্যার বিন্দুভরের মতন। কিন্তু ঐ সরলীকরণের ফলে তত্ত্বের প্রয়োগ সহজসাধ্য হয়েছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিষয়টি বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল—তাপচালিত ইঞ্জিন, রাসায়নিক বিক্রিয়া, অবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল ঐ সময়েই পাওয়া যায়। এনট্রপির প্রাথমিক ধারণাও এই সাম্যাবস্থার তাপগতিবিদ্যারই দান—পরে লুড্‌ভিগ বোল্‌টসমান এই ধারণাকে আরও সম্প্রসারিত করেন। (14 অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) সাম্যাবস্থার নিকটবর্তী কিন্তু ঠিক সাম্যাবস্থায় নয়—এরকম পরিস্থিতির দিকেও বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছিল। যেমন, দুই প্রান্ত

বিভিন্ন তাপমাত্রায় রক্ষিত একটি দণ্ড সাম্যাবস্থায় থাকে না কিন্তু তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের কথা বিচার করলে দেখা যায় তারা সাম্যাবস্থায় থাকে। তাপমাত্রার প্রভেদ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাপের প্রবাহ ঘটায়। স্থিতাবস্থায় তাপের প্রবাহের সঙ্গে তাপমাত্রার প্রভেদের সম্পর্ক "রৈখিক" অর্থাৎ তারা একে অপরের সমানুপাতিক। সাম্যাবস্থার নিকটে প্রবাহ এবং সেই প্রবাহের জন্মদাতা "কারণ" পরস্পর সমানুপাতিক। এই অঞ্চলে তাপগতিবিদ্যা রৈখিক।

সাম্যাবস্থা বা প্রায়-সাম্যাবস্থার তাপগতিবিজ্ঞান প্রয়োগ করে জীবজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকৃতি ও বিন্যাসের উদ্ভব বা কোন জৈবিক-সংস্থার নিজেকে বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই সংগঠিত করে নেওয়ার ক্ষমতার কোন ব্যাখ্যা যোগানো যায় না। যখন সিস্টেম আপনা থেকেই নিজেকে সুশৃঙ্খল, নিয়মানুগ, সুসংবদ্ধ করে গড়ে তুলতে পারে এবং তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হয় তখন সেই গুণকে স্ব-সংগঠন (self-organisation) বলা হয়। সাম্যাবস্থায় কোন সুসংবদ্ধ বিন্যাসের জন্ম হয় না এমন নয়। প্রায়শই হয় : জল জ'মে বরফের সুসংগঠিত কেলাসে পরিণত হয়। তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট মানের নীচে নিয়ে গেলে চৌম্বকপদার্থ চুম্বকে পরিণত হয়—পদার্থের অভ্যন্তরে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বক কণিকারা এলোমেলো অবস্থা থেকে সারিবদ্ধ ভাবে একটা বিশেষ দিকে মুখ করে দাঁড়ায় এবং জোরালো চুম্বক-ধর্ম প্রকাশ পায়। সাধারণ তড়িৎ-পরিবাহীকে খুব ঠাণ্ডা করলে তার মধ্যে অতি পরিবাহিতার ধর্ম দেখা যায়। নিম্ন তাপমাত্রায় পরিবাহীর ইলেকট্রনগুলি এমন একটি বিশেষ ধরনের সহযোগিতা'র পরিবেশ সৃষ্টি করে যে বিদ্যুত প্রবাহীর রোধ প্রায় শূন্যে নেমে যায়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নীচে গিয়ে খেলে তরল হিলিয়ামের সান্দ্রতা (viscosity) শূন্য হয়। সেটি অতি-প্রবাহীর (super-fluid) ধর্ম লাভ করে। সু-সংবদ্ধ অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার এইসব ঘটনায় কোন না কোন ভাবে প্রতিসাম্য নষ্ট হয়। যেমন, অ-চুম্বকিত পদার্থের সমদৈশিকতা (isotropy) চুম্বকিত পদার্থে বজায় থাকে না—সেখানে একটা বিশেষ দিকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আকৃতিগত এবং সাংগঠনিক জটিলতার বিচারে উপরোক্ত বিন্যাসগুলি জীব-জগতের বিন্যাসের ধারে কাছেও আসে না। সংখ্যা-পরিমাণের ভিত্তিতে এই কথাটাকে প্রতিষ্ঠিত করা মুস্কিল—কিন্তু জটিলতার গুণগত বিচারে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রথমত তাপগতীয় সাম্যে অবস্থিত বিন্যাসগুলি সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল নয়—তারা নিশ্চল। কিন্তু জীবন্ত যে কোন বিন্যাসে পরিবর্তন সর্বদা ঘটে চলেছে—সবচেয়ে সরল জীবন্ত কোষও নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল নয়—তা সক্রিয়, গতিময়। চুম্বকিত পদার্থ একটি নির্দিষ্ট অবস্থাকে প্রকাশ করে। জীবাণুর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় একটি প্রক্রিয়া। এছাড়াও আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তফাত রয়েছে
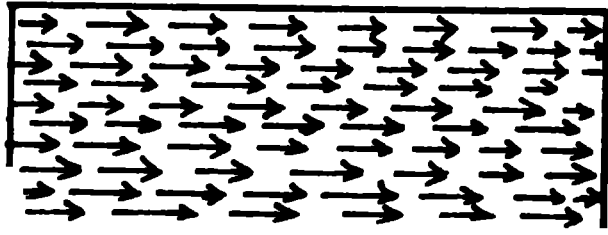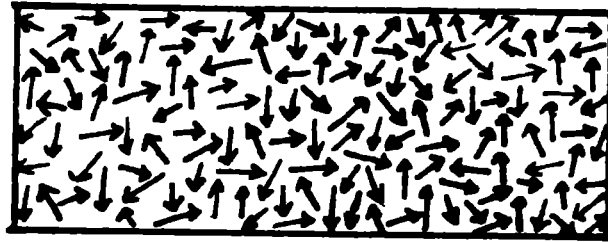
চিত্র 16·1 তাপগতীয় সাম্যেও বিন্যাসের সৃষ্টি হতে পারে। ঠাণ্ডা করলে জল বরফে পরিণত হয়: কুরী তাপমাত্রার নীচে পরাচুম্বক অয়শ্চুম্বকে পরিণত হয়।

এই দুই প্রকারের বিন্যাসের মধ্যে। তাপমাত্রা হ্রাস পেলে সাম্যস্থিত বিন্যাসের সৃষ্টি হয়—সিস্টেমকে ঠাণ্ডা করলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিসাম্য ভঙ্গের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে সক্রিয় জৈবিক সিসটেমে বাইরে থেকে তাপ এবং জড়বস্তু যোগান দিলে তাতে নতুন বিন্যাস সৃষ্টি হতে দেখা যায়। তাপগতিবিদ্যার প্রথাগত ধারণায় এটা খুব উদ্ভট ব্যাপার। সেখানে বাইরে থেকে তাপশক্তির যোগান দিলে সিস্টেম আরও বেশি অবিন্যস্ত, এমন কি বিপর্যস্তও হয়ে পড়ে। অথচ বহিরাগত শক্তি ও জড়বস্তু জৈবিক সিস্টেমকে বেশি করে বিন্যস্ত এবং সুসংগঠিত করে তোলে।

তাপগতীয় সাম্য থেকে অনেক দূরে জৈবিক সিস্টেমের অবস্থান। পরিপার্শ্বের সঙ্গে ক্রমাগত শক্তি এবং বস্তু লেন-দেন করে সিস্টেম ঐ অবস্থায় নিজেকে ধরে রাখে। ঐ আদান-প্রদান যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে সিস্টেম তাপগতীয় সাম্যে নীত হয়—সেখানে সে বিন্যাসহীন, নিষ্ক্রিয় এবং মৃত। সাম্য থেকে দূরে থাকতে পারলে তবেই সজীব বিন্যাসগুলি রক্ষা পায়। বাইরে থেকে ক্রমাগত শক্তি ও বস্তু

গ্রহণ করে তারা নিজেদের মধ্যে নিম্ন-এনট্রপির বিন্যাস গঠন করে। শক্তি-অবক্ষয়ী কিছু পদ্ধতিতে তারা আবার এতটা তাপ এবং এনট্রপি পরিপার্শ্বকে ফেরত দেয় যে সব মিলিয়ে—অর্থাৎ সিস্টেম এবং পরিপার্শ্বকে একসঙ্গে ধরলে—দ্বিতীয় সূত্র পালিত হয়। বিন্যাস বজায় রাখার জন্য ঐ অবক্ষয় জরুরী। তাছাড়া পরিপার্শ্বে আকস্মিক কোন বিচলন ঘটলে সেটার প্রভাব অবক্ষয়ী পদ্ধতিতে সিস্টেমের বাইরে চলে যায়, আভ্যন্তরীন সংগঠন অটুট থাকে। সাম্য থেকে অনেক দূরে নিজেকে সুসংগঠিত করে তোলার এই ক্ষমতা যেসব সিস্টেমের আছে তাদের কার্যপদ্ধতিতে অবক্ষয় (dissipation) এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে প্রিগোজিন তাদের নাম দিয়েছেন অবক্ষয়ী বিন্যাস (dissipative structures)।

শুধু জীববিজ্ঞানেই এই ধরনের অবক্ষয়ী সংস্থার দেখা পাওয়া যায় তা নয়। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়েও সাম্য-চ্যুত, স্ব-সংগঠক সিস্টেমের দেখা পাওয়া যায়। এই সমস্ত সিস্টেমের মিল এক জায়গায়—তারা অরৈখিক। প্রবাহমাত্রা এবং তার জন্মদাতা বল—অর্থাৎ ফল এবং কারণ—পরস্পরের সমানুপাতিক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবক্ষয়ী সিস্টেমের এই অরৈখিকতার উৎস হ'ল পুনঃসংযোগ বা ফিড ব্যাকের (feed back) ব্যবস্থা। বলবিদ্যায় 'বিশৃঙ্খলা' যেমন, তেমনই তাপগতিবিদ্যায় অবক্ষয়ী সংস্থার স্ব-সংগঠন অন্তর্নিহিত অরৈখিকতার নিদর্শন।

ভৌত বিজ্ঞানে সাম্য থেকে দূরে অবস্থিত স্ব-সংগঠক সিস্টেমের একটা ভালো উদাহরণ হ'ল লেসার রশ্মি। কোন উৎস থেকে আলো উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রেই এক। উচ্চতর শক্তিস্তর থেকে পরমাণু যখন নিম্নতর শক্তিস্তরে নেমে আসে তখন উদ্বৃত্ত শক্তি আলোক-কণিকার আকারে বিকীর্ণ হয়। উচ্চতর শক্তিস্তরে যাওয়ার পদ্ধতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হ'তে পারে। অণু পরমাণুর যে স্বাভাবিক তাপীয় গতি তার ফলেই ধাক্কা-ধাক্কি লেগে কিছু কণা শক্তির উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে পারে। টিউব লাইট বা টিভির মত ডিসচার্জ টিউবে ব্যাপারটা ঘটে অন্যভাবে। আয়ণিত পরমাণু থেকে মুক্ত ইলেকট্রনের স্রোত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে বাড়তি শক্তি আহরণ করে এবং গতিপথে ধাক্কা মেরে অন্য কণাদের উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায়। লেসারে একটা বিশেষ ধরনের শক্তির 'পাম্প' এই কাজ করে। সাধারণত উচ্চতর স্তরে পরমাণুর সংখ্যা নিম্নতম স্তরের (Ground State) চেয়ে কম থাকে। ঐ 'পাম্প এটাকে উল্টে দেয়—তখন ওপরের স্তরের কণাসংখ্যা নীচের স্তরের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়। তাপগতীয় সাম্য থেকে অনেক দূরে এর অবস্থান। সাধারণ আলোর উৎসে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পারমাণবিক ইলেকট্রনের কক্ষান্তর ঘটে বিকিরণের সৃষ্টি হয়। একটি পরমাণুর বিকিরণের দশার (phase) সঙ্গে অপর একটির বিকিরণের দশার কোন সম্বন্ধ থাকে না। তাই সাধারণ উৎস থেকে যে আলো

বেরোয় তা সুসংবদ্ধ নয় (incoherent) : তারা আলোর কয়েকটি তরঙ্গের সমষ্টি। অন্যদিকে লেসারে ইলেকট্রনের কক্ষান্তরকে উদ্দীপিত করে বিকিরণ নিজেই। ফলত লেসারের আলোক তরঙ্গ অনেক বেশি সংগঠিত : তারা সুসংবদ্ধ (coherent) তরঙ্গের দীর্ঘ সারি হিসেবে নির্গত হয়।) সাম্য থেকে দূরে অবস্থিত একটি অরৈখিক আলোকীয় সিস্টেমের উদাহরণ এই লেসার যেখানে উচ্চ ও নিম্ন স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা ইত্যাদি কয়েকটি রাশির মান যথাযথ হলে সিস্টেমে স্ব-সংগঠনের ধর্ম (সুসংবদ্ধ আলো উৎপন্ন করা) প্রকাশ পায়। বিশেষ কিছু রাশির মান যথাযথ হওয়া, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট মাত্রা বা সংকট মাত্রা পেরিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাটা প্রায় সব স্ব-সংগঠক সিস্টেমেই দেখা যায়। সিস্টেম যখন সাম্যাবস্থা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে তখন ঐ সংকট মান পেরোলেই সেটি একটি সুবিন্যস্ত, সু-সংগঠিত রূপ ধারণ করে। রান্নাঘরে কেটলীতে জল গরম করার সময় এই ঘটনা প্রত্যেক দিন ঘটে। অসম তাপবণ্টনের জন্য পাত্রের তলার জল যতটা গরম হয়, ওপরের জল ততটা হয় না। প্রাথমিক সাম্যাবস্থা থেকে পাত্রের জল দূরে সরে যায়। তাপমাত্রার তফাত অল্প থাকলে সিস্টেম সাম্যাবস্থার কাছেপিঠেই থাকে—তলার হাল্কা জল সান্দ্রতার বাধা অতিক্রম করে পাত্রের ওপর দিকে উঠতে পারে না। তাপমাত্রার তফাত যত বাড়তে থাকে সিস্টেম সাম্যাবস্থা থেকে তত দূরে সরে যেতে
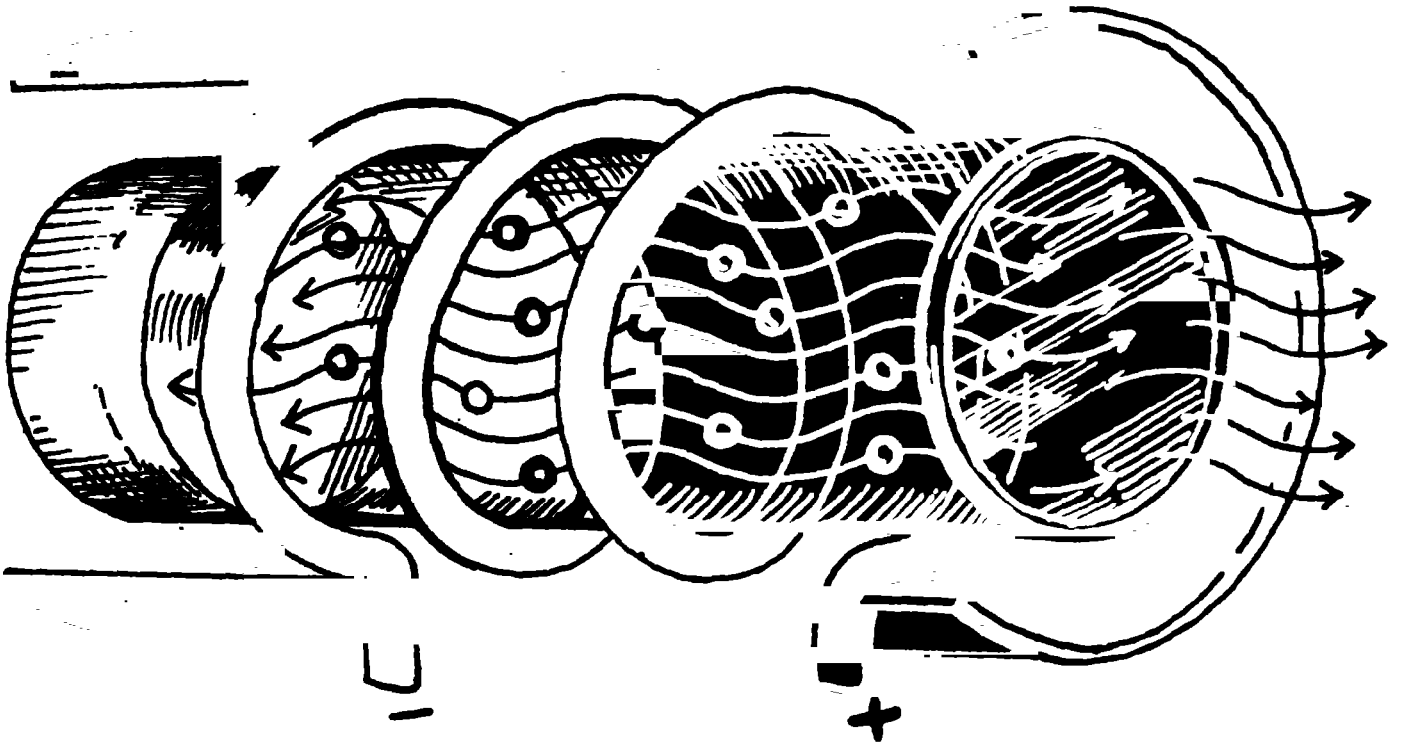
চিত্র 16.2 লেসার সাম্য থেকে দূরে অবস্থিত একটি অরৈখিক আলোকীয় সিস্টেম।

থাকে। সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষায় দেখা যায় যে তাপমাত্রা বিভেদের হার একটা সংকট মান পেরোন মাত্র পরিচলন স্রোত হঠাৎ করে শুরু হয়ে যায়। আগে যেখানে কিছুই

ছিল না সেই তরলের দেহে সুবিন্যস্ত আকৃতি গড়ে উঠতে দেখা যায়—ছোট ছোট ষড়ভুজের অনেকগুলি 'কোষ' সুসংগঠিত সজ্জায় পরিচলন বজায় রাখে। এইভাবে সিস্টেমটি নিজেই নিজেকে সংগঠিত করে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার জগতে স্ব-সংগঠনের চিত্তাকর্ষক উদাহরণ দেখা যায় বেলুসভ-জাবোতিন্স্কি বিক্রিয়ায় (Belousov Zhabotinsky reaction)। বিক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ রূপটি জটিল—কিন্তু মোটের ওপর সালফিউরিক এ্যাসিডের মধ্যে পটাশিয়াম ব্রোমেট দ্বারা ম্যালোনিক এ্যাসিডের জারণই মূল ঘটনা। সিজিয়াম সালফেট এই বিক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করে অর্থাৎ নিজে পরিবর্তিত না হয়ে বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। বিক্রিয়াটির একটি লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য আছে—সেটি হ'ল স্ব-অনুঘটন। অর্থাৎ বিক্রিয়াজাত কিছু পদার্থের উপস্থিতি অনুঘটকের ন্যায় আচরণ করে সেই পদার্থেরই আরও উৎপাদন ত্বরান্বিত করে। স্ব-অনুঘটন বিক্রিয়াটিকে অ-রৈখিক করে তোলে। সিস্টেম যখন রাসায়নিক সাম্যে বা তার খুব কাছে অবস্থান করে খুব অদ্ভুত কিছু চোখে পড়ে না। কিন্তু যখন এটি মুক্ত-সিস্টেম হিসেবে ক্রিয়া করে এবং উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ ক্রমাগত এতে ঢুকতে ও বেরোতে থাকে তখন খুব লক্ষ্যনীয় কিছু ঘটনা ঘটে।
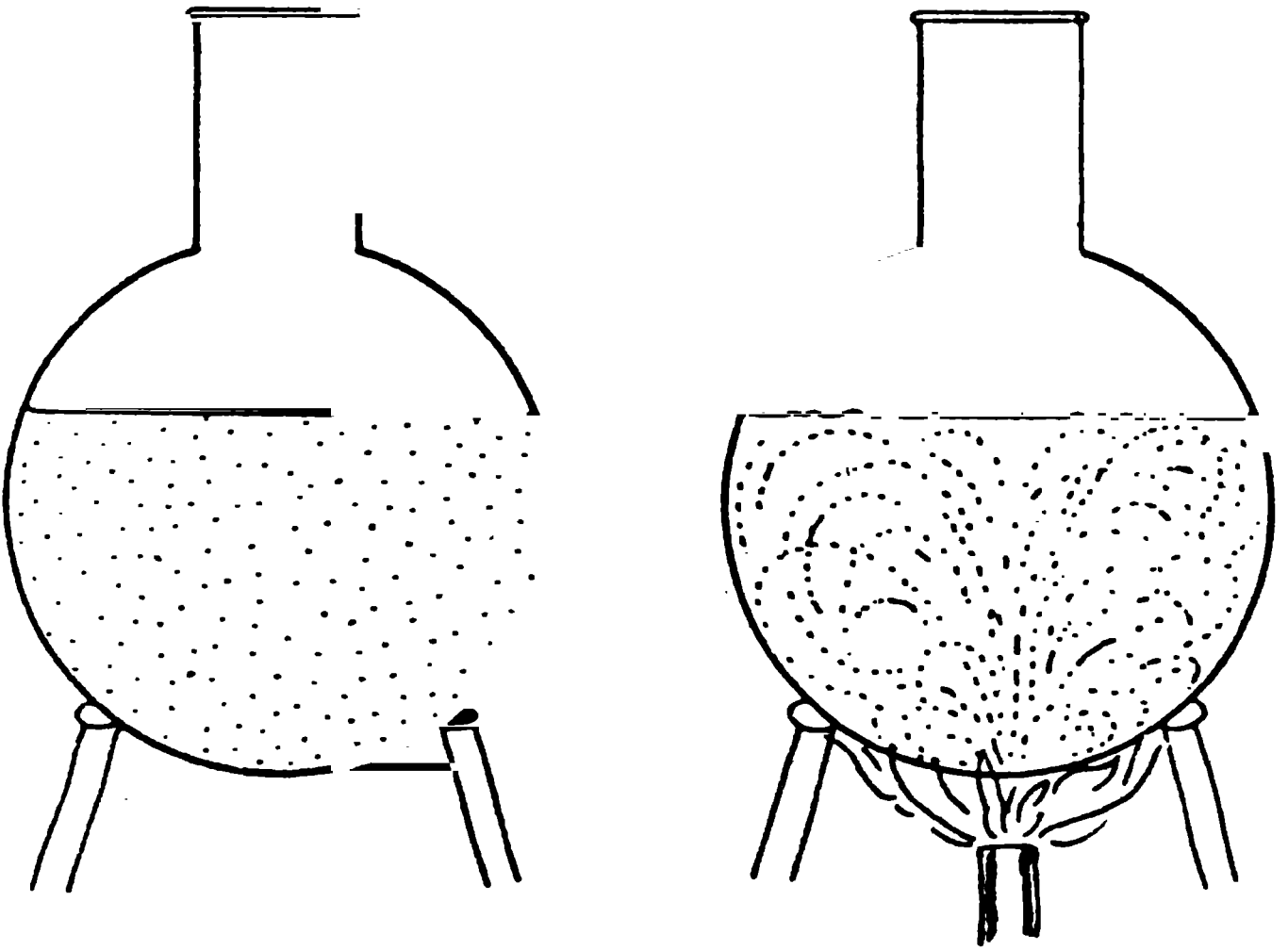
চিত্র 16.3 তাপমাত্রা বিভেদের একটি সংকট মানে স্থির তরলে পরিচলনের সৃষ্টি হয়।

বাইরে থেকে রাসায়নিক বস্তু দেওয়া-নেওয়ার হার যখন কম থাকে তখন কোন অবক্ষয়ী-বিন্যাস দেখা দেয় না। কিন্তু ঐ হার বাড়িয়ে সিস্টেমকে সাম্য থেকে দূরে

নিয়ে যেতে থাকলে একটা সঙ্কট বিন্দুতে হঠাৎ করে অবস্থান্তর ঘটে যায়। Br–এর গাঢ়তা এবং Ce^{4+}/Ce^{3+}-এর আপেক্ষিক গাঢ়তা (Concentration) পর্যাবৃত্ত ভাবে পরিবর্তিত হ'তে থাকে। উপযুক্ত রঙ যোগ করলে এই পরিবর্তন রঙের বদল হিসেবে চোখে দেখা যায়। মিনিট খানেক পর পর তরলের রঙ একবার লাল আরেকবার নীল হতে থাকে। (যদি ঐ দুটো রঙ বাছা যায়।) সেটির আচরণ একটি রাসায়নিক ঘড়ির মত হয়ে যায়। যদি সিস্টেমকে সাম্য থেকে আরও দূরে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে জটিল পর্যাবৃত্ত আচরণ লক্ষ করা যায় এবং শেষ অবধি তা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে (অনেকটা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত অরৈখিক দোলকের মত)। এটা রাসায়নিক বিশৃঙ্খলা। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় স্ব-সংগঠনের প্রকাশে শুধুমাত্র সময়ের সাপেক্ষে ছন্দে তা নয়। স্থানীক (spatial) বিন্যাসও দেখা যায়। পাতলা ডিশে বিক্রিয়ার ফলে নানা রকম নকশা তৈরি হয়, কখনও বা সেই নকশা সময়ের তালে তালে পরিবর্তিত হতে থাকে। কোথাও গাঢ়ত্বের পরিবর্তন ঢেউয়ের আকারে কেন্দ্র থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কোথাও স্পাইরাল আকৃতির সৃষ্টি হয়।

অরৈখিক রাসায়নিক সিস্টেমের গাণিতিক মডেলে এই সব কিছুই গুণগত ভাবে পাওয়া যায়। এই জাতীয় একটি বিখ্যাত মডেলের নাম ব্রুসেলেটর (Brusselator) — প্রিগোজিন এবং লেফেভর (Lefever) প্রথম এটা গঠন করেন। জটিলতা বাদ দিয়ে এই মডেলের মূল বক্তব্য এইরকম : স্ব-অনুঘটন (x তৈরি হয়ে x-এরই তৈরির হার বাড়িয়ে দিচ্ছে) কিংবা বিপ্রতীপ-অনুঘটনের (x-এর ফলে y বেশি তৈরি হচ্ছে, y-এর ফলে x) ফলে যদি কোন রাসায়নিক সিস্টেমে অরৈখিকতা উৎপন্ন হয় এবং তা ক্রমশ সাম্য থেকে বহু দূরে সরে যায় তাহলে তার মধ্যে আশ্চর্য সব স্ব-সংগঠিত বিন্যাস সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যায়—স্থান এবং কালে। এখন, জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার স্ব-অনুঘটন এবং বিপ্রতীপ অনুঘটন প্রতিনিয়তই ঘটে থাকে। এর ফল সুদূর প্রসারী। এমন হতেই পারে যে প্রিগোজিনরা যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার অরৈখিক মডেল তৈরি করেছিলেন জৈবিক সিস্টেমগুলি ঐ জাতীয় অবক্ষয়ী সংস্থারই জটিলতর রূপ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সাম্য থেকে দূরে অবস্থিত সিস্টেমে সুপ্ত অরৈখিকতার বীজ স্ব-সংগঠনের পুষ্প রূপে বিকশিত হয়। প্রকৃতির সৃষ্টিশীলতা এইভাবেই নিজেকে প্রকাশিত করে। অবশ্য প্রকাশের এই পথ পুরোপুরি পূর্বনির্ধারিত নয়। তাপমাত্রা বিভেদের একটি নির্দিষ্ট সংকট মানে নিশ্চল তরলে হঠাৎ করে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু একটি বিশেষ তরল বিন্দু কিভাবে ঘুরবে—দক্ষিণাবর্তে না বামাবর্তে—তা আগে থেকে বলে দেওয়া অসম্ভব। পরিচলন শুরু হওয়ার আগে তরল বিন্দু একটাই অবস্থায় থাকতে পারে, কিন্তু সংকট মুহূর্তে তার সামনে সম্ভাব্য দুটো অবস্থার যেকোন একটাতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কোনটাতে যে সে যাবে
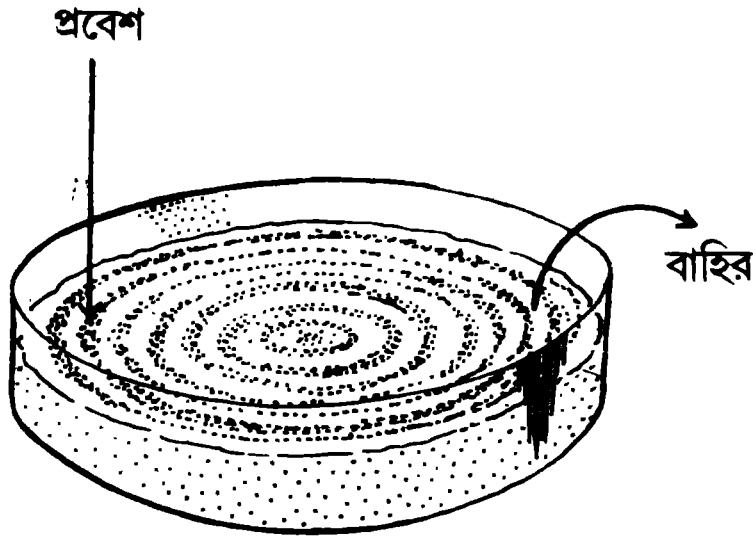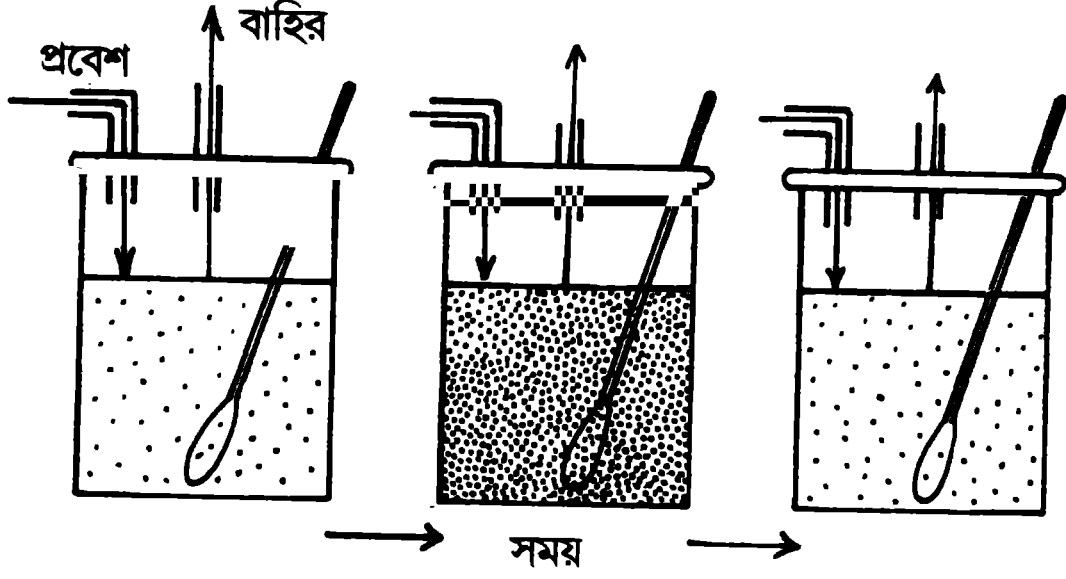
চিত্র 16.4 রসায়নে অবক্ষয়ী বিন্যাস। সাম্য থেকে দূরবর্তী রাসায়নিক সিস্টেমে দেশে (বৃত্তাকার ঢেউ) এবং কালে (রাসায়নিক ঘড়ি) অবক্ষয়ী বিন্যাস দেখা যায়।

তা আগে থেকে বলা আদৌ সম্ভব নয়।

যে মূল অরৈখিক ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ তরলের গতিকে প্রকাশ করে তার একাধিক সমাধান সম্ভব—তাই বাস্তব ক্ষেত্রের বহুত্ব গাণিতিক রূপেও বর্তমান। সমীকরণের সমাধান তার বিশিষ্ট রূপের উপর তো বটেই—তাতে উল্লেখিত বিভিন্ন রাশির মান, সহযোগী যে সমস্ত শর্ত সমাধানকে পূরণ করতে হবে (boundary condition) তাদের ওপরও নির্ভর করে। পরিবেশ মুক্ত সিস্টেমের ওপরে কি জাতীয় প্রভাব ফেলবে তার ওপর ওই শর্তাবলী নির্ভর করবে। সাম্যাবস্থার নিকটে একটিই মাত্র সমাধান থাকে এবং তা সুস্থিত। পরিপার্শ্বের প্রভাবে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটলেও সিস্টেম তা সামলে নিয়ে আগের পথেই ফিরে আসে। এক্ষেত্রে বিবর্তনের পথ একটি এবং তা

সুনির্দিষ্ট। কিন্তু সাম্য থেকে অনেক দূরে সঙ্কট-মানের ওপারে গেলে একাধিক সমাধান সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা সমাধান স্বল্প বিচ্যুতির সাপেক্ষে সুস্থিত—কিন্তু যে বিন্দুতে পৌঁছে সমাধানের সংখ্যা এক থেকে অনেক হয়ে যায় সেই বিন্দু অস্থিতিশীল অবস্থার দ্যোতক। এই বিন্দুকে দ্বি-বিভাজন বিন্দু (Bifurcation point) বলা হয়। এখানে পারিপার্শ্বিক কারণে ঘটা সামান্য বিচলন বিবর্ধিত হয়ে যায় এবং তার প্রভাবে সিস্টেম একাধিক সম্ভাব্য পথের যে কোনো একটিতে ঢুকে পড়ে। বিচলন যেহেতু অনিয়মিত, সেই হেতু পথের কোন বিশেষ শাখাটিকে সিস্টেম বেছে নেবে তা আগে থেকে বলা কঠিন। একটা শাখায় যাওয়ার পর অবস্থা সুস্থিত থাকে যতক্ষণ না আবার নতুন একটি দ্বি-বিভাজন বিন্দুর দেখা পাওয়া যায়। সেখানেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। প্রিগোজিন সাম্যচ্যুত সিস্টেমের এই আচরণকে—বিচ্যুতির মধ্যে দিয়ে সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠা—আখ্যা দিয়েছেন।
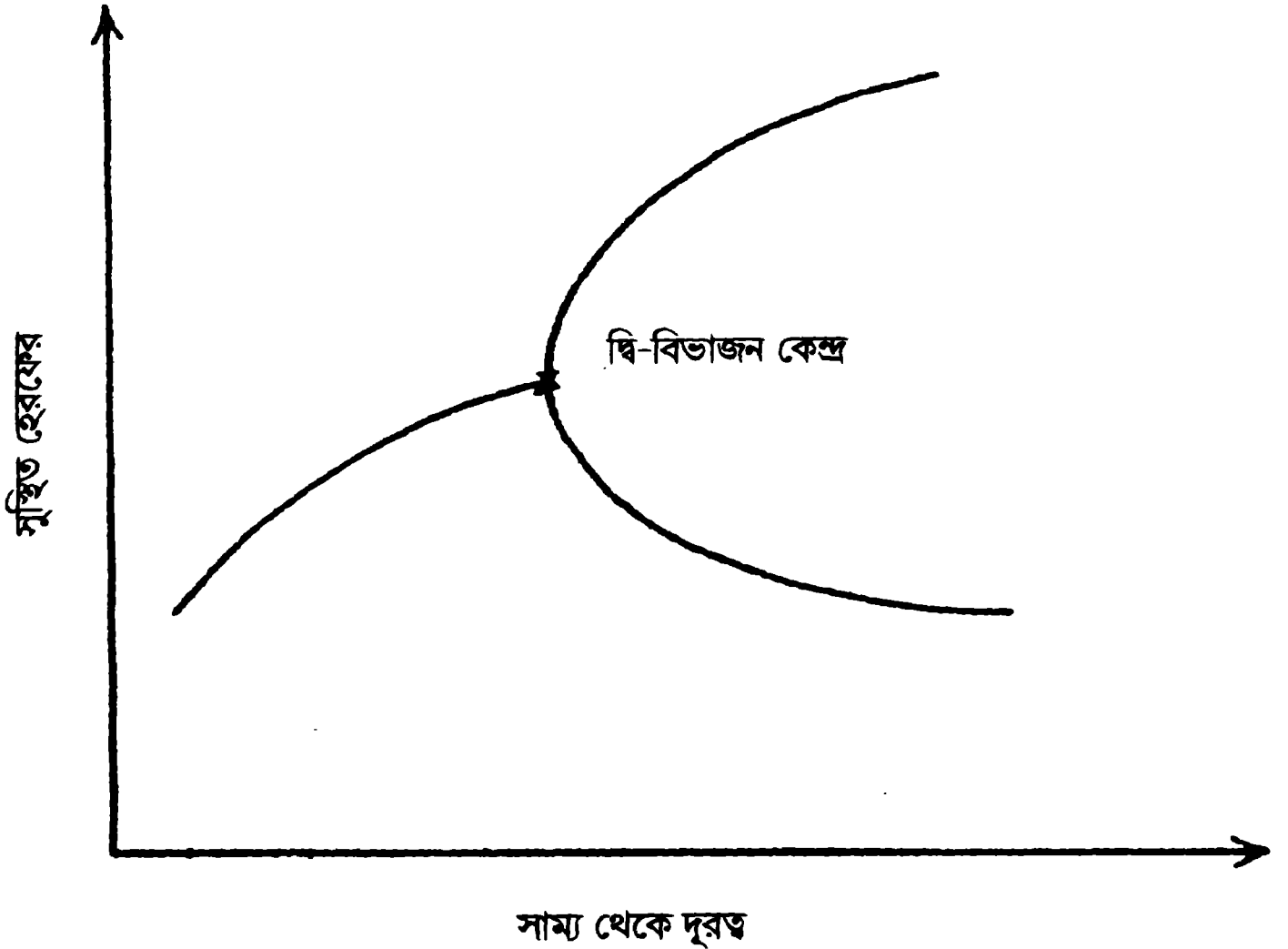
চিত্র 16·5 সিস্টেমকে ক্রমশ সাম্য থেকে দূরে নিয়ে গেলে একটি সংকট বিন্দুতে এসে একক, সুস্থিত শাখা ভেঙে দুটি শাখা তৈরি হয় (দ্বি-বিভাজন)।

এই সব নতুন ধারণা দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে : বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই জাতীয় গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় কদাচিৎ পাওয়া যায়। বহুকাল ধরে যে সব প্রশ্ন আমাদের মনে ঘুরে বেড়িয়েছে হঠাৎ করে যেন তাদের উত্তরগুলোর দেখা পাওয়া গেল: জটিল স্ব-সংগঠন, একদিকে স্ব-সংগঠিত সিস্টেমের স্থিতিশীলতা অন্যদিকে সংকট মুহূর্তে সিস্টেমের অস্থায়ী চরিত্র, বিবর্তনের অনেকগুলি সম্ভাব্য পথ এবং সেই পথে চালনার পেছনে পরিপার্শ্বের ভূমিকা। প্রিগোজিনের এই নতুন তত্ত্বীয় দৃষ্টিতে বহু সজীব সিস্টেমের কার্যপ্রণালীর মৌলিক রূপ স্পষ্ট করে বোঝা গেছে। এক দীর্ঘ পথের গোড়ায় প্রথম কয়েকটি পদক্ষেপ হিসেবেই একে দেখতে হবে। পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানকে একীভূত করার কাজে প্রিগোজিন এখনো সফল হন নি, ঠিকই, কিন্তু তিনি উভয়ের আলোচনার প্রযোজ্য একটি সাধারণ ভাষা, সাধারণ তত্ত্বীয়-ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এটাও একটা বিশাল সাফল্য।

সতের

স্ব-নিয়ন্ত্রিত কোষ-সমষ্টি

দেশে বা কালে স্ব-সংগঠনের উদাহরণ বড়মাপের, ম্যাক্রো-স্তরের ঘটনায় দেখা যায়। রাসায়নিক ঘড়ির পর্যায়কাল প্রায় এক মিনিট। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দেশ-মাত্রিক যে বিন্যাস দেখা যায় তার মাপ কয়েক সেন্টিমিটার। জৈবিক-সিস্টেম এর চেয়েও বড় মাপে স্ব-সংগঠন দেখায়, কিন্তু আসলে আণবিক স্তরের যে স্ব-সংগঠনের ফলে এদের সৃষ্টি তারা মাপে কয়েকশো বা কয়েক হাজার গুণ ছোটো। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুযায়ী ভৌত ক্রিয়ার তাৎক্ষণিক প্রভাব কেবল সেই স্থানেই অনুভূত হয়—সিস্টেমের দূরবর্তী অংশে তা সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছয় না—সময় লাগে। বড় সিস্টেমের বিভিন্ন অংশ তাহলে কিভাবে নিজেদের মধ্যে সাযুজ্য বজায় রেখে, 'তাল রেখে' চলে—একই রকম আচরণ করে? স্ব-সংগঠক সিস্টেমে যে সুদূর প্রসারী শৃঙ্খলা দেখা যায়—দেশে এবং কালে—তার ব্যাখ্যা কি?

প্রশ্নগুলো নতুন নয়। সাম্যাবস্থার তাপগতিবিদ্যার আলোচনাতেও এসব প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে; তরল থেকে কঠিনে বা অচৌম্বক পদার্থ থেকে চৌম্বক পদার্থে রূপান্তরের যে অবস্থান্তর ঘটে তা নিয়ে লিও কাডানফ (Kadanoff), মাইকেল ফিশার (Fisher) এবং কেনেথ উইলসনের (Wilson) মত বিজ্ঞানীরা প্রায় দু-দশক আগেই মৌলিক গবেষণা করেছেন। তার পরও অনেক কাজ হয়েছে। মূল যে কথাটা এইসব গবেষণা থেকে জানা গেছে তা হ'লো এই জাতীয় পরিবর্তনের ঠিক মুখে—সংকট বিন্দুতে—যে নিয়মগুলি ক্রিয়াশীল তারা স্কেল-নিরপেক্ষ। বরফ তৈরি হওয়ার পদ্ধতিতে কোন অন্তর্নিহিত দৈর্ঘ্যের স্কেল নেই—যে কোনো মাপেরই বরফ খণ্ড তৈরি হতে পারে। চুম্বকও যে কোনো মাপেরই পাওয়া সম্ভব। সংকট বিন্দুর নিকটে অনেক রকমের রূপান্তরের ক্ষেত্রেই সিস্টেমের একাধিক ধর্ম ঘাত—ভিত্তিক নিয়ম মেনে চলে। ঘাতের মান বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই হয়। কিন্তু সাম্যাবস্থার তাপগতিবিদ্যার মাধ্যমে স্ব-সংগঠন সম্বন্ধে এতটা বোঝা গেলেও আণবিক স্তরে গিয়ে কি হচ্ছে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাম্যস্থিত বিন্যাস এবং

অবক্ষয়ী বিন্যাসের মধ্যে মূলে প্রভেদ রয়েছে। অবক্ষয়ী বিন্যাসে ম্যাক্রো-স্তরে দৈর্ঘ্যে ও সময়ের বিশিষ্ট মাপ অন্তর্নিহিত রয়েছে, উপযুক্ত রাশির মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। নিজের আশপাশে ছোট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ (local) আণবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কি করে কোটি কোটি অণু নিয়ে গঠিত সুনির্দিষ্ট মাপের সুসংবদ্ধ বিন্যাস সংগঠিত করে—সেই প্রশ্নটা থেকেই যায়।

সমস্যাটা বেশ কঠিন, বস্তুত এটার সমাধান করা প্রায় অসম্ভব। তাই প্রথমেই সমস্ত জটিলতা সহ বাস্তব সমস্যাটা না ধরে আমরা একটা সহজ মডেল দিয়ে তার অনুকরণ করার চেষ্টা করব। কোটি কোটি অণুর বদলে 10, 20 বা 25 টিকে নিয়ে কাজ করব—ধরবো যে তারা সারিবদ্ধ ভাবে সুশৃঙ্খল সজ্জায় বিন্যস্ত রয়েছে। মনে করা যাক প্রত্যেক অণু (অল্প) কয়েক রকম অবস্থায় থাকতে পারে। সত্যিকারের অন্তরাণবিক ক্রিয়া—প্রতিক্রিয়ার কথা না ভেবে অণুগুলির অবস্থা পরিবর্তনের একটা সহজ নিয়ম ঠিক করে নেওয়া যায়। ব্যাপারটাকে আরও সোজা করে কম্পিউটারে বিশ্লেষণের উপযুক্ত করে তোলার জন্য ধরা যেতে পারে সময়ও বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপে এগোচ্ছে : 0, 1, 2, 3...... ইত্যাদি তার ধাপগুলো নির্দেশ করবে। পছন্দমত একটা প্রাথমিক অবস্থা ধরে নেওয়া হবে। তারপর সময়ের সাথে সিস্টেমটা কিভাবে বদলায় সেটা দেখাই কাজ। মনে হতে পারে এ তো প্রকৃতির মডেল নয় কম্পিউটার দিয়ে এক ধরনের খেলা! কথাটা ঠিক। কিন্তু দেখা যাবে এই খেলাটা খুবই অর্থবহ।

বিছিন্ন ধাপ দিয়ে গড়া এইজাতীয় কম্পিউটার মডেলকে সেুললার অটোমাটা (Cellular Automata) বলা হয়। আমরা একে স্ব-নিয়ন্ত্রিত কোষ-সমষ্টি বলতে পারি। একদম প্রথমে যারা এই ধরনের মডেল নিয়ে কাজ করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত গাণিতিক প্রতিভা ফননিউমান (von Neumann)। এই জাতীয় মডেলের সাহায্যে প্রকৃতিতে যেসব জটিল আকৃতি দেখা যায় সেগুলোর পুনর্নির্মাণ সম্ভব কিনা তিনি তা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। এক মাত্রিক অটোমাটায় এক সারি কোষ থাকে। প্রত্যেক কোষের অবস্থা নির্দেশ করতে একটি সংখ্যা বা অন্য কোনো গুণ ব্যবহার করা হয়। (যেমন, একটা কোষ সাদা, কালো বা ধূসর হতে পারে।) দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে কোষগুলি তলের ওপর আয়তক্ষেত্র, ষড়ভুজ বা অনুরূপ কোনো আকারে সাজানো থাকতে পারে। এদের প্রাথমিক অবস্থা বলে দেওয়া থাকে। সময়ের একেকটি পদক্ষেপ পর পর এদের পরিবর্তন নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী হয়। সহজ, স্থানীয় নিয়মের প্রভাবে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে এই কোষসমূহ খুব জটিল বিন্যাস সৃষ্টি করতে সক্ষম বলে দেখা গেছে।

আমরা দশটি কোষ সংবলিত একটি 'অটোম্যাটন' নিতে পারি। প্রত্যেক কোষ হয় ভর্তি (কালো রং) অথবা খালি (সাদা)। সেই অনুযায়ী তাদের নির্দেশ করা হবে

হয় 1 অথবা 0 দিয়ে। এবার পরিবর্তনের নিয়মটা এইভাবে ঠিক করা যাক : সময়ের প্রতি পদক্ষেপের পরে কোনো একটি কোষের নির্দেশক সংখ্যা হবে তার নিজের এবং ঠিক ডান দিকের কোষের সংখ্যার যোগফল। যোগফল দুই বা তার বেশি হলে 2 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ নিতে হবে (modulo 2)। অর্থাৎ,

$$0+0=0;\ 0+1=1+0=1;\ 1+1=0$$

একটা বিশেষ সজ্জাক্রম দিয়ে শুরু হয়ে কিভাবে ঐ নিয়ম অনুযায়ী বিন্যাস বদলাতে থাকে 17·1 চিত্রে তা দেখানো হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থা এবং বদলের নিয়ম পাল্টে পাল্টে একমাত্রিক অটোম্যাটনে বিচিত্র ধরনের বিন্যাস পাওয়া যেতে পারে —অসম আকৃতির সৃষ্টি ও বিলয়, ফ্র্যাকটাল বিন্যাসের উদ্ভব—ইত্যাদি।

দ্বিমাত্রিক অটোমাটাতে জটিলতা অনেক বেশি। গণিতবিদ জন কনওয়ে (John Conway) 'জীবন' বলে একটা খেলা তৈরি করেন—সেটার খুব নাম হয়। দাবার ছকের মত বর্গাকৃতি কোষের সমাহার নিয়ে খেলাটা খেলতে হয়, প্রত্যেক কোষকে ঘিরে রয়েছে আরও আটটা প্রতিবেশী কোষ। একটা কোষ হয় "জীবিত" বা

চিত্র 17·1 একমাত্রিক সেলুলার অটোমাটা।

"মৃত"। "জীবনের" নিয়ম খুব সোজা—মৃত কোষের প্রতিবেশীদের মধ্যে ঠিক তিনটি যদি জীবিত হয় তাহলে সে নিজেও জীবিত হয়ে ওঠে। দুটি বা তিনটি জীবিত প্রতিবেশী থাকলে একটি জীবিত কোষ জ্যান্ত থেকে যায়—নইলে সেটি

মারা পড়ে। কিছু বিশেষ প্রাথমিক সজ্জা থেকে শুরু করলে এই খেলাতে কত বিচিত্র রকমের স্ব-সংগঠিত বিন্যাস তৈরি হতে পারে তা দেখে অবাক হতে হয়। বাস্তব জীবনের বহু ধর্মই এই খেলায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। খেলায় উদ্ভূত বিন্যাসের মধ্যে সহযোগিতা, যুদ্ধ, প্রজনন, বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ের রূপ চোখে পড়ে।

এটাকে ছেলেমানুষী খেলা—কম্পিউটার থাকলে যে কেউ খেলতে পারে—বলে উড়িয়ে না দিয়ে একটু ভেবে দেখা উচিত। খেলার অসংখ্য নিয়ম বানানো যেতে পারে—অধিকাংশ নিয়মেই কোনো লক্ষ্যণীয় বিন্যাস তৈরি হবে না। অনেকটা কল্পনাশক্তি, চর্চা এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা না থাকলে ঠিক কোন নিয়মে অর্থবহ নকশা তৈরি হবে তা বের করা সম্ভব নয়। 17·2 নম্বর চিত্রে 'জীবন' খেলায় পাওয়া কিছু চিত্তাকর্ষক নকশা দেখানো হয়েছে। অন্য কোনো বিশ্লেষণে বোধগম্য হয় না এরকম অনেক পরিস্থিতি সেলুলার অটোমাটার সাহায্যে পুনর্নির্মাণ করে তাদের অনেক দিক বোঝা গিয়েছে। কঠিন পদার্থকে ঘিরে প্রবাহের নকশা, ব্যাপন, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে নানা নকশার উৎপত্তি—ইত্যাদি এর উদাহরণ। কম্পিউটারে খুব দুরূহ ফাংশান নিয়ে কাজ করার সময়ও এটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই সব প্রয়োগে স্থানীয় নিয়মগুলো সব সময়ে নিশ্চয়তাবাদী হয় না—সম্ভাবনাতত্ত্বের অনিশ্চয়তা তার মধ্যে স্থান পায়।

নিজেই নিজেকে সুসংগঠিত করে তোলার কাজে মানুষের মন ও চৈতন্যের দক্ষতা অতুলনীয়। মানুষের মস্তিষ্ক কোটি কোটি 'নিউরন' নামক ক্ষুদ্রাকার কোষের সমষ্টি। শেখা, ভাবা, জানা, মুখস্থ করা—এই ধরনের মননের পদ্ধতি ঠিক করে একটি নিউরনের অবস্থা নয়—সমস্ত নিউরনের সামগ্রিক অবস্থা। সেই কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য স্নায়ুজাল বা নিউরাল নেটওয়ার্ক, (Neural Networks) নির্মাণ করা হয়। এতে অবশ্য খুবই স্থূলভাবে মননের অনুকরণ সম্ভব। এই নেটওয়ার্ক বা জালকে খুবই জটিল ধরনের 'সেলুলার অটোমাটা' ভাবা যেতে পারে। শুরুতে কয়েকশো নিউরন নেওয়া হয়—তাদের প্রত্যেকে 'খোলা' বা 'বন্ধ' এই দু-রকম অবস্থায় থাকতে পারে। সময়ের একেকটা ধাপ অতিক্রান্ত হবার পর একটি নিউরনের কি অবস্থা হবে তা তার বহু সংখ্যক প্রতিবেশীদের অবস্থার সঙ্গে জটিল সম্পর্কের মাধ্যমে সম্বন্ধিত। দুটো নিউরনের মধ্যেকার যোগাযোগের হার ইত্যাদি নানা রাশিকে ইচ্ছে এবং প্রয়োজনমত বদলানো যেতে পারে। কিছুটা 'গোলমাল'ও (Noise) ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ক্ষেত্রবিশেষে। স্ব-সংগঠনের আশ্চর্য সব উদাহরণ দেখা যায় নিউরাল নেটওয়ার্কের আচরণে। অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় কিছু কিছু নেটওয়ার্কের গঠন-নৈপুণ্যে—শেখা, চিনতে পারা, মনে রাখার মত মানসিক ক্রিয়ার অনুকরণ করে সেগুলি।

এই জাতীয় মডেল দিয়ে কোনো প্রাকৃতিক সিস্টেমকে পুরোপুরি ধরা হয়তো
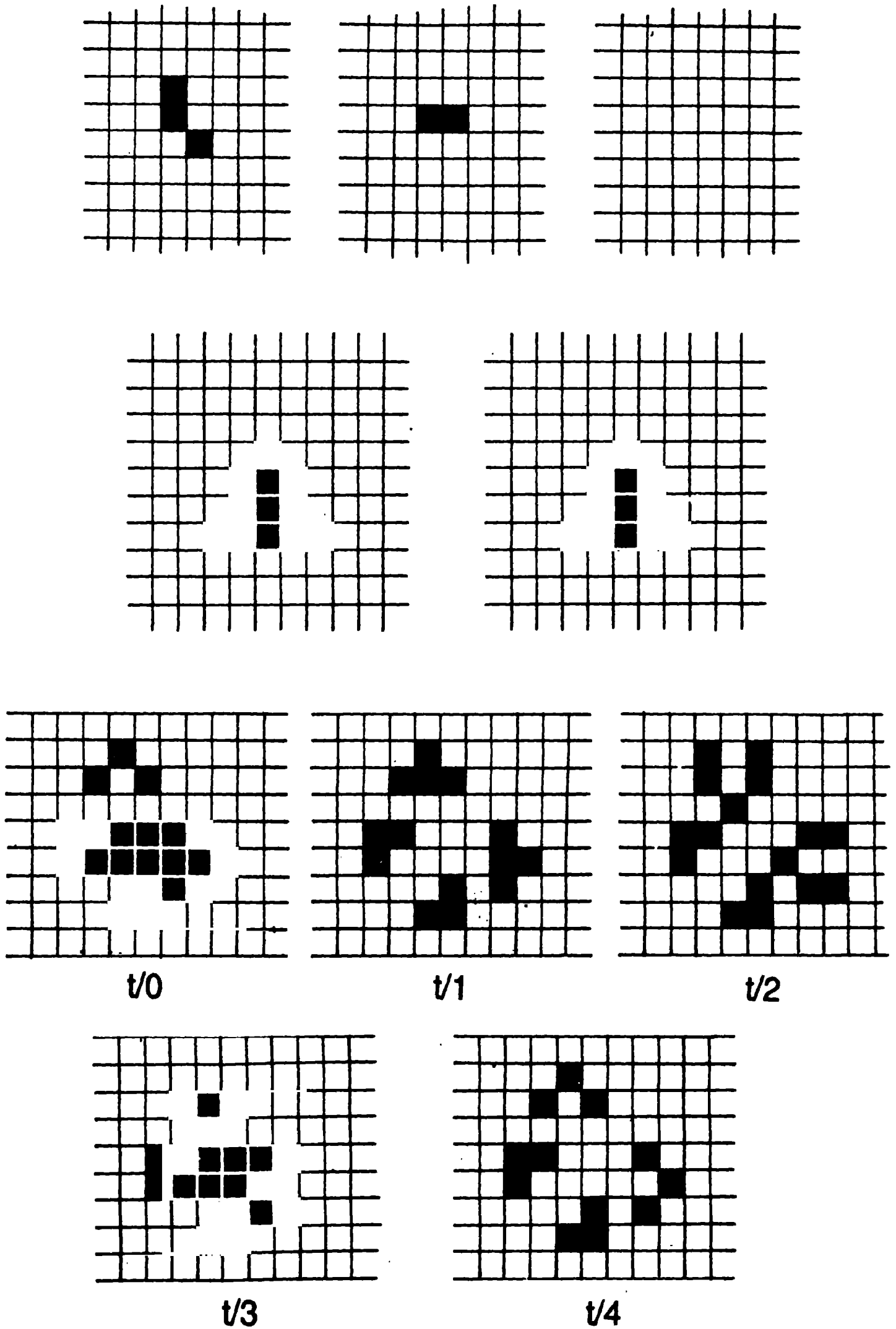
চিত্র 17·2 'জীবন' নামক খেলায় উদ্ভূত কিছু বিন্যাস।

কখনোই যাবে না কিন্তু অনেক নতুন জিনিস শেখা গেছে এই প্রচেষ্টা থেকে। একটি কোষের অবস্থা কিভাবে বদলাবে তা স্থির নির্দিষ্ট নয়—প্রতিবেশীদের অবস্থার ওপর সেটা নির্ভর করে, আবার একই নিয়মে প্রতিবেশীদের অবস্থাকে সে প্রভাবিতও করে। এই জাতীয় পারস্পরিক ফিড ব্যাক থাকার ফলে নিয়ামক সূত্রগুলির মধ্যে অরৈখিকতা এসে পড়ে। এর ফলে যে স্ব-সংগঠনের ধর্ম এর মধ্যে প্রকাশ পায় তা পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের ক্ষেত্রে আমরা আগেই দেখেছি—অর্থাৎ সুযোগ পেলে অরৈখিকতা স্ব-সংগঠনের প্রবণতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়াও লক্ষ করার মতো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। যে নিয়ম অনুসারে অটোমাটা বিবর্তিত হয় তা প্রায়শই সময়ের সম্মুখ ও পশ্চাতগতির সাপেক্ষে প্রতিসম (symmetric) নয়। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি সময়ের সাপেক্ষে প্রতিসম। এই দিক দিয়ে দুটো পরিস্থিতির মধ্যে মূলে প্রভেদ রয়ে যাচ্ছে। প্রতিসাম্যের অনুপস্থিতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিস্টেম নিজেকে সুসংগঠিত করে তুলছে-এটা বার বার ঘটতে দেখলে মনে হতেই পারে যে পদার্থবিদ্যার বর্তমান সূত্রগুলিকে না বদলালে সেগুলোর সাহায্যে প্রকৃতির স্ব-সংগঠনের ধর্মের ব্যাখ্যা যোগানো যাবে না। অটোমাটার আচরণে সুপ্ত এই ইঙ্গিত এবং এ বিষয়ে প্রিগোজিনের মতবাদ একই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তাঁর মতে, প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত সময়ের একমুখিনতাকে পদার্থবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলিতেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একমুখিনতা—তাঁর মতে হয় সমস্ত স্তরেই পরিব্যাপ্ত হবে অথবা তা কোনো স্তরেই খাটবে না। এরকম হতে পারে না যে বস্তুর মাপের একস্তর থেকে আরেকস্তরে যাবার সময় ম্যাজিকের মত সেটা হঠাৎ করে গজিয়ে উঠবে। এই প্রত্যয়ের ওপর ভিত্তি করে বিস্তৃত আকারের একটি তত্ত্ব রচিত হয়েছে। কিন্তু তা বহুলাংশেই কল্পনা ও অনুমান নির্ভর রয়ে গেছে, সেটা হাতে কলমে যাচাই করে দেখা এখনো সম্ভব হয়নি।

সেলুলার অটোমাটা নিয়ে গবেষণা থেকে সম্ভবত সবচেয়ে দামী এবং তাৎপর্যময় যে কথাটা বেরিয়ে আসে তার বক্তব্য খুব স্পষ্ট। সহজ এবং সীমাবদ্ধ অঞ্চলে ক্রিয়াশীল 'স্থানীয়' নিয়মের প্রভাবে বৃহত্তর মাপে আশ্চর্য সব স্ব-সংগঠিত বিন্যাসের জন্ম হয়। অটোমাটার নিয়ন্ত্রক নিয়মের কোথাও দৈর্ঘ্যের বড় মাপের কোন স্কেল অন্তর্নিহিত নেই। তবুও ঐ স্থানীয় নিয়মের পুনরাবৃত্তির ফলে ম্যাক্রো-স্তরে বড় এবং বিশিষ্ট (Characteristic) মাপের বিন্যাস তৈরি হয়ে যায়। তার জন্য বড় মাপে প্রযোজ্য কোনো বাড়তি নিয়মের প্রয়োজন হয় না।

এই একই সিদ্ধান্ত যদি প্রকৃতির জটিল সিস্টেমগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে ধরা যায় তাহলে তার ফলাফল হয় সুদূর প্রসারী। জীবজগতের স্ব-সংগঠন এবং সুসংবদ্ধ বিন্যাস, জৈবিক সিস্টেমে একাংশের সঙ্গে অন্য অংশের সাযুজ্য এসব কিছুর জন্য কোনো কোনো সার্বিক পরিকল্পনার—মাস্টার প্ল্যানের—দরকার নেই।

উপযুক্ত স্থানীয় নিয়মের বারংবার পুনরাবৃত্তির ফলেই তাদের সৃষ্টি হতে পারে। অরৈখিক স্থানীয় নিয়ম, পুনরাবৃত্তি, পরিপার্শ্ব-আরোপিত শর্ত এবং আকস্মিক বিচ্যুতি—এই সবের মধ্যে দিয়েই বিশ্ব তার সৃজনক্ষমতা প্রকাশ করে।

নির্দেশিকার 5, 15 এবং 18 নং পুস্তক দ্রষ্টব্য।

আঠার

প্রাণ-রহস্য

পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে যে অবক্ষয়ী বিন্যাসের দেখা মেলে তারা এখন বিজ্ঞানের মূল ধারার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এই বিন্যাসগুলির প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশিত হয়—সেখানে তারা সম্পূর্ণ নতুন এক ভাষা, এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করে। প্রশ্ন হলো এই নতুন উন্মোচনের ফলে কি প্রাণের উদ্ভব, বিকাশ ও অভিব্যক্তির বিষয়ে অতি পুরাতন জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর মিলবে? প্রাণ-রহস্যের কিনারা হবে?

প্রাণের প্রকাশে রহস্যটা প্রকৃতপক্ষে কোথায়? সপ্রাণবস্তু যে স্তরের সংগঠন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিচয় দেয় তার তুলনায় পরিচলন স্রোত বা রাসায়নিক ঘড়ির শৃঙ্খলা কিছুই নয়। আমাদের দৈহিক সঞ্চালনের অত্যন্ত তুচ্ছ একটা উদাহরণ—চোখের সামনে কিছু এসে গেলে চট্ করে পাতাটা বন্ধ করে ফেলা। কিন্তু এটুকুর জন্যেও শরীরের অনেকগুলি সংবেদনের একযোগে কাজ করা দরকার। এ ছাড়াও সংগঠনের একটা ক্রম-উন্নত সজ্জা আছে। এর উচ্চতম স্তরে আমাদের আবেগ-অনুভূতি দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক নীচের স্তরের সংগঠিত শারীরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ওপরে। সেটা নির্ভর করছে নানান জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংগঠনের ওপর—যেটা আবার নির্ভরশীল বহুসংখ্যক অণুর সুসংগঠিত আচরণের ওপর। প্রাণে সংগঠনের এতগুলো স্তর এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের জটিলতা দেখে অনেকেই ভাবেন যে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রে বাঁধা বহু সংখ্যক অণুর সঞ্চালনের অতিরিক্ত কিছু তার মধ্যে নিশ্চয়ই রয়েছে।

জটিলতার মাত্রা দেখে প্রাণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খোঁজা বন্ধ করে দিতে হবে —এটাও কোনো কাজের কথা নয়। আজ যা জটিল এবং অপরিষ্কার বলে মনে হচ্ছে আগামীকাল তাই সহজ এবং স্বচ্ছ বলে প্রতিভাত হতে পারে। প্রোটিন এবং নিউক্লিক এ্যাসিডের গঠন, জনন সংকেতের পাঠোদ্ধার করে কিভাবে সেই সংকেত অনুযায়ী প্রোটিন সংশ্লেষণ হয় তা বোঝা—এ সবই এককালে ভীষণ কঠিন সমস্যা

বলে মনে হত। কিন্তু এখন অণুজীববিদ্যার নিরন্তর প্রয়াসের ফলে ধীরে ধীরে এগুলো বোধগম্য হয়ে উঠেছে। সাম্যাবস্থা থেকে দূরে মুক্ত সিস্টেমে কিভাবে স্ব-সংগঠন সম্ভব তা অবক্ষয়ী বিন্যাসের আলোচনায় বোঝা গেছে। সজীব সিস্টেম গুলি মুক্ত এবং তারা অনবরত বাইরের সঙ্গে শক্তি এবং জড়বস্তু আদান প্রদান করে চলেছে। নীতিগত ভাবে তারা সাম্যাবস্থা থেকে দূরে থেকে নিজেদের মধ্যে যে কোনো মাত্রার জটিল বিন্যাস সংগঠিত করতে পারে।

জটিলতা ছাড়া সজীব সিস্টেমের আরেকটি ধর্মও আশ্চর্যজনক। তার প্রত্যেক মুহূর্তের আচরণ আগে থেকে আন্দাজ করা অসম্ভব; অথচ তার সামগ্রিক আচরণ সুস্থিত এবং তার ধরনটাও আন্দাজ করা সম্ভব। ছোটখাটো বিচ্যুতি সাধারণত সিস্টেমকে মূল ধারা থেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে নিয়ে যায় না। মধ্যবর্তী সময়ে কিছুটা বিচলনের পর তা আবার আচরণের স্থায়ী মূল স্রোতে ফিরে আসে। ছোট মাপে অস্থিরতার সঙ্গে বড় মাপের স্থায়িত্বের এই সহাবস্থান খুব অদ্ভুত মনে হতে পারে—কিন্তু এটা ব্যাখ্যার অতীত কিছু নয়। বিশৃঙ্খল সিস্টেমে অদ্ভুত আকর্ষক ঠিক এই জাতীয় ভূমিকাই পালন করে। প্রাণের আলোচনায় অনিবার্য এবং দৈবাৎ—এ দুয়ের মধ্যে বহুকালের পুরোনো দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ না মিটলেও অন্তত তার নিরসনের একটা আভাস অরৈখিক বিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রজননের সময় একটি মাত্র নিষিক্ত কোষ বারংবার বিভাজিত হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি করে; একদম গোড়ায় তার এক অংশকে অন্য অংশের চেয়ে আলাদা করে চেনার কোনো উপায় থাকে না। অথচ কোষ বিভাজনের ফলে একসময় সেটিই স্বতন্ত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট শিশুতে পরিণত হয়। এই 'মরফোজেনেসিস' (Morphogenesis) এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যোগানো সহজ নয়—এরকম একটা কথা প্রায়ই বলা হয়। কি করে এক জায়গার কোষ জানতে পারে যে তাদেরকে ফুসফুসে পরিণত হতে হবে আর অন্য আরেক জায়গার কোষ জানতে পারে তাকে হ'তে হবে চোখ? দেখে মনে হয় এর পেছনে যেন আগে থাকতে ছকে রাখা পরিকল্পনা রয়েছে, একটা চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, একটা সার্বিক ছকের দিকে নজর রেখেই যেন এসব ঘটছে। প্রতিটি কোষে অবিকল একরকম DNA রয়েছে অথচ ভ্রূণের বিভিন্ন অংশের কোষের আচরণ বিভিন্ন। আণবিক জীববিজ্ঞান মাইক্রোস্তরে এর একটা ব্যাখ্যা যোগানোর চেষ্টা করে। জিনগুলোর ক্রিয়া সময়ের সাথে সুইচের মত 'অন', 'অফ' হতে থাকে-—এই তথ্যটা এক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনীয়। নির্দিষ্ট সময় পর পর জিনেদের নিয়ন্ত্রক এবং গঠনমূলক ভূমিকা 'অন', 'অফ' হতে থাকে। এই পুরো কার্যক্রমটা নিয়ত্রণ করে আবার একটি 'মাস্টার জিন'—অন্য জিনের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করাই যার কাজ। অর্থাৎ সিস্টেম কোন পথে কিভাবে যাবে, বৃদ্ধি পাবে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জিনের ভেতরকার জনন-সংকেতে লেখা থাকে। এতটা জানতে পারাও বিজ্ঞানের পক্ষে এক

বিরাট অগ্রগতি। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের একেবারে গোড়ার সেই প্রশ্নটা থেকেই যায়: একটা সমসত্ত্ব বস্তুপিণ্ড কি করে নিজে থেকে গঠন এবং আচরণের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অসমসত্ত্ব সিস্টেমে পরিণত হয়?

প্রিগোজিনের তত্ত্ব এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর যোগানোর পক্ষে উপযুক্ত। ভ্রূণ একটি মুক্ত সিস্টেম যা পরিপার্শ্বের সঙ্গে ক্রমাগত জড়বস্তু ও শক্তি লেন দেন করে সাম্য থেকে দূরবর্তী অবস্থানে রয়েছে। জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার স্ব-অনুঘটন এবং বিপ্রতীপ অনুঘটনের ফলে অবক্ষয়ী বিন্যাস সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় অরৈখিকতার উদ্ভব হয়। গাঢ়ত্ব, তাপমাত্রা, লেনদেনের হার—বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রক এই সব রাশির মান একটা সংকট মাত্রা (দ্বিবিভাজন বিন্দু) পেরিয়ে গেলে কোনো অকস্মাৎ বিচ্যুতির ফলে স্ব-সংগঠিত বিন্যাসের জন্ম হয়। এর ফলে প্রাথমিক প্রতিসাম্য ভেঙে যায় (যেমন গাঢ়ত্ব অসম হয়ে পড়ে) এবং একটি অসমসত্ত্ব গঠন রূপ নেয়। একই DNA থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন আচরণের কারণ হিসেবে তাদের পরিপার্শ্বের অসমসত্ত্ব গুণকে দায়ী করা যায়। একটার পর আরেকটা সংকট বিন্দুতে উপস্থিত এবং দ্বিবিভাজিত হতে হতে সিস্টেমের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে—তাদের কার্যপদ্ধতির বিভিন্নতাও প্রকাশ পায়। ভ্রূণের বৃদ্ধি যে মসৃণ, সুষম গতিতে হয় না—যেন একেকটা ধাক্কায় হয়—এটা পর্যবেক্ষণ-সমর্থিত সত্য। উপরোক্ত ব্যাখ্যা এর সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়।

কিন্তু এই ব্যাখ্যায় একটা গুরুতর খামতি থেকে যায়। সাধারণত একটা দ্বিবিভাজন বিন্দুতে পৌঁছনোর পর সিস্টেমের সামনে বিবর্তনের একাধিক পথ খোলা থাকে—তার কোনটি সে গ্রহণ করবে তা আগে থেকে নির্ধারণ করা নীতিগতভাবে অসম্ভব। অথচ মরফোজেনেসিস বা ভ্রূণের বিকাশের ধারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে পূর্বনির্ধারণ যোগ্য—তাতে অনিশ্চয়তার ভাগ খুবই অল্প। বহু সংখ্যক দ্বিবিভাজন বিন্দুতে অনিশ্চয়তা এভাবে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কারণ কি? পূর্বনির্ধারিত পথে তাকে চালনা করে কে? এসব প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর আজও জানা নেই। প্রিগোজিন যাকে 'সাহায্য-প্রাপ্ত দ্বিবিভাজন' (assisted bifurcation) বলেছেন—সেটা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। অনেক অরৈখিক সিস্টেমে দেখা যায় যে অভিকর্ষের মত খুব ক্ষীণ বাহ্যিক বলের প্রভাবেও দ্বিবিভাজন বিন্দু থেকে তার বিভিন্ন পথে যাওয়ার সম্ভাবনাগুলো পাল্টে যায়। কোনো একটা শাখা অন্য সবগুলোর তুলনায় বেশি গ্রহণ যোগ্য হয়ে ওঠে। বাহ্যিক বল প্রতি দ্বিবিভাজন বিন্দুতে একটি বিশেষ শাখাকে বেছে নিতে সিস্টেমকে প্ররোচিত করে। খুব বড় তাপীয় বিচ্যুতি তাকে অন্য শাখায় যেতে বাধ্য না করলে প্রত্যেকবার সিস্টেম ঐ বিশেষ শাখাটিকেই নির্বাচন করে। এইভাবে বাহ্যিক বলের সাহায্য-প্রাপ্ত দ্বিবিভাজন মরফোজেনেসিসের প্রক্রিয়াকে প্রায় প্রত্যেক বারই নির্দিষ্ট আকৃতির ভ্রূণ তৈরি

করতে সক্ষম করে—কদাচিৎ জন্মগত ত্রুটি নিয়ে শিশু জন্মায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে সামগ্রিকভাবে মরফোজেনেসিসের ব্যাখ্যা প্রিগোজিনের অবক্ষয়ী বিন্যাসের ধারণার সাহায্যে দেওয়া সম্ভব হলেও প্রক্রিয়াটির খুঁটিনাটি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা—এমনকি অত্যন্ত সরল জীবের জন্যও—তার সাধ্যাতীত। সেই ব্যাখ্যা যেদিন আবিষ্কৃত হবে সেদিন তাকে অণুজীববিদ্যা প্রদত্ত মরফোজেনেসিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সঙ্গে প্রিগোজিনের সাম্যচ্যুত ব্যবস্থায় স্ব-সংগঠনের সামুদ্রিক ধারণাকে মেলাতে পারতে হবে।

পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাণের উদ্ভবের সমস্যা আরও মৌলিক। অনেক নতুন প্রশ্নও এ প্রসঙ্গে উঠে পড়ে। প্রথম প্রাণের সৃষ্টি কিভাবে হয়ে থাকতে পারে সে সম্বন্ধে একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রাণ দেখা দেওয়ার আগেকার জগতে ঠিক কি ধরনের পরিবর্তন ঘটায় প্রাণের সৃষ্টি হ'ল সে বিষয়ে তাদের বক্তব্য স্বতন্ত্র। যে রূপে প্রাণকে আমরা চিনি তার জন্য প্রোটিন এবং নিউক্লিক এ্যাসিডের পরস্পর নির্ভর মিথষ্ক্রিয়ার প্রয়োজন : প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংকেত নিউক্লিক এ্যাসিডে লিপিবদ্ধ থাকে আবার নিউক্লিক এ্যাসিডের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রোটিনের উপস্থিতি দরকার হয়। এই পরস্পর নির্ভর সিস্টেমের উদ্ভব কি করে হ'ল?

ভূপৃষ্ঠে প্রায় 300 কোটি বছর আগে প্রাণের প্রথম বিকাশ ঘটে। সে সময়ে বায়ুমণ্ডলে সম্ভবত বিপুল পরিমাণে হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া এবং মিথেন ছিল। আকাশের বিদ্যুত-ক্ষরণের মধ্যস্থতায় এই উপাদানগুলি সংশ্লিষ্ট হয়ে নানা রকম রাসায়নিকের একটি মিশ্রণ তৈরি করে যার মধ্যে কয়েক রকমের অ্যামিনো এ্যাসিড এবং প্রাণের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আরও কিছু জৈব-যৌগ উপস্থিত ছিল। এই অনুমানগুলি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করে দেখা হয়েছে—প্রাচীন পৃথিবীর অনুরূপ অবস্থা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করে। এ পর্যন্ত খুব একটা মতভেদ নেই। কিন্তু এর পরে কিভাবে ঐ জৈব-যৌগগুলি সংশ্লিষ্ট হয়ে অতীব দীর্ঘ জৈব-অণুসমূহ তৈরি করলো আর কি করেই বা তার পর প্রোটিন—নিউক্লিক এ্যাসিডের পরস্পর নির্ভর চক্র সৃষ্টি হ'ল সে বিষয়ে মতৈক্য নেই, একেক মডেলে একেক রকম করে এর ব্যাখ্যা যোগানো হয়েছে। কোথাও ধরা হয়েছে আগে নিউক্লিক এ্যাসিড এসেছে, তারপর প্রোটিন। কোথাও আবার ঠিক এর উল্টোটাই ঘটেছে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে। একেবারে অন্যভাবে জীবনের শুরু হয়েছিল—এরকম মতও প্রকাশ করেছেন অনেকে।

ঘটনা-পরম্পরা সম্বন্ধে বক্তব্য যাই হোক না কেন ঐ ঘটনাগুলি ঠিক ঐ ক্রমে পরপর ঘটে যাওয়ার সম্ভাব্যতা (probability) কি—সেটাই হ'ল আসল প্রশ্ন। প্রচলিত মতে ঘটনা-পরম্পরাকে অনিয়মিত (random), দৈবাৎ ঘটে যাওয়া বলে ধরে নেওয়া হয়। ঠিক ঠিক অণুগুলি কোনো এক সময় দৈবাৎ সঠিক সজ্জাক্রমে

মিলিত হয়ে বড় জৈব অণু তৈরি করে ফেলে। আবার বহু সংঘর্ষের মধ্যে একবার ছোট জৈব অণুর দুটো টুকরো সংযোজিত হয়ে একটা বড় শৃঙ্খল তৈরি করে— দৈবাৎই। এইভাবে চলতে থাকে। সে সময়ে পৃথিবীর বাতাবরণ ঠিক কি রকম ছিল তা সুনিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় নেই তাই কোনো একটা পথ ধরে প্রাণের উদ্ভব হওয়ার সম্ভাব্যতার মাত্রা কি তা নির্ভুলভাবে গণনা করারও কোনো রাস্তা নেই; কেবল মোটামুটি ভাবে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে মাত্র। পৃথিবীর সৃষ্টির পর যদি দশ কোটি বছর সময় আমরা বরাদ্দ করি ঐ ঘটনাগুলো ঘটে যাওয়ার জন্য তাহলেও 'দৈবাৎ' ঠিক ঐ ক্রমে সেগুলো ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা এত ভীষণ রকমের কম বলে দেখা যায় যে ঐ ভাবে প্রাণের উৎপত্তিকে সেক্ষেত্রে একটা দুর্লভ, অনন্যসাধারণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়।

প্রাণের উদ্ভবকে যদি সাম্যাবস্থা থেকে দূরে ঘটে যাওয়া ঘটনা হিসেবে দেখা হয় তাহলে কিন্তু এই সিদ্ধান্তের অনেকটাই পরিবর্তন ঘটে। সম্পূর্ণ অনিয়মিত (random) ঘটনা পরম্পরার অনুমানটা তাপগতীয় সাম্যে অবস্থিত সিস্টেমের ক্ষেত্রেই খাটে। কিন্তু তিনশো কোটি বছর আগেকার সেই রাসায়নিক 'স্যুপ' সাম্য থেকে দূরে ছিল ধরে নিলে তাতে অবক্ষয়ী বিন্যাসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। দৈবাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর মাধ্যমে নয়, এখানে সিস্টেমের সুবিন্যস্ত হয়ে
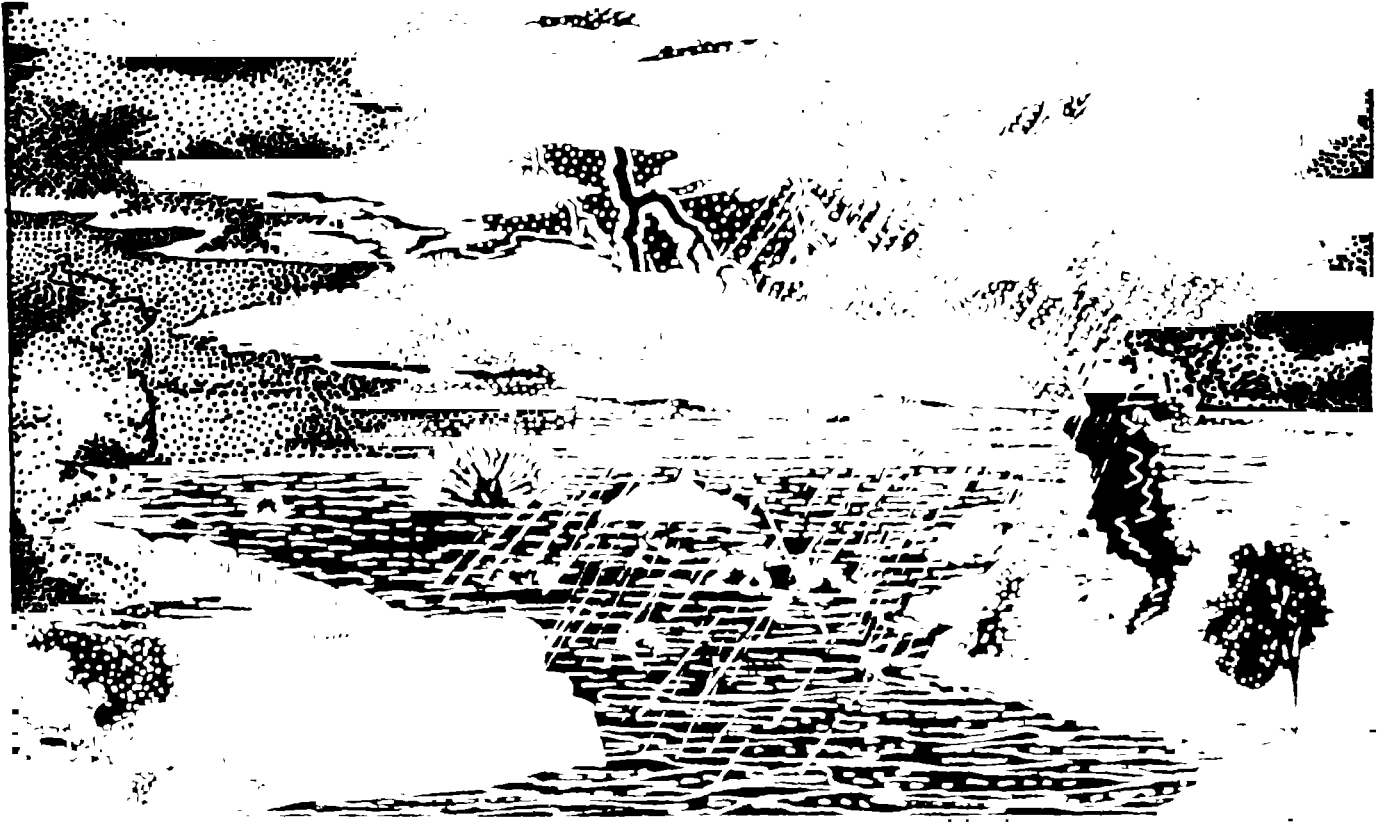
চিত্র 18·1 প্রিগোজিনের মতে, আদিম রাসায়নিক 'স্যুপে' সাম্য-দূরবর্তী অবস্থায় পর পর দ্বি-বিভাজন ঘটেই খুব সম্ভবত প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে।

ওঠার প্রবণতা স্ব-সংগঠনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। পরিস্থিতি সাম্য থেকে যত দূরে সরে যেতে থাকে, আরও নতুন, আরও অভিনব ধরনের বিন্যাসের উদ্ভব ঘটতে থাকে। বলা বাহুল্য যে এই বিন্যাসের প্রতিটি থেকেই নিজের প্রতিলিপি তৈরি করতে সক্ষম জৈব-অণু সৃষ্টি হয় না। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে তা হয়। এবং সেটা হবার সম্ভাবনা, এক্ষেত্রে, দৈবাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনার নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে না। সংকট বিন্দুগুলিতে অনিশ্চয়তার একটা ভূমিকা থাকে, ঠিকই, কিন্তু সেখানেও কতগুলো বিশেষ বিন্যাসকে বেছে নেওয়ার প্রবণতা অন্যগুলোর তুলনায় বেশি হতেই পারে। যদি শেষ খুঁটিনাটি অবধি অন্তর্ভুক্ত করে এমন কোনো মডেল বানানো যায় যাতে ঠিক কোন ঘটনার পরে কোনটি সংঘটিত হয়ে, দ্বিবিভাজন বিন্দুতে পর পর কি ঘটতে ঘটতে এসে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যায় তাহলে হয়ত প্রাণের উদ্ভবের সম্ভাবনার মান নির্ভুলভাবে কষে বের করা যায়। কিন্তু সেরকম কোনো মডেলের অস্তিত্ব নেই। তা সত্ত্বেও প্রিগোজিনের দৃষ্টিতে দেখলে জীবনের উদ্ভবকে বিরল, প্রায় অসম্ভব একটা ঘটনা বলে মনে হয় না। বরঞ্চ একই রকম সাম্যচ্যুত অবস্থার অধীনে অন্য কোনো স্থানেও তার উদ্ভব সম্ভব—এরকমই একটা ধারণা জন্মায়।

আরেকটা বড় ব্যাপার এই সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে—সেটা হলো প্রজাতির বিবর্তন (evolution of species)। আমরা সবাই জানি যে ডারউইনের আবিষ্কারের ফলে এই বিষয়টি ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের নিগড় থেকে মুক্তি পেয়ে বিজ্ঞানের অঙ্গনে প্রবেশ করে। সহজ করে বলতে গেলে ডারউইনের তত্ত্বে মূলত তিনটি নীতি রয়েছে। প্রথমত একটি প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের গুণাবলীর মধ্যে অল্পবিস্তর ফারাক থাকে। দ্বিতীয়ত এক প্রজন্মের সদস্যদের গুণাবলীর উত্তরাধিকার তার পরবর্তী প্রজন্মের ওপর প্রায় অবিকৃত আকারেই বর্তায়—কিন্তু অবিকল এক আকারে নয়। তৃতীয়ত নিজেদের গুণাবলীর জোরে যারা পরিবেশের সঙ্গে বেশি ভালোভাবে খাপ খাওয়াতে পারে তারাই টিকে থাকে এবং দ্রুত বংশবিস্তার করে। সর্বশেষ নীতিটির (প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতির) সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট; প্রথম দুটি নীতির সঙ্গে একযোগে এটি বিবর্তনের প্রত্যক্ষ ঘটনার ব্যাখ্যা যোগাতে সক্ষম হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বদলালে প্রজাতিরা কিভাবে বদলায় তা বোঝা যায়। আণবিক স্তরে ঠিক কি ঘটায় তার ফলস্বরূপ বড় মাপে বিবর্তনের ঐ নীতিগুলি ক্রিয়াশীল হয় তা প্রকাশ করে অণু-জীববিজ্ঞান ডারউইনীয় তত্ত্বের হাত শক্ত করেছে। DNA র প্রতিলিপি তৈরির সময় আকস্মিক ভুল-ভ্রান্তি বা পরিবেশের প্রভাবে আসলের অবিকল প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়না—আর ঐ সামান্য পরিবর্তন বা মিউটেশনের (mutation) ফলে উদ্ভূত ভিন্নধর্মী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যারা বেশি ভালোভাবে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তারাই টিকে যায়। এই পদ্ধতিতেই ধীরে ধীরে প্রজাতি বিবর্তিত হয়।

এই নব—ডারউইনবাদে বিবর্তনের কার্যপদ্ধতি যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় আপাত দৃষ্টিতে তা সম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু ঐ তত্ত্বে সম্ভাব্যতা যে ভূমিকা পালন করে সেটাকে মেনে নিতে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করেন। মিউটেশন যদি নেহাতই দৈবাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা হয় তাহলে তার ফলে উদ্ভূত পরিবর্তন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কাজে জীবের পক্ষে অনুকূল না হয়ে প্রতিকূল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। শুধু তাই নয় খাপ খাওয়ানোর কাজে বাড়তি সুবিধাদানকারী পরিবর্তন একটা মিউটেশনের বদলে অনেকগুলো সুবিধাজনক মিউটেশন পর পর হওয়ার ফলে ঘটাই স্বাভাবিক। ঐ শৃঙ্খলাবদ্ধ মিউটেশনগুলির একটা অংশ ঘটলে যে সুবিধাটারও অংশবিশেষ পাওয়া যাবে—এমন ভাবার কারণ নেই। তারমানে সুবিধাজনক পরিবর্তন আনার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক মিউটেশনকে দল বেঁধে আসতে হবে। যদি প্রত্যেক মিউটেশন সম্পূর্ণ দৈবাৎ ঘটে যাওয়া (random) ঘটনা হয়—তাদের অনেকগুলির ওরকম দলবেঁধে নির্দিষ্ট ক্রমে ঘটার সম্ভাবনা (probability) অত্যন্ত কম হবে। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নব ডারউইনবাদ মোটামুটিভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে তার কারণ ঐ সম্ভাবনার মান নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই সবাই এটাই মেনে নিয়েছেন যে সুবিধাজনক মিউটেশন অত্যন্ত বিরল হলেও কোটি কোটি বছরের কালপর্ব সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে। অত্যন্ত ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে বিবর্তন এগিয়ে চলে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বিবর্তনের একটা ধর্মকে নতুন ডারউইনীয় তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। যে সৃজনশীল একমুখিনতা (15 অধ্যায়ে আলোচিত) বিবর্তনে দেখা যায়, যার ফলে সরল গঠনের জীব থেকে ক্রমশ জটিলতর প্রজাতির সৃষ্টি হতে থাকে—সেটার কোনো সঙ্গত কারণ নির্দেশ করতে এই তত্ত্ব পারেনি।

প্রিগোজিনের তত্ত্ব থেকে এর পুরো উত্তর না পাওয়া গেলেও উত্তরের একটা আভাস পাওয়া যায়। পরিবেশ ও পরিস্থিতি বদলানো মানে প্রজাতিরা সাম্যাবস্থায় নেই—যত বড় মাপের পরিবর্তন ঘটে সাম্যাবস্থা থেকে তত দূরে তারা সরে যায়। একটা সংকট বিন্দুতে এসে হঠাৎ করে নতুন স্ব-সংগঠিত রূপে প্রজাতি আত্ম প্রকাশ করে—পরবর্তী দ্বিবিভাজনগুলি তাকে জটিল থেকে জটিলতর করতে থাকে। স্ব-সংগঠনের এই প্রবণতা থেকেই সুবিন্যস্ত জটিলতা বৃদ্ধি পায়—তারই প্রকাশ ঘটে বিবর্তনে। তার মানে এই নয় যে জিনের মিউটেশন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতি ভুল। এখানে নতুন কথা হ'ল এই যে মিউটেশন একেবারে দৈবাৎ ঘটে না—স্ব-সংগঠনের প্রবণতা তাকে প্রভাবিত করে। আর এই স্ব-সংগঠিত অবস্থাগুলির মধ্যে থেকেই প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে। এই চিত্র অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন, হঠাৎ করে ঘটা ঘটনা বিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যায়—ডারউইন প্রস্তাবিত ধীর, নিরবচ্ছিন্ন গতিতে সে এগোয় না। প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী Stefen J. Gould বিপুল পরিমাণ পরীক্ষালব্ধ তথ্য
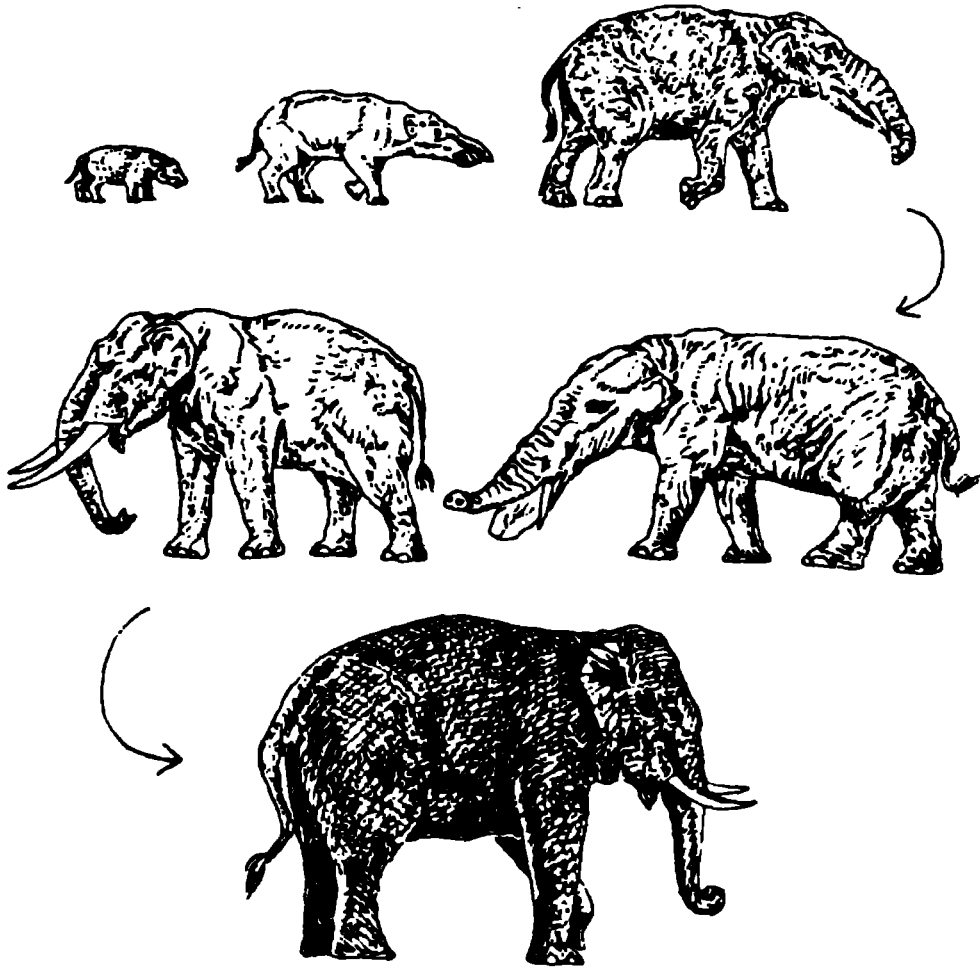
চিত্র 18·2 প্রিগোজিনের বিবর্তনের তত্ত্ব : সাম্য দূরবর্তী অবস্থায় এককেকটি সংকট মুহূর্তে হঠাৎ করে প্রাণীরা নতুন স্ব-সংগঠিত বিন্যাস লাভ করে এবং জটিলতার রূপ পরিগ্রহণ করে।

বিচার করে 'যতিচিহ্নিত সাম্যের '(punctuated eqnilibrium) যে ধারণা দিয়েছেন তার সঙ্গে প্রিগোজিনদের চিত্রের বেশ মিল আছে। দ্বিতীয়োক্ত চিত্রে দুটি অস্থিতিশীল দ্বিবিভাজন বিন্দুর মধ্যবর্তী সময়ে বিবর্তনের ধারা সুস্থিত থাকে। অর্থাৎ সুস্থিতির মধ্যে মাঝে মাঝে যতি চিহ্নের মত অস্থিরতা প্রকাশ পায়।

সাম্য থেকে দূরে অবস্থিত মুক্ত সিস্টেমে স্ব-সংগঠন সম্বন্ধে প্রিগোজিনের তত্ত্ব প্রাণের উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন সম্বন্ধে নতুন অন্তর্দৃষ্টি দান করেছে। প্রাণ-রসায়ন ও প্রজননবিদ্যা সংক্রান্ত যে সব বৈপ্লবিক আবিষ্কার অণু-জীববিদ্যার ক্ষেত্রে ঘটেছে এই তত্ত্বের সঙ্গে তাদের কোনো বিরোধ নেই—বরঞ্চ তাদের সম্পূরকের ভূমিকাই এই তত্ত্ব পালন করছে। এই তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলি সাধারণীকৃত, সার্বিক-ঠিকই-কিন্তু তা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তি-নির্ভর। 'চূড়ান্ত উদ্দেশ্য'বা 'সার্বিক পরিকল্পনা' খোঁজার কোনো প্রবণতা তার মধ্যে নেই। নিজেকে সুসংগঠিত করে তোলা সাম্যচ্যুত, মুক্ত, অরৈখিক সিস্টেমের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা—তার মধ্যে পরমকারণবাদী (teleological) কোনো ঝোঁক নেই।

মানুষের মত প্রাণীজগতের যে সব প্রাণীরা বিবর্তনের সিঁড়ির ওপরের ধাপগুলোতে রয়েছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য মাথায় রেখে কাজ করার ধর্ম তাদের মধ্যে দেখা যায়। সচেতনভাবে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে কাজ করে যাওয়া

বা নিজের স্বাধীন ইচ্ছে অনুযায়ী কিছু করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। তাদের কার্য চালনা করছে যে কারণ সেটার অবস্থান ভবিষ্যতে—অতীতের প্রাথমিক অবস্থা এক্ষেত্রে কার্যের গতিপথ নির্ধারণ করছে না। কিন্তু এই ধরনের সম্মুখবর্তী কারণের কোনো স্থান আজকের বিজ্ঞানে নেই। প্রাণের অভিব্যক্তির উৎকৃষ্টতম রূপ যে সব জীবের মধ্যে প্রকাশিত তাদের আচরণের এই বৈশিষ্ট্যের কোনো ব্যাখ্যা যোগাতে প্রিগোজিনের সাম্যচ্যুত সিস্টেমের বিজ্ঞানও অপারগ।

নির্দেশিকার 5, 15 এবং 16 নং পুস্তক দ্রষ্টব্য।

জটিলতা
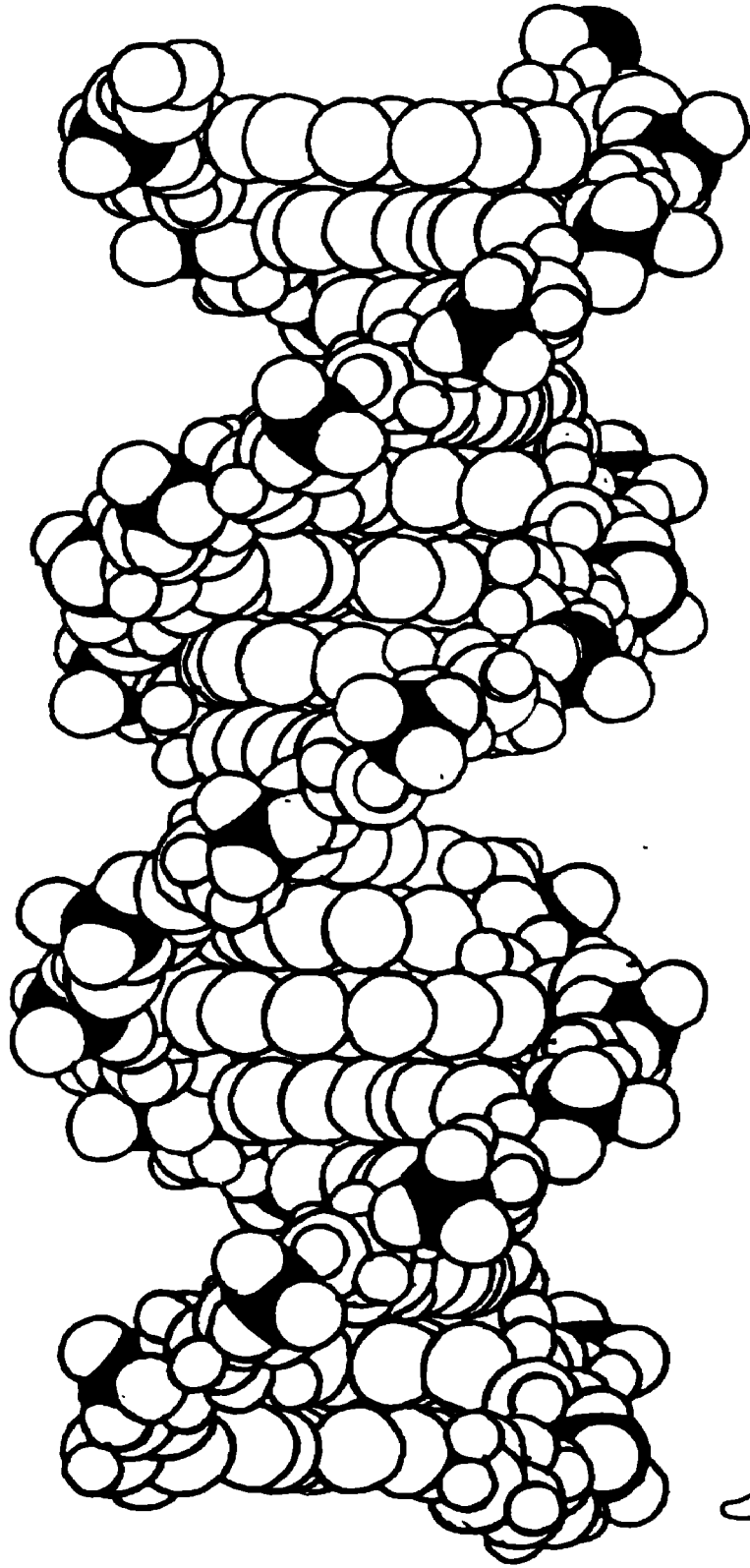
উনিশ

অংশ এবং সমগ্র

প্রাণের রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে আমরা এমন একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হই যেটি সম্ভবত বিজ্ঞানের গভীরতম জিজ্ঞাসার একটি। বৃহৎ এবং জটিলকে বুঝতে গেলে কি সব সময়েই তাকে ক্ষুদ্রতর অংশে ভেঙে ফেলতে হবে? সমগ্রকে অংশের সমষ্টি রূপে বিশ্লেষণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, বিজ্ঞানে?

সমগ্রকে অংশে বিশিষ্ট করে বোঝার নীতিকে রিডাক্‌শানিস্‌ম্ (Reductionism) বলা হয়। আমরা একে বৈশ্লেষিক নীতি বা অংশ-বাদ বলব। এই নীতি অনুযায়ী, একটা জটিল সিস্টেমের ধর্ম সব সময়েই তার ক্ষুদ্রতম অংশের ধর্মের ভিত্তিতে প্রকাশ করা সম্ভব—সেই সিস্টেম একটি অণু বা নক্ষত্র, একটি ব্যাকটিরিয়া বা মানুষ যাই হোক না কেন। "ক্ষুদ্রতম" অংশের ধারণা সময়ের সাথে পাল্টায়, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ওপর তা নির্ভরশীল। যেমন আমরা ক্ষুদ্রতম হিসেবে অণু-পরমাণুদের ধরতে পারি, আবার তার থেকেও ক্ষুদ্রস্তরে গিয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন—কিংবা আরও ছোটমাপের কোয়ার্ক, সুপার স্ট্রিংকে 'ক্ষুদ্রতম' বিবেচনা করতে পারি। এ ব্যাপারের মূলনীতি হ'ল এই যে ক্ষুদ্র, মৌলিক উপাদানগুলি পরস্পরের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে কি নিয়মে ক্রিয়া—বিক্রিয়া করছে সেটা পুরোপুরি বুঝতে পারা দরকার। মৌলিক উপাদানকে যে কণাকৃতি বস্তুই হ'তে হবে এমন নয়—সর্বদেশব্যাপী কোনো বলক্ষেত্রও (field) মৌলিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বৈশ্লেষিক দৃষ্টিতে একটি সজীব সিস্টেমকে ভাবা হবে প্রোটিন, নিউক্লিক এ্যাসিড ইত্যাদির সমষ্টি হিসেবে, সেগুলোর বর্ণনা আবার দেওয়া হবে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদির ভিত্তিতে, যেগুলো আবার শেষ অবধি ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন দিয়ে গড়া বলে ধরতে হবে। বাস্তবক্ষেত্রে বর্ণনা দেওয়ার সময় প্রতি ক্ষেত্রেই নিম্নতম স্তর অবধি যাওয়ার হয়ত প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার অর্থ হ'ল এটা বিশ্বাস করা যে নীতিগত ভাবে সর্বদাই একটা উচ্চ স্তরের ধর্মকে নিম্নতর স্তরের উপাদানের ধর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব।

আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার একেবারে মধ্যস্থলে স্থান করে নিয়েছে এই অংশ-বাদ। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের কাছে একটা সিস্টেমকে পুরোপুরি বোঝার অর্থ হচ্ছে অংশের ভিত্তিতে সমগ্রকে বোঝা। বিজ্ঞানের বুনিয়াদী ক্ষেত্রে অগ্রগতি মানেই হলো এই বিশ্লেষণী ধারার অগ্রগতি—ঐতিহ্যটা এরকমই দাঁড়িয়ে গেছে। এর কারণ বোঝা খুব কঠিন নয়। জীবনে যেমন তেমন বিজ্ঞানেও সাফল্যের মত সফল আর কিছুই নয়। অণু, পরমাণু এবং তাদের সমষ্টি হিসেবে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের মত মাঝারি রকমের জটিল সিস্টেমে এই বিচার-পদ্ধতি এত ভালো কাজ করেছে যে অন্য কোন বিকল্প, সামগ্রিকতা-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী তার ধারে কাছেও আসতে পারবে না কোনো দিন। অন্যদিকে, অনেক বেশি জটিল সজীব সিস্টেমে বৈশ্লেষিক পদ্ধতির সাফল্য সীমাবদ্ধ—কিন্তু সেখানে বিকল্প তত্ত্বও খুব বেশিদূর এগোতে পারেনি। কিছুদিন আগে অবধিও জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা বড় অংশ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে অংশ-বাদকে মেনে নিতে আগ্রহী ছিলেন না—তুলনায় ভৌতবিজ্ঞানীদের মধ্যে আপত্তি ছিল অনেক কম। কিন্তু অণুজীববিদ্যার সাম্প্রতিক সাফল্যের পর বহু জীববিজ্ঞানীই ঐ মতবাদের দিকে ঝুঁকছেন। আর আশ্চর্য মনে হলেও, যে বিষয়টি এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্মদাতা সেই পদার্থবিজ্ঞানেরই কতগুলি মৌলিক শাখায় এই দর্শন প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে।

বিজ্ঞানে এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে যেখানে কোনো এক স্তরের একটা ধারণাকে তার নীচের স্তরের সহজতর কতগুলো ধারণার সমষ্টি হিসেবে দেখতে পারায় সেটার স্বচ্ছ রূপ প্রকাশ পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাসায়নিক বিক্রিয়ার রূপ পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা যোজ্যতা (valency) বলে একটি বিমূর্ত ধারণার অবতারণা করেন। কোনো একটি মৌল ঠিক কি অনুপাতে অন্য পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে অণুর সৃষ্টি করতে পারে তা এই যোজ্যতার মান দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। যেমন অক্সিজেনের যোজ্যতা সোডিয়ামের দ্বিগুণ—তার ফলে অক্সিজেনের একটি পরমাণুর সঙ্গে সোডিয়ামে দুইটি পরমাণু যুক্ত হয়ে সোডিয়াম অক্সাইড গঠিত হয় (Na_20)। এই ধারণার গভীরতর অর্থ এবং তার সীমাবদ্ধতাও বোঝা গেল যখন বিজ্ঞানীদের পরমাণুর ইলেক্ট্রনীয় গঠন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা জন্মালো। পরমাণুর বহির্তম কক্ষের ইলেক্ট্রন-সংখ্যার সঙ্গে যোজ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হলো। উচ্চতর স্তরের সিস্টেমের (পরমাণুর) কার্যপদ্ধতি নিম্নতর স্তরের (ইলেক্ট্রনের) ধর্মের ভিত্তিতে বোঝা গেল।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর আরেকটি ধ্রুপদী সাফল্যের উদাহরণ পাওয়া যায় (চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচিত) এনট্রপির ধারণায়। তাপ চালিত ইঞ্জিনের কর্ম পদ্ধতির তত্ত্বীয় বিশ্লেষণের ফলে বিজ্ঞানীরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এনট্রপির ধারণায় উপনীত হন। চাপ বা তাপমাত্রার মত এনট্রপিও সিস্টেমের অবস্থা প্রকাশকারী একটি চলরাশি
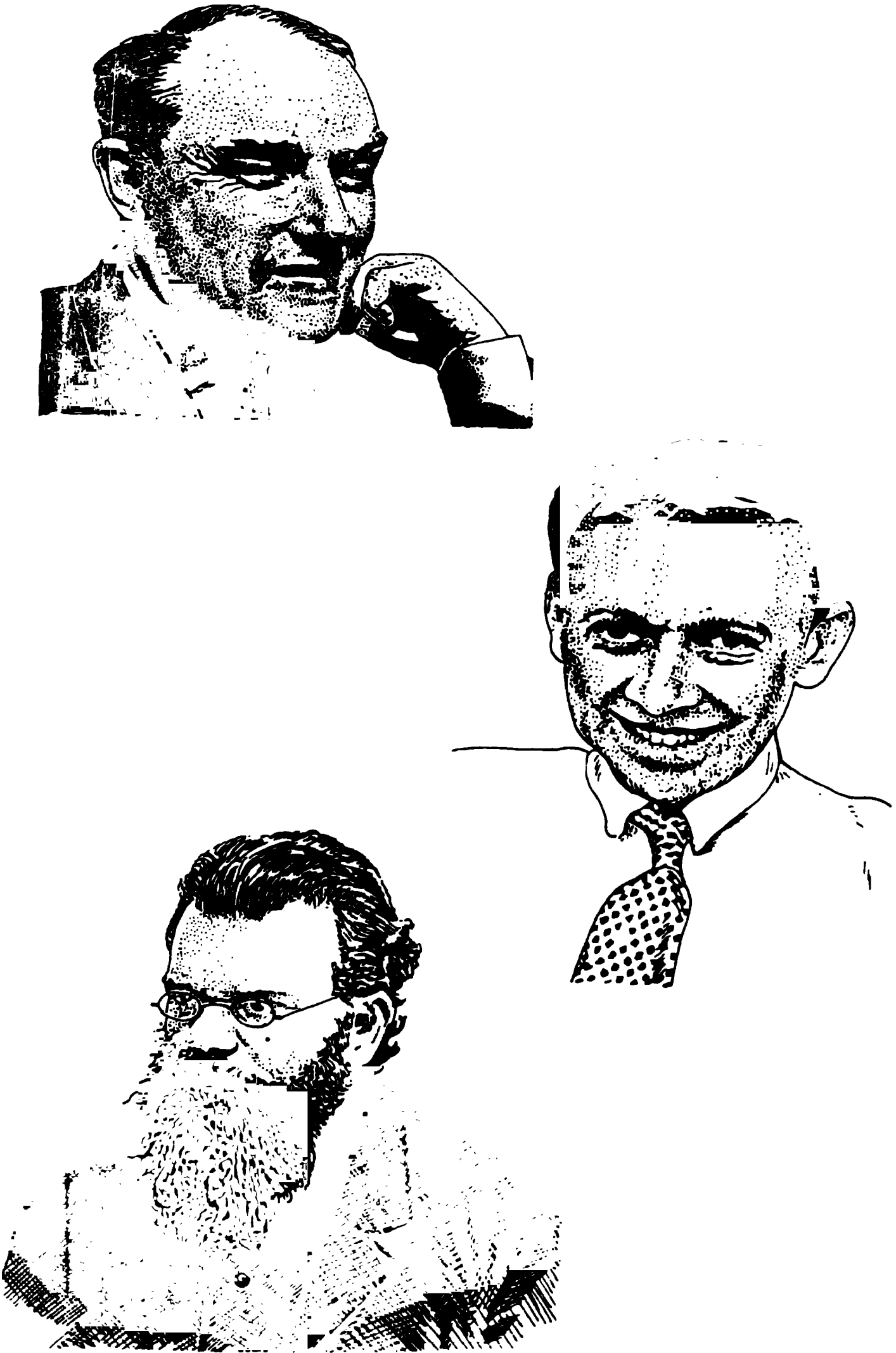
চিত্র 19·1 অংশ-বাদী বিজ্ঞানের উদগাতা কয়েকজন বিজ্ঞানী।

(variable)—যার সাহায্যে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে পরিষ্কারভাবে বোঝানো সম্ভব। বিচ্ছিন্ন সিস্টেমের এনট্রপি কখনও কমে না—এটাই সেই সূত্রায়ন। এই ধারণাটি ব্যবহার করে অনেক উদ্দেশ্য সাধিত হ'লেও, এনট্রপি বলতে ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে প্রায় সবারই ধারণা অস্পষ্ট ছিল। এটা কাটলো তখনই যখন লুড্‌ভিগ বোলট্‌সমান সিস্টেমের আরও বুনিয়াদী স্তরে অণুর ধারণার সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক বের করলেন। উচ্চতর (ম্যাক্রো) স্তরের কোনো একটা বিন্যাস নিম্নতর স্তরের যতগুলো বিভিন্নরকমের (আণবিক) বিন্যাসের ফলে সম্ভব হতে পারে তাদের সংখ্যার লগারিদ্‌মই হ'ল এনট্রপির দ্যোতক। এখানেও ক্ষুদ্রতর অংশের ধর্ম ব্যাখ্যা করে সমগ্র সিস্টেমে আচরণ স্পষ্টভাবে বোঝার বৈশ্লেষিক নীতি জয়ী হ'ল। এর আগেই গ্যাসের গতীয় তত্ত্বে (kinetic theory) এই পদ্ধতি চাপ ও তাপমাত্রার মত রাশিকে আণবিক গতির সঙ্গে যুক্ত করে একই ধরনের সাফল্য অর্জন করেছিল। তাপগতিবিদ্যা অংশে বিভক্ত রূপে সংখ্যায়ন ভিত্তিক বলবিদ্যা (statistical mechanics) নামক একটি নতুন বিষয়ের জন্মদান করল।

অংশ-বাদের সাফল্য শুধুমাত্র ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। কোন জীবের এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে যে গুণগুলি পায় তার মধ্যে অনিয়মিত পরিবর্তন (মিউটেশন) ঘটতে থাকে—এটা ডারউইনের তত্ত্বের একটা মূল কথা। বৈশ্লেষিক পদ্ধতিতে যখন এই পরিবর্তনকে আরও বুনিয়াদী স্তরে জিনের প্রতিলিপি তৈরির সময়ে উদ্ভূত ভ্রান্তির (সেটা বাইরের বা ভেতরের যে কারণেই ঘটে থাক না কেন) ফল হিসেবে দেখানো যায় তখন তার বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়ে যায়। মেন্ডেলের তত্ত্বে জিনের ধারণা কিছুটা বিমূর্ত রূপে—উচ্চ-স্তরের ধারণা হিসেবে আসে। সেটা এমন একটা কিছু যা বংশগতির বাহক। অণু-জীববিদ্যার অগ্রগতির ফলে জিনের কার্যবিধি আরও মৌলিক DNA র জৈব রাসায়নিক গঠন ও ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা গেল। ডারউইনবাদকে বিশ্লেষণ করে বিবর্তনের আরও মৌলিক, আরও নিখুঁত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা পাওয়া গেল নব-ডারউইনবাদে।

এত সব সাফল্য সত্ত্বেও সম্প্রতিকালে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে নানান রকম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর কিছুটা সামাজিক—সাংস্কৃতিক কারণে। পাশ্চাত্যে টেকনোলজির বলগাহীন বৃদ্ধির অনেক কুফল সমাজের ওপর পড়েছে। এর ফলে কিছু মানুষ টেকনোলজির স্রষ্টা যে বিজ্ঞান তার ওপরই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আবার যেহেতু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বর্তমানে আলোচ্য অংশবাদ প্রায় সমার্থক সেই হেতু ঐ দর্শনের প্রতিও মানুষ বিরূপ হয়েছেন, মনে করছেন ওতে ভালোর চেয়ে মন্দই বেশি হয়। খোদ বিজ্ঞানীদের অন্দর মহলেও ঐ দর্শন

নিয়ে বহু প্রশ্ন, সমালোচনা উঠছে—যাঁরা তুলছেন তাঁদের অনেকেই পেশাগত জীবনে ঐ তত্ত্ব অহরহ ব্যবহার করে থাকেন।

সমালোচনার মধ্যে কোনগুলি গুরুত্বহীন আর কোনগুলি সত্যিই গুরুতর বিতর্কের বিষয় তা বোঝাটা খুব দরকারী। বহু সময়েই অংশবাদকে ভুল ভাবে চিত্রিত করা হয়—তার অতিসরলীকৃত বা অতি সংকীর্ণ একটা সংজ্ঞার ভিত্তিতে সমালোচনা শুরু করে দেওয়া হয়। বহুল প্রচলিত একটা ভ্রান্তি হ'ল সংজ্ঞাটা এই ভাবে দেওয়া : অংশগুলির যোগফলই সমগ্র; এটাকে আক্ষরিক অর্থে ধরে তার সমালোচনা করা খুব সহজ। কিন্তু অংশবাদের প্রকৃত অর্থ যে ঐ সংজ্ঞায় প্রকাশিত হয় নি তা বোঝার জন্য বিজ্ঞানে পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সাধারণ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণুর ধর্ম, সোডিয়াম এবং ক্লোরিনের পরমাণুর ধর্মের যোগফল নয়। কিন্তু ঐ দুই পরমাণুর ধর্ম জানা থাকলে তা থেকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বেশ জটিল পদ্ধতি প্রয়োগ করে সোডিয়াম ক্লোরাইড অণুর ধর্ম কি হবে তা বের করা সম্ভব। ফলে বিশ্লেষণী নীতি এটা অবশ্যই বলে যে উচ্চতর স্তরের একটা ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গেলে সেটা যা দিয়ে তৈরি সেই নিম্নতর স্তরের উপাদানগুলির ধর্ম জানা থাকা দরকার। কিন্তু সে কখনোই এটা দাবী করে না যে উপাদান এবং তার দ্বারা গঠিত বস্তুর ধর্ম একে অপরের সঙ্গে খুব সহজ সম্পর্কের সূত্রে বাঁধা থাকবে। অতিপরিবাহিতা বা লেসারের মত সিস্টেমে যেখানে বিভিন্ন অংশ পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে সেখানেও এই নীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় না। কেন না ঐ সব প্রক্রিয়াকেও সিস্টেমের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বোঝা সম্ভব। একে অপরের সঙ্গে সক্রিয়-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত অংশ জুড়ে সমগ্রের সৃষ্টি—অংশ-বাদ এটাই বলতে চায়। পরস্পর সম্বন্ধহীন কতগুলি অংশের সমষ্টি হিসেবে সমগ্রকে চিত্রিত করা তার উদ্দেশ্য নয়। পূর্বোক্ত সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ কারণ তা থেকে ঐ রকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে।

আরেকটা ভুল হ'ল নিশ্চয়তাবাদ (determinism) এবং অংশবাদকে (reductionism) এক করে দেখা। এটা ঠিক যে সনাতন বলবিদ্যার (classical) বিপুল সৌধ এবং তার অনুসঙ্গী যান্ত্রিক-বিশ্বদর্শন সৃষ্টির পেছনে ঐ দুই মতবাদ এক যোগে কাজ করেছে। কিন্তু মূল বক্তব্যের বিচারে ঐ দুই দর্শন স্বতন্ত্র। কোয়ান্টাম তত্ত্বের উত্থানে নিশ্চয়তাবাদের অবসান ঘটলো, কিন্তু অণু-পরমাণু আচরণ ব্যাখ্যায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যাও বিশ্লেষণী পদ্ধতিরই আশ্রয় নিল। বিশ্বের সমস্ত রকম বল ও মৌলকণার একীকরণের যে প্রচেষ্টা আধুনিক কোয়ান্টাম ফিল্ড-তত্ত্বে চলেছে তা অংশবাদের উৎকৃষ্টতম (নাকি নিকৃষ্টতম?) উদাহরণ। আবার বড় মাপের বস্তুর ম্যাক্রো-স্তরে বিশৃঙ্খলা এবং স্ব-সংগঠন নিশ্চয়তাবাদের বিধান

লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু তারা বিশ্লেষণী নীতি অমান্য করেছে এটা জোর করে বলা যাচ্ছে না।

অংশ-বাদের সম্ভবত সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হ'ল এই যে জটিল, বিশেষত সজীব সিস্টেমের ক্ষুদ্রতর অংশ থেকে ক্রমশ বৃহত্তর অংশে যেতে থাকলে একেকটা স্তরে যে গুণগত ভাবে নতুন ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে তাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার অবকাশ এই পদ্ধতিতে নেই। 'আত্মপ্রকাশের' ঐ বিশেষ স্তরগুলো অনন্য—সেগুলোকে ক্ষুদ্রতর খণ্ডে ভেঙে ফেললে অংশের মধ্যে ঐ ধর্মের প্রকাশ দেখা যায় না। যেমন আমাদের মস্তিষ্কের চিন্তা-কল্পনা নিশ্চয় আরও বুনিয়াদী স্তরের জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত; আবার ঐ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মূলেও রয়েছে অণু-পরমাণুর ক্রিয়া-বিক্রিয়া। কিন্তু বর্ণনার এই প্রত্যেকটা স্তরেই স্বতন্ত্র— প্রত্যেক স্তরেরই নিজস্ব কিছু নিয়মাবলী আছে। এদের সব ক্রিয়াকর্মকেই শেষ অবধি অণুপরমাণুর গতিতে পরিণত করে বুঝে ফেলা যাবে—এরকম ভাবাটা একটু বাড়াবাড়ি। তাই, এই সমালোচকদের মতে, বিশ্লেষণী পদ্ধতির মধ্যে এই ফাঁকটাই তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা—জটিল সিস্টেমের উচ্চতর স্তরে যে নতুন ধর্ম ও বিন্যাস আত্মপ্রকাশ করে তার ব্যাখ্যা যোগানোর ক্ষমতা এ পদ্ধতির নেই।

সমালোচনাটা গুরুতর। কিন্তু তবু মনে হয় এতে করে আলোচ্য দর্শনকে একটু ভুল বোঝা হয়। জটিল সংস্থার বিভিন্ন স্তরে যে একগুচ্ছ স্বতন্ত্র নিয়ম কার্যকর হয়— এ সত্যটা ঐ দর্শনে বিশ্বাসী কোন বাস্তববোধ সম্পন্ন মানুষ অস্বীকার করবেন না— অন্ধবিশ্বাসীর কথা আলাদা। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন নিয়ম কার্যকর হওয়ার উদাহরণ বিজ্ঞানে অনেক—তার অনেকগুলো আমাদের আলোচনায় ইতিমধ্যে উল্লেখিতও হয়েছে। এই দর্শনের বক্তব্য এইটুকু যে উচ্চস্তরের ঐ নিয়মাবলী পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক (phenomenological)—সত্যিকারের মৌলিক, বুনিয়াদী নিয়মাবলী (fundamental laws) পাওয়া যাবে একদম নিম্নতম স্তরে। এখন নিম্নতম স্তরের নিয়ম থেকে উচ্চস্তরের নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি অত্যন্ত দুরূহ হতে পারে—সেক্ষেত্রে উচ্চতর নিয়মগুলির সত্যতা নিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়াই সুবিধাজনক। কিন্তু সেখানেও, ঐ দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তি বলবেন যে নীতিগত ভাবে তলার নিয়ম থেকে ওপরের নিয়ম পাওয়া সম্ভব—এই মুহূর্তে হয়ত সেটা পেরে ওঠা যাচ্ছে না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোনো দিনই সেটা পারা যাবে না এবং সেই বাহানায় অংশবাদকে ত্যাগ করাও চলবে না।

এইভাবে দেখলে মনে হয় অংশবাদের সঙ্গে পূর্ণ-বাদের (Holism) বিরোধ যতটা তীব্র বলে বলা হয়ে থাকে কার্যক্ষেত্রে ততটা নয়। দুই মতের মূল ফারাক হল

এই ঃ উচ্চতর বিন্যাসের কতগুলি বিশেষ স্তরে যে নতুন নিয়মের আবির্ভাব ঘটে পূর্ণ-বাদে সেগুলোকে মৌলিক এবং স্বাধীন হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। নিম্নতর স্তরের নিয়মগুলির সঙ্গে তাদের কোনো বিরোধ থাকলে চলবে না—কিন্তু তার মানে এই নয় যে নীচের নিয়মাবলীর অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে ওপরের নিয়মটিকে বের করে ফেলা যাবে। নীচের স্তরের নিয়মাবলীর ভিত্তির ওপরে প্রকৃতির নতুন, বাড়তি নিয়ম হিসেবে এগুলি আত্মপ্রকাশ করে। উদাহরণ হিসেবে টপোলজির নিয়মাবলীর কথা বলা যায়। ত্রিমাত্রিক দেশে প্রযোজ্য ঐ নিয়মাবলী ইউক্লিডীয় জ্যামিতির কোনো সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করে না—কিন্তু শুধু জ্যামিতির নীতি থেকে টপোলজির নিয়মাবলী পাওয়াও যায় না—তারা নতুন, অতিরিক্ত একগুচ্ছ নিয়ম। এই তুলনা থেকে পূর্ণবাদীদের বক্তব্য কিছুটা স্পষ্ট হয়। কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়। পূর্ণবাদের উপরোক্ত বক্তব্য যদি ঠিক বলে মানতে হয় তাহলে ওপরের স্তরের নিয়মের কিছু অংশ নীচের নিয়মাবলী কখনোই ব্যাখ্যা করতে পারবে না—কিছুটা অবশেষ থেকেই যাবে। নইলে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যাখ্যা ও নিয়মের সমস্যা এসে পড়বে। বিভিন্ন স্তরের নিয়মের মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে। নীচের স্তরের নিয়মাবলীতে বুনিয়াদী, মৌলিক রাশি সমূহ—অবস্থান, বেগ, শক্তি ইত্যাদি—অন্তর্ভুক্ত। তাদের সঙ্গে ঠিক আর কি কি মৌলিক ধারণা যোগ করলে উচ্চস্তরের নিয়মাবলী পাওয়া যাবে তা স্পষ্ট নয়।

বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় অংশ-বাদ এবং পূর্ণ-বাদ উভয়েই জটিল সিস্টেমে উচ্চ-স্তরীয় নিয়মাবলীর অস্তিত্ব মেনে নেয়। দৃষ্টিভঙ্গীর ফারাকটা প্রকট হয় ঐ নিয়মগুলির চরিত্র বিচারের সময়। অংশ-বাদ তাদেরকে মৌলিক চরিত্রের বলে স্বীকার করে না, পর্যবেক্ষণজাত গৌণ নিয়ম বলে মনে করে, যাদের ভাঙতে পারলে শেষ অবধি তারা নিম্নতম স্তরের নিয়মগুলো দিয়েই গড়া বলে দেখা যেত। অন্যদিকে পূর্ণবাদী মতে এই নিয়মেরা আর কারোর চেয়ে কম মৌলিক নয়। ফলে আরও বুনিয়াদী স্তরের নিয়মের সাহায্যে এদের গঠন করা যায় কিনা সেটা দেখতে পাওয়া নিষ্প্রয়োজন। আজও অবধি যা জানা গেছে তার ভিত্তিতে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো একটিকে সম্পূর্ণ ভুল বলে বাতিল করা সম্ভব নয়। কিন্তু এর মধ্যে কোনো একটিকে একজন বিজ্ঞানী গ্রহণ করলে তা অনেকাংশে তাঁর গবেষণার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। জটিল সজীব সিস্টেমকে বোঝার জন্য একজন অংশ-বাদী সম্ভবত অণুজীববিদ্যা প্রদর্শিত পথ বেছে নেবেন—আর একজন পূর্ণবাদী হয়ত সেক্ষেত্রে প্রিগোজিনের তত্ত্বের পথ ধরে সাম্য থেকে দূরে উদ্ভূত স্ব-সংগঠিত বিন্যাস খুঁজতে চাইবেন। বিশৃঙ্খলা, ফ্র্যাকটাল বা স্ব-সংগঠনের উদাহরণ অংশ-বাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে দুর্বল করে দেয়—অন্তত আমি তা মনে করি না। আমার মতে ঐ ধারণাগুলি জটিল সিস্টেমকে বোঝার পূর্ণবাদী প্রয়াসের ফল, ঠিকই, কিন্তু তার

মানে এই নয় যে কোনোদিন আরও বুনিয়াদী কিছু ধারণার ভিত্তিতে তাদেরকে বোঝা যাবে না।

যে বিষয়কে অংশবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সবচেয়ে জোরালো সমর্থক হিসেবে ভাবা হ'ত সেই মৌলকণা সংক্রান্ত পদার্থবিজ্ঞানই হয়তো শেষ অবধি তার সবচেয়ে বড় সমালোচক হয়ে দাঁড়াবে। একদিকে যেমন মৌলকণিকাবাদ ক্রমাগত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কণা আবিষ্কার করে অংশবাদী পথেই এগিয়ে চলেছে—অন্যদিকে ক্ষুদ্র কণিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় এমন সব ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যাতে মনে হয় যে অংশবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গভীর সমস্যার মুখোমুখি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পারমাণবিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যায় যথেষ্ট সফল হলেও তার তাত্ত্বিক গঠনের মধ্যে বিভ্রান্তির বহু অবকাশ রয়ে গেছে। এই তত্ত্বে, কোনো পারমাণবিক সিস্টেমের যে অবস্থা মেপে দেখা হচ্ছে এবং যে ব্যবস্থা দ্বারা তা মাপা হচ্ছে সে দুটো জিনিস পরস্পর নির্ভরশীল। একটা ইলেকট্রনের আচরণ কণার মত না তরঙ্গের মত প্রতিভাত হবে তা নির্ভর করে কিভাবে সেটা মাপা হচ্ছে তার ওপর। ইলেকট্রনের নির্ণেয় অবস্থা নির্ভর করছে পর্যবেক্ষণের নিজের অবস্থার ওপর—এ থেকে ধারণা হবে যে নিম্নতম স্তরের অবস্থা নির্ভর করছে উচ্চতম স্তরের ওপর। পরিস্থিতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে না গিয়েও একটা জিনিস আমরা লক্ষ করতে পারি—অংশ বাদে কার্য-কারণ পরম্পরার গতি ঊধর্ধমুখী ঃ সেখানে নিম্নতম স্তরের উপাদান দিয়ে উচ্চতর স্তরগুলি গঠন করা হচ্ছে। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ইঙ্গিত করছে যে প্রকৃতিতে এর ঠিক উল্টো, নিম্নগামী কার্যকারণেরও অস্তিত্ব রয়েছে যেখানে উচ্চতর স্তর নিম্নতর স্তরের চরিত্র নির্ধারণ করছে।

এই ধরনের নিম্নগামী কার্য-কারণ সম্পর্কের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের বাইরেও আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের আলোচনাতেও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে জটিল জৈব সিস্টেমের ভবিষ্যত উদ্দেশ্যের অভিমুখে কাজ করা বা নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী চলাকে অংশবাদী বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সব দেখে কিছু বিজ্ঞানী নিম্নগামী বা পশ্চাৎমুখী কার্য-কারণ সম্বন্ধকেও প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে আগ্রহী হয়েছেন। অণু-পরমাণুর শুধুমাত্র মাইক্রো স্তরের জানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের সার্বিক গতির মধ্যে এমন সামঞ্জস্য বিধান করছে যাতে করে শেষ অবধি "ইচ্ছেমত কাজ" করার মত জটিল পরস্পর সম্বন্ধিত একটা ক্রিয়া জীবদেহে সৃষ্ট হচ্ছে—এরকম প্রত্যাশা করাটা খুব সঙ্গত নয়। এর পরিবর্তে, অনেকের কাছে, নিম্নগামী কার্য-কারণ সম্বন্ধ বেশি গ্রহণযোগ্য—যেখানে "স্বাধীন ইচ্ছা" মধ্যবর্তী অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করে শেষ অবধি অণু-পরমাণুতে নিজের প্রয়োজন মত গতি আরোপ করতে সক্ষম হচ্ছে।

কুড়ি

দেখার ধরন পাল্টে গেল

এ বইয়ের মুখ্য আলোচ্য বিষয়—জটিলতা; এর আলোচনাই বিভিন্ন রূপে সারা বইটি জুড়ে রয়েছে। প্রকৃতিতে জটিল সিস্টেমের প্রাধান্যই বেশি—সরল সিস্টেমগুলি ব্যতিক্রম। অথচ কিছুকাল আগে অবধিও বিজ্ঞান, বিশেষত ভৌত বিজ্ঞান, প্রধানত সরল সিস্টেম ও প্রক্রিয়ার ওপরই তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিল। স্প্রিং, দোলক, কঠিন বস্তু, স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ, প্রায়-স্থিতিশীল তাপগতীয় অবস্থা বা একটি ইলেকট্রন যুক্ত পরমাণু—এই জাতীয় আদর্শ মডেলের ভিত্তিতেই বিজ্ঞান চলতো। এটা অকারণে ঘটেনি—এর পেছনে একধরনের দূরদৃষ্টি, পরিকল্পনা কাজ করেছে। প্রকৃতিকে বোঝার কাজে সরল রৈখিক সিস্টেম নিয়ে কাজ করা অনেক সহজ— দুটো প্রতিযোগী তত্ত্বের মধ্যে কোনটা ঠিক তা পরীক্ষা করে দেখা এ ধরনের সিস্টেমে সহজসাধ্য—এ জাতীয় সিস্টেমের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি অবধি কষে বের করা যায়। তাই, এদের নিয়ামক সরল এবং যথাযথ নিয়মাবলীর মধ্যেই প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম খুঁজে পাওয়া যাবে—জটিল সিস্টেমের অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যের মধ্যে সেটা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা—এই রকমই ভাবা হ'ত।

প্রায় চার শতক ধরে এই পরিকল্পনা মাফিক কাজ হয়ে এসেছে। কয়েকটি কণার বলবিদ্যা দিয়েই কণাগোষ্ঠীর আচরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সরলতম পরমাণু হাইড্রোজেনের মডেলকে আশ্রয় করে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার যাত্রা শুরু। রসায়ণে অণু-পরমাণুর গতিবিধির ঠিকানা পাওয়া গেছে, পর্যাবৃত্ত দোলকের এক রৈখিক মডেল থেকে। এই পদ্ধতির অভূতপূর্ব সাফল্য এক কিংবদন্তীর জন্ম দিল : জটিল সিসটেমের মধ্যে নতুন এমন কিছুই পাওয়া যাবে না যা সরল রৈখিক সিসটেমের মধ্যে নেই। প্রকৃতিতে প্রায় সর্বত্র যে অরৈখিকতা চোখে পড়ে তাকে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা বলে ধরা হ'ত—একটা বিরক্তিকর বিচ্যুতি—যাকে হয় অগ্রাহ্য করা হ'ত অথবা মূল রৈখিকতার ওপরে অপতিত বিচলন হিসেবে ধরা হ'ত। এই মনোভাব সত্ত্বেও সনাতন বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে অরৈখিকতা সজোরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আইনস্টাইনের

সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের একটি বিশিষ্ট গুণ এই অরৈখিকতা। এরকম কথাও বলা হত যে গোটা ছয়েক ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ আর তাদের ওপর আরোপিত শর্তাবলী—এই নিয়েই হ'ল পদার্থবিজ্ঞান (পোয়াসঁ, শ্রোডিঙ্গার এবং ডিরাক সমীকরণ—সঙ্গে চলতরঙ্গ এবং ব্যাপন সংক্রান্ত সমীকরণ)। বিশ্ব-স্রষ্টার নিজস্ব চিন্তা প্রকাশিত হচ্ছে ঐ রৈখিক সমীকরণগুলিতে। জটিলতা আর অরৈখিকতা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন।

বিশৃঙ্খলার আবিষ্কারের ফলে সর্বপ্রথম এই দৃষ্টিভঙ্গী অচল হয়ে পড়ল। দেখার ধরন পাল্টে গেল। মেনে নেওয়া হ'ল যে জটিলতা তার নিজের মত করে, স্বভূমিতে চিত্তাকর্ষক। অরৈখিকতা মানে রৈখিকতার সঙ্গে কিছু বিচ্যুতির যোগফল নয়। জটিলতা ও অরৈখিকতার এক নিজস্ব জগত রয়েছে, রয়েছে নিজস্ব নিয়ম এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে নতুন অন্তর্দৃষ্টি। রৈখিক জগতের নিয়ম থেকে এগুলো পাওয়া সম্ভব নয়। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে প্রধাণত অরৈখিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হ'ল।

চিন্তার স্তরে জটিলতার ধারণাকে আয়ত্ত করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু সংজ্ঞার স্তর থেকে সংখ্যা ও পরিমাণের কঠিন ভূমিতে তাকে নিয়ে আসা সহজ নয়। নানাভাবে সে চেষ্টা করা হয়েছে। সিস্টেমের বর্ণনা সম্পূর্ণ করতে যে পরিমাণ তথ্য লাগে তার ভিত্তিতে, এনট্রপির ধারণার ভিত্তিতে বা শৃঙ্খলাহীনতার মাত্রার ভিত্তিতে জটিলতার সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। যেমন AWHZCM—এই নিয়মবিহীন শ্রেণীটির বর্ণনা দিতে যতটা তথ্য লাগবে—ABABAB এই নিয়মিত শ্রেণীর বর্ণনা দিতে তথ্য লাগবে তার চেয়ে কম। কিন্তু শৃঙ্খলাহীনতার (randomness) সংজ্ঞাই খুব স্পষ্ট নয়। 'অজ্ঞানের' চোখে যেটা নিয়মবিহীন বলে মনে হচ্ছে 'জ্ঞানীর' দৃষ্টি সেখানে নিয়ম খুঁজে পেতেই পারে। সংজ্ঞা ব্যক্তিনিরপেক্ষ না হলে সেটা বিজ্ঞানের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। হয়তো প্রকৃত শৃঙ্খলাহীনতা বলে কিছু নেই। অথবা, অনেকের মতে, এরকমও হতে পারে যে একমাত্র কোয়ান্টাম স্তরের ঘটনাতেই তার দেখা মেলা সম্ভব। এসবের মধ্যে থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হল এই যে জটিলতাকে একটি পরিমাপযোগ্য রাশি দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করলেই গণ্ডগোল বাধছে। এই সমস্যার মোকাবিলা করতে কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা অ্যালগরিদ্‌ম্ (Algorithm) ভিত্তিক এক সংজ্ঞার সাহায্য নিয়ে থাকেন। এর্তে সংক্ষিপ্ততম যে অ্যালগরিদ্‌ম্ সিস্টেমের সম্পূর্ণ বর্ণনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম তার ধাপ-সংখ্যাকে সিস্টেমের জটিলতার মাপ হিসেবে ধরা হয়। প্রকৃতিতে জটিলতার যে বহুবিচিত্র রূপ দেখা যায় তার কতটা এই সংকীর্ণ সংজ্ঞায় ধরা পড়ে—সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

আরেকটু কম বিমূর্ত রূপে জটিলতার সংজ্ঞা এভাবেও দেওয়া হয় : যখন

সিস্টেমের স্বাধীনতার মাত্রা (degrees of freedom) সংখ্যায় অনেক হয়ে যায় অর্থাৎ তার বর্ণনার জন্য বহুসংখ্যক চলরাশির প্রয়োজন হয় তখন তা জটিল হয়ে পড়ে। এখানে বক্তব্যটা খুব পরিষ্কার, কিন্তু তাও কিছু সমস্যা থেকে যায়। একগ্রাম হাইড্রোজেনের তুলনায় দু-গ্রাম হাইড্রোজেনের স্বাধীনতার মাত্রা দ্বিগুণ হবে, এনট্রপিও হবে দ্বিগুণ। কিন্তু তা বলে দ্বিতীয় সিস্টেমটিকে প্রথমটির তুলনায় দ্বিগুণ জটিল বলা অর্থহীন। স্পষ্টতই জটিলতার পরিমাণগত এবং গুণগত দুটি দিকই রয়েছে—দ্বিতীয় দিকটিকে সংখ্যা-গণনায় ধরা বেশ কঠিন। উপরোক্ত বক্তব্যের উল্টোপিঠ হ'ল এই ধারণা যে অল্পসংখ্যক স্বাধীনতার মাত্রাবিশিষ্ট সরল সিস্টেমের আচরণও সরল হবে। বিশৃঙ্খলার আবিষ্কার এই ধারণাকে সম্পূর্ণ ভুল বলে প্রমাণিত করেছে। সিস্টেম সরল হলেই তার আচরণ সরল হয় না। একমাত্রিক অরৈখিক সিস্টেমেও অত্যন্ত জটিল আচরণ পরিলক্ষিত হয়—পর্যায় দ্বিগুণ হওয়া, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি, বিশৃঙ্খল অঞ্চলে পর্যাবৃত্তির সরু ফালির উদ্ভব ইত্যাদি এর উদাহরণ। সিস্টেম সরল এবং তার বিবর্তনের সূত্র নিশ্চয়তাবাদী হলেও অরৈখিকতা সব কিছু উল্টোপাল্টা করে দিতে পারে।

জটিলতা বহু রূপে প্রকাশিত হয়। তারমধ্যে দুটো রূপের দেখা প্রায়ই মেলে —সে দুটোর মধ্যে আবার আপাত বিরোধ রয়েছে। এর একটা হ'ল শৃঙ্খলাহীনতা। জটিল সিস্টেমের আচরণ এলোমেলো, অনিয়মিত হয়—তা আগে থাকতে আন্দাজ করা যায় না। এই এলোমেলো আচরণের প্রকাশ দেশে, কালে বা উভয় ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। এরকম ঘটতে দেখলে প্রথমেই যেটা করা হয় সেটা হ'ল একটা এলোমেলো কারণের সন্ধান করা—সিস্টেমের ভেতরে বা বাইরে। পাতলা কাগজের টুক্‌রোকে একটু ওপর থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় ছেড়ে দিলে এলোমেলো গতিতে সে নীচের দিকে পড়ে। হাওয়ার এলোমেলো বিক্ষোভ এখানে কারণ হিসেবে কাজ করছে—কাগজের গতি তার ফল। তরলে ভাসমান পরাগ রেণুর এলোমেলো ব্রাউনীয় গতি তার ওপর চারিদিক থেকে তরল-অণুর অসম, এলোমেলো আঘাতের ফল। এলোমেলো ভাবে তুব্‌ড়ে যাওয়া বাচ্চার খেলনাটার আকার এলোমেলো আছাড়ের ফল। কারণ এলোমেলো হলে তার ফলও এলোমেলো।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এলোমেলো ঘটনাকে বিচার করার রীতি নতুন বিজ্ঞান এসে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। আমরা বুঝতে শিখেছি যে আপাত নিয়মহীনতা প্রায়শই একটা মুখোশ—যার আড়ালে অপ্রত্যাশিত শৃঙ্খলা লুকিয়ে থাকে। এলোমেলো ভাবটা সর্বদা না হলেও প্রায়শই সত্যি নয়। প্রকৃতিতে স্বতঃস্ফূর্ত যে সব অনিয়মিত আকৃতি দেখতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে একধরনের প্রতিসাম্য প্রচ্ছন্ন থাকে—বিভিন্ন স্কেলে আকৃতির স্ব-সাদৃশ্য বজায় থাকে। তটরেখা, মেঘ বা পাহাড় বিবর্তনের বিভিন্ন স্কেলে একইরকম দেখতে। ছোট টুকরোয় ভেঙে যাওয়া, জমাট

বাঁধা, পারকোলেশন, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ইত্যাদি বহু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় স্ব-সদৃশ, ফ্র্যাকটাল আত্মপ্রকাশ করে। অনিয়মিত আকার তাদের অনেক বেশি কুশলতা সহকারে জায়গা ভরাট করার সুযোগ দেয়। ফুসফুস সংলগ্ন সূক্ষ্ম নালিকাগুলিতে এটাই দেখা যায়। একইভাবে সময় বা কালের সাপেক্ষে অনিয়মিত আচরণের গভীরে অদ্ভুত দর্শন শৃঙ্খলা লুক্কায়িত থাকে। একটা দোলকের আন্দোলনে কোনো ছন্দ না থাকতে পারে; পোকামাকড়ের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধিকে সম্পূর্ণ সৃষ্টিছাড়া মনে হতে পারে; মহামারীর প্রসার ও সঙ্কোচনের মধ্যে নিয়মবদ্ধ কিছু চোখে না পড়তে পারে; চিরদিনের মত আজও আবহাওয়ার পরিবর্তনের কোন ঠিক-ঠিকানা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা যাবে না যে এই সব ঘটনার পেছনের কারণগুলোও এলোমেলো। আপাত অনিয়মিত আচরণের তলায় এক ধরনের শৃঙ্খলা সুপ্ত থাকতে পারে—এই বিশৃঙ্খলার নিয়ামক সূত্রগুলি অনিশ্চিত না হয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত চরিত্রের (deterministic) হতে পারে। প্রাথমিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীলতা অতীব সংবেদনশীল হওয়ার ফলেই নিশ্চয়তাবাদী সূত্রের প্রভাবেও অনিশ্চিত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। বিশৃঙ্খলা এবং ফ্র্যাকটালের মূল বক্তব্য একই ঃ এলোমেলো কারণ থেকেই সবসময় এলোমেলো ফল পাওয়া যায় তা নয়। বহু সময়েই সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক রূপান্তরের পুনরাবৃত্তি কিংবা নিশ্চয়তাবাদী নিয়মের প্রভাবেও আপাতদর্শন অনিয়মিত আকৃতি বা বিশৃঙ্খল আচরণের সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিয়ম বা শৃঙ্খলা শূন্য নয়।

জটিলতার দ্বিতীয় রূপটির প্রকাশ সুশৃঙ্খল, স্ব-সংগঠিত বিন্যাসের সৃষ্টিতে। সাম্যাবস্থার তাপগতিবিদ্যা এর উল্টোটাই ঘটতে দেখে—সুসংগঠিত আকার সেখানে নিরাকার বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়। সিস্টেম কে ঠাণ্ডা করতে থাকলে এক ধরনের সাম্যস্থিত সরল বিন্যাসের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সিস্টেমকে ক্রমাগত বস্তু এবং শক্তির যোগান দিয়ে যেতে থাকলে যে জটিল গতিময় বিন্যাস নিজেই নিজেকে সংগঠিত করে তোলে (বিশেষত সজীব সংস্থা) তার কোনো স্থান ঐ বিদ্যায় নেই। প্রিগোজিনের ব্যাখ্যা জটিলতার এই দিকটার ওপর আলোকপাত করে। সাম্য থেকে অনেক দূরে অবস্থিত মুক্ত সংস্থা দেশ এবং কালের প্রেক্ষিতে জটিল, স্ব-সংগঠিত বিন্যাস সৃষ্টি করতে পারে। এই অবক্ষয়ী সংস্থাগুলি বাইরে থেকে নিরন্তর জড়বস্তু ও শক্তি গ্রহণ করে নিজেদের সুশৃঙ্খল করে গড়ে তোলে এবং সেই শৃঙ্খলা বজায় রাখে। একই সঙ্গে তারা পরিপার্শ্বকে তাপ এবং অন্য বর্জ্য পদার্থের রূপে এতটা এনট্রপি ফিরিয়ে দেয় যাতে সামগ্রিকভাবে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের নির্দেশ বজায় থাকে। এই অবক্ষয়ী বিন্যাসের ধারণার মধ্যে প্রকৃতির সৃজনশীল রূপটি ধরা পড়ে—যার প্রকাশ ছোট মাপে জড় সংস্থায় এবং বিপুল আকারে প্রাণের উদ্ভব ও অভিব্যক্তির মধ্যে আমরা দেখতে পাই।
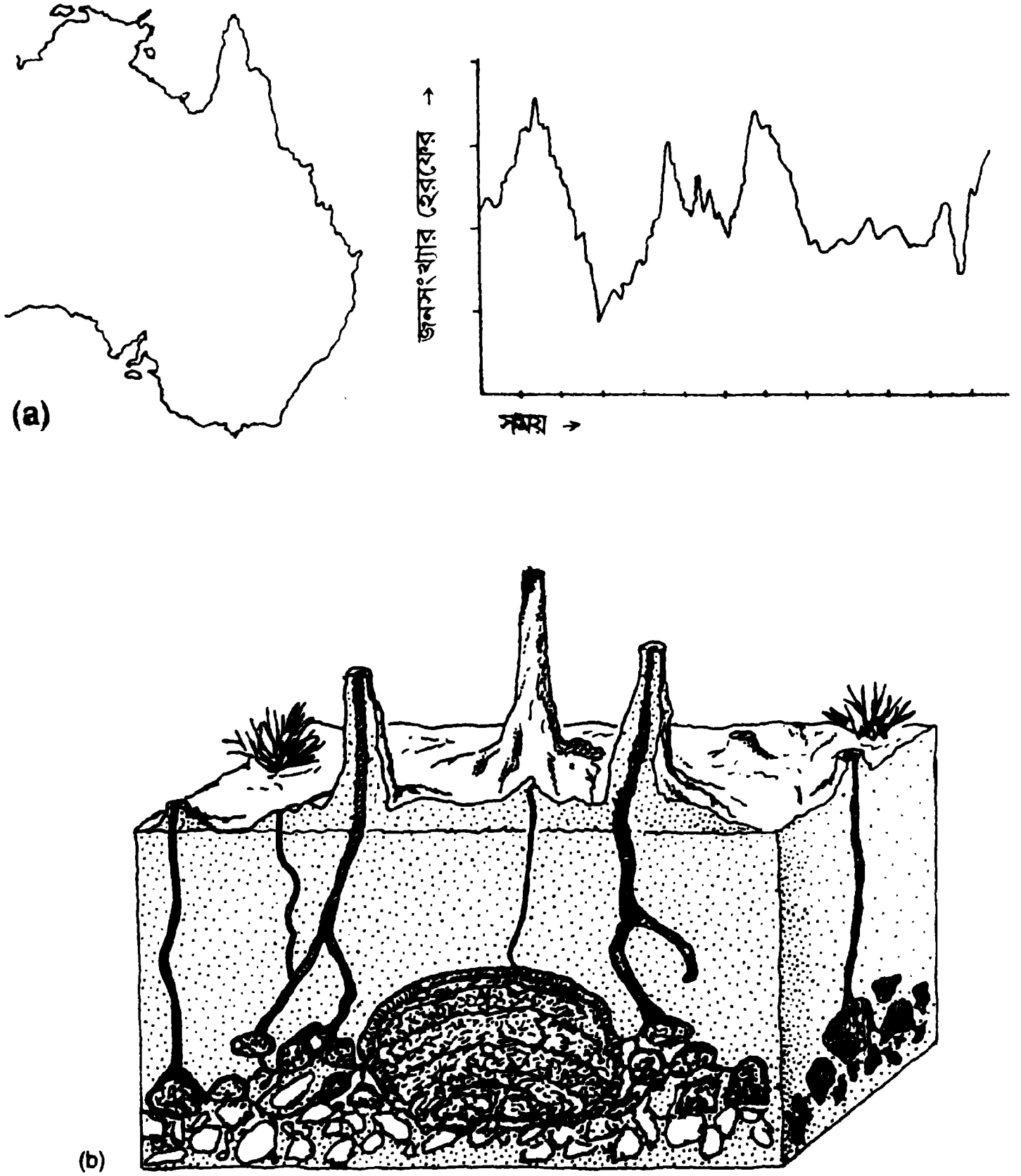
চিত্র 20·1 জটিলতার দুই রূপ : (a) দেশে (তটরেখা) ও কালে (এলোমেলো প্রাণীসংখ্যা) অনিয়মিত আচরণ (b) দেশে ও কালে বিন্যাস ও স্ব-সংগঠন (উইপোকা ঢিপির আকারের বাসা তৈরি করছে।)।

বিশৃঙ্খলা এবং স্ব-সংগঠন—জটিলতার এই দুই রূপকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের উৎস অভিন্ন : অরৈখিকতা। অরৈখিকতাজাত এই দুই ঘটনার আরও এক জায়গায় মিল রয়েছে—এরা কেউই পূর্বনির্ধারণযোগ্য নয়। প্রাথমিক অবস্থার ওপর অতি-সংবেদনশীল নির্ভরতার জন্য

বিশৃঙ্খলায় কি ঘটবে আগে থেকে আন্দাজ করা যায় না। আর স্ব-সংগঠনে এই অনিশ্চয়তা দেখা দেয় সাম্য থেকে দূরবর্তী দ্বি-বিভাজন বিন্দুতে। ঐ বিন্দুতে ছোট মাপের, পরিবেশ-সৃষ্ট সামান্য বিচ্যুতি পরিবর্ধিত হয়ে বিশাল আকার ধারণ করে এবং সিস্টেমকে সম্ভাব্য বহু সংখ্যক পথের একটিতে ঠেলে দেয়। কিন্তু কোন পথ নির্বাচিত হবে তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। বস্তুত বিশৃঙ্খলা হয়তো ঐ সম্ভাব্য পথগুলির একটি। স্ব-সংগঠন এবং বিশৃঙ্খলার সহাবস্থানও দেখা যায়। বৃহস্পতি গ্রহের আবহমণ্ডল প্রধানত বিশৃঙ্খল, কিন্তু সেখানে একটি স্ব-সংগঠিত বিন্যাস নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে—বৃহস্পতির লাল চোখ (Great Red Spot)।

সচরাচর 'বিশেষ'-কে জটিলতার সঙ্গে যুক্ত বলে ধরা হয় আর নির্বিশেষ, সার্বিকতাকে সরল সংস্থার সঙ্গে। জটিলতা বাড়লে সিস্টেমটি আরও বিশিষ্ট এবং আরও অনন্য হয়ে ওঠে। একটি ভারতীয় শিশুর আচরণের সঙ্গে এক ইংরেজ শিশুর আচরণের পার্থক্য সামান্যই। কিন্তু বয়েস এবং জটিলতা বাড়তে থাকলে পার্থক্যও বাড়তে থাকে। বিশৃঙ্খল সিস্টেমের বিজ্ঞান এ ব্যাপারে একটা আশ্চর্য কথা প্রকাশ করেছে। ভৌত গঠন এবং গাণিতিক চরিত্রে যাদের মধ্যে কোনো মিল নেই এমন অনেক জটিল সংস্থার বিশৃঙ্খলতায় পৌছনোর রাস্তা অভিন্ন। এই অভিন্নতাকে নিঁখুতভাবে সংখ্যায় প্রকাশ করা গেছে। আর বিশৃঙ্খলতায় সুপ্ত এই অভিন্নতা, এই সার্বিকতাই এত বেশি করে বিষয়টির দিকে বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করেছে। জটিলতার সঙ্গে সার্বিকতার সহাবস্থান, দেখা যাচ্ছে, সম্ভব।

যে সব জিনিসকে এই নতুন বিজ্ঞান পরিবর্তিত দৃষ্টিতে দেখতে শেখালো তার মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল স্থায়িত্বের (stability) ধারণা। আমরা জানি জটিল সিস্টেম অদ্ভুত রকমের সুস্থিত এবং শক্তপোক্ত হতে পারে। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ আমরা নিজেরা। মানুষ অত্যন্ত জটিল সজীব সিস্টেমের উদাহরণ। সর্বব্যাপী বিচলন—বিচ্যুতির প্রভাবে বিশৃঙ্খলার মধ্যে তার অবলুপ্তি ঘটার কথা। কিন্তু তা ঘটে না। মানুষের আচরণের জটিলতা অকল্পনীয় অসংখ্য এলোমেলো দাবীর টানা পোড়েনে তার পাগল হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না। অবক্ষয়ী সিস্টেমের ধারণা এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করে। দুটো দ্বি-বিভাজন বিন্দুর মধ্যবর্তী স্থানে সিস্টেম সুস্থিত, যদিও ঐ বিন্দুতে সে ভীষণরকম অস্থির। এই সুস্থিতি আসে অবক্ষয় থেকে। জটিল সিস্টেমে শক্তির অবক্ষয় ক্ষতিকারক নয়। তাকে কমানোর চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে অনেক খানি শক্তি এবং এনট্রপি সিস্টেম থেকে বাইরে চলে যায়, তাপ এবং অন্য বর্জ্য পদার্থের আকারে। তাতে সিস্টেম আকস্মিক বিচলনের হাত থেকেও বেঁচে যায়। অবক্ষয় এখানে শৃঙ্খলা এবং সুস্থিতি বজায় রাখার কাজ করছে।

অবক্ষয়ের এই ভূমিকা একটু আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। কিন্তু এটা নতুন কিছু নয়। অরৈখিক যান্ত্রিক (mechanical) সিস্টেমও অবক্ষয়ের উপস্থিতিতে (বাহ্যবল চালিত বাধাপ্রাপ্ত দোলক) সুস্থিত অবস্থার (আকর্ষক) দিকে চলে যায়—তার প্রাথমিক অবস্থা যাই হোক না কেন। ফেজ্ স্পেসে সেই আকর্ষক একটি বিন্দু হতে পারে, হতে পারে একটি বদ্ধ লুপ (লিমিট সাইক্ল্)। বিশৃঙ্খলার আবিষ্কারের পর স্থায়িত্বের ধারণায় একটা অদ্ভুত প্যাঁচের সৃষ্টি হয়েছে। সচরাচর সুস্থিতির অনুষঙ্গে শৃঙ্খলা এবং পূর্বানুমান ক্ষমতার ধারণাই আসে। বিশৃঙ্খলার সহগামী অনিয়ম এবং অনিশ্চয়তাকে সুস্থিতির ঠিক উল্টো গুণ বলেই মনে হয়। কিন্তু আসলে তা নয়। অস্থিতিশীলতার সঙ্গে প্রকৃত বিশৃঙ্খলার (chaos) তফাত কি তা এই নতুন বিজ্ঞান স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে—অদ্ভুত আকর্ষকের ধারণার মাধ্যমে। ফেজ্ স্পেসে বিশৃঙ্খল সিস্টেমের বিভিন্ন নিকটবর্তী বিন্দুর পথরেখা সমূহ ক্রমশ পরস্পরের থেকে এক্সপোনেনশিয়াল হারে দূরে চলে যায়, কিন্তু তবু তারা ফেজ স্পেসের একটা সসীম অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। এরফলেই বিশৃঙ্খল আকর্ষকের আকৃতিতে ভাঁজের ওপর ভাঁজ দেখা যায়—এক সূক্ষ্ম বুনোট যার এক অংশ অপর অংশকে কখনো ছেদ করে না। কুশলতার সঙ্গে জায়গা ভরাট করার প্রয়োজন এর আকৃতিকে ফ্র্যাকটাল করে তোলে। বিশৃঙ্খলার বিজ্ঞানের সঙ্গে ফ্র্যাকটাল জ্যামিতির মিলন ঘটে। অদ্ভুত আকর্ষকের গঠন যতই ত্যাড়াব্যাঁকা হোক না কেন তা শেষ অবধি সামগ্রিক সুস্থিতির দ্যোতক। বিশৃঙ্খল সিস্টেম যে প্রাথমিক অবস্থা থেকেই যাত্রা শুরু করে থাকুক না কেন শেষ অবধি তা অদ্ভুত আকর্ষকের ওপর কোনো এক বিন্দুতে গিয়ে মিলবে। আকস্মিক বিচ্যুতি যদি তাকে সেখান থেকে সরিয়েও নেয় অবক্ষয় আবার তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনবে।

সব চেয়ে সূক্ষ্ম যে ধারণাটি এই নতুন বিজ্ঞান প্রবর্তিত করেছে তার আলোচনায় এবার আমরা প্রবেশ করছি। বিশৃঙ্খলা স্থানীয় অর্থে স্থিতিশীল নয়, কিন্তু সার্বিক অর্থে সুস্থিত। এই সার্বিক আচরণের জন্য কোন অতিরিক্ত সার্বজনীয় নিয়মের প্রয়োজন হয় না। অরৈখিক স্থানীয় নিয়মের প্রয়োগেই এটা সম্ভব হয়ে ওঠে। অবক্ষয়ী সংস্থার স্ব-সংগঠনে এবং স্ব-নিয়ন্ত্রিত কোষ সমষ্টিতেও এই একই নীতি ক্রিয়াশীল। সেখানেও স্থানীয় অরৈখিক নিয়মের পৌনঃপুনিক প্রয়োগে সার্বিক স্তরে বিশিষ্ট মাপের বিন্যাসের সৃষ্টি হয়। আপাত বিরোধী দুটি ধারণার এ এক আশ্চর্য সম্মিলন।

একজন মনীষী বলেছিলেন—বিজ্ঞানের সমস্ত মহৎ ধারণারই জন্ম হয় প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচরণ করে। আর অন্তিমকালে সে নিজেই পরিণত হয় একটি অনড় ডগ্‌মায় (dogma)। হয়তো এই নতুন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটাই ঘটবে। বিশৃঙ্খলা, ফ্র্যাকটাল এবং স্ব-সংগঠন আমাদের অনেক পুরোনো ধারণা বদলে দিয়েছে। কিন্তু

এদের ঘিরেও নতুন কিংবদন্তীর সৃষ্টি হচ্ছে। ভবিষ্যতের আরও বড়, সর্বব্যাপী, এক অরৈখিক বিজ্ঞান নির্মাণের পথে এগুলি প্রথম পদক্ষেপ মাত্র—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রকৃতিতে নানারূপে পরিব্যাপ্ত জটিলতার একেবারে অন্তস্তলের রহস্য ভেদ করতে এই নতুন বিজ্ঞান এখনও হয়তো পারেনি, কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার অবয়বকে সে নিশ্চয়ই স্পষ্টতর করেছে। আজ জড়বিশ্বের অন্তত একটা ক্ষুদ্র অংশে আমরা বুঝতে পারছি—আগের চেয়ে একটু ভালোভাবে বুঝতে পারছি—যে আমরা সত্যিই কি জানি না। □

গ্রন্থপঞ্জী

এই বিষয়ে লেখালেখি ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। তা ক্রমাগত বাড়ছেও। এই গ্রন্থপঞ্জীতে সে-সবেরই উল্লেখ থাকছে, যে-সব থেকে এই গ্রন্থ লিখতে লেখক সাহায্য নিয়েছেন।

1. Abraham, R. and Shaw, C. : *Dynamics : The Geometry of Behaviour,* Aerial Press, Santa Cruz (1982).

2. Baker, G. and Gollub, J. : *Chaotic Dynamics,* Cambridge University Press, Cambridge (1990).

3. Barnsley, M.: *Fractals Everywhere,* Academic Press, New York (1988). A mathematical exposition of the subject. Good for those who wish to study the subject thoroughly.

4. Cambel, A. : *Applied Chaos Theory,* Academic Press, San Diego (1993). A leisurely qualitative introduction to various aspects of the subject. The chapter on diagnostics and control of chaos is interesting.

5. Davies, P. : *The Cosmic Blueprint,* Simon and Schuster, New York (1988). An excellent and perceptive introduction to the subject by a well-known scientist and science communicator. A major influence on the present book, especially its last two parts.

6. Davis, P. and Hersh, R. : *The Mathematical Experience,* Houghton Mifflin, Boston (1981). Unrelated to the present subject, but a well-written non-specialist book on what mathematics is all about. Good for general reading.

7. Dawkins, R. : *The Blind Watchmaker,* Longman, London (1986). A well-known book for non-specialists, fervently supporting Darwinian theory of evolution. Excellent for general reading.

8. Gleick, J. : *Chaos,* Viking, New York (1987). The best popular book on the subject currently. Lucid and insightful. Has influ-

enced the present book substantially. A total absence of mathematics in the book, however, limits its clarity on some topics. The subject of self-organisation *a la* Prigogine is completely omitted.

9. Kaye, B. : *Chaos & Complexity*, VCH, New York (1993). A kind of workbook on chaos and fractals. Excellent for students.
10. Mandelbrot, B. : *The Fractal Geometry of Nature*, Freeman, San Francisco (1982). The classic that gave birth to a whole new discipline in science. The work of a genius.
11. Nicolis, G. and Prigogine, I.: *Self-organisation in Non-equilibrium Systems*, Wiley, New York (1977). A technical book, suitable only for specialists.
12. Pais, A. : *Inward Bound*, Clarendon Press, Oxford (1986). A good source for acquainting oneself with the history of atomic physics of this century. Unrelated to the subject of this book.
13. Pais, A. : *Subtle is the Lord*, Oxford University Press, Oxford (1982). The well-known biography of Einstein. Excellent for general reading. Unrelated to the subject of this book.
14. Penrose, R. : *The Emperor's New Mind*, Oxford University Press, Oxford (1989). Excellent qualitative introduction to many areas of fundamental physics and mathematics. Unrelated to the present subject, but not irrelevant to it. Highly recommended for general reading.
15. Prigogine, I. and Stengers, I. : *Order Out of Chaos*, Heinemann, London (1984). This and the following book are good sources for learning Prigogine's ideas and work at a qualitative level. They have influenced the present book considerably.
16. Prigogine, I. : *From Being to Becoming*, Freeman, San Francisco (1980).
17. Richter, P. and Peitgen, H. : *The Beauty of Fractals*, Springer, Berlin and New York (1985). The book that popularized fractals. Exquisite pictures and much more.
18. Schröeder, M. : *Fractals, Chaos, Power Laws*, Freeman, New York (1991). An excellent semi-popular book with numerous examples of chaos and fractals from a wide variety of contexts. Has influenced this book substantially.
19. Simmons, G. : *Differential Equations*, Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd., New Delhi (1974).

20. Thompson, J. and Stewart, H. : *Non-linear Dynamics and Chaos*, Wiley, New York (1986).

21. Turcotte, D. : *Fractals and Chaos in Geology and Geophysics*, Cambridge University Press, Cambridge (1992). An elementary but well-written introduction to the subject.

Papers and Articles

22. Crutchfield, P., Farmer, J., Packard, N. and Shaw, R. : Chaos, *Scientific American*, **255**, 46 (1986).

23. Feigenbaum, M. : Quantitative Universality for a Class of Non-linear Transformations, *Journal of Stat. Physics*, **19**, 25 (1978).

24. Ford, J. : How Random is a Coin Toss? *Physics Today*, April 1983.

25. Kandanoff, L. : Roads to Chaos, *Physics Today*, December 1983.

26. Kulkarni, M.S., Kumar, A. : Interactive Markovian Models of Progressive Trends, *Journal of Mathematical Sociology*, Gordon and Breach, New York, **14**, 45 (1989).

27. Lorenz, E. : Deterministic Non-periodic Flow, *Journal of Atmospheric Sciences*, **20**, 130 (1963).

28. May, R. : Simple Mathematical Models with Very Complicated Dynamics, *Nature*, **261**, 459 (1976).